মানদা

(উপন্যাস)

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়
প্রণীত

কলিকাতা
১৩২৭

মূল্য ১৸০

প্রকাশক:—
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০১,
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

&
SONS

প্রিন্টার- শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

আত্মকথা

—:•:—

"মানদা" আমার প্রথম উপন্যাস। ইহা নয় বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল ; এবং ১৩১৯ সালে, জ্যৈষ্ঠ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্ত, ইহা ধারাবাহিক ভাবে, "সাহিত্য-সংহিতা" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রথম উদ্যমে যে সকল ত্রুটি থাকিবার কথা, তাহা "মানদা"তে আছে। আমি সেই সকল ত্রুটি সংশোধন করিতে চেষ্টা করি নাই ; তাহা করিতে হইলে, পুস্তকখানি নূতন করিয়া লিখিতে হইত ; উহা আর একখানি উপন্যাস হইয়া দাঁড়াইত।

এই উপন্যাস লেখার পর, আমি আট বৎসর যাবত আর কোনও উপন্যাস বা গল্প লিখি নাই, লিখিবার সামর্থ্য ছিল না ; নানা কারণে শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া ছিল। কাযেই নানারূপ ত্রুটি লইয়া "মানদা"কে একাকিনী জনসমাজে পাঠাইতে সাহস করি নাই। এক্ষণে আমার আত্মীয় ও বন্ধুগণের উৎসাহে পুনরায় উপন্যাস লিখিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, "মানদা"র সঙ্গিনী জুটিয়াছে ; এজন্য তাহাকে জনসমাজে পাঠাইতে সাহস হইল।

বিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক রাইডার হ্যাগার্ডের "বিয়েট্রিস" নামক একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস আছে। এই উপন্যাসের অনেক চিত্র বিয়েট্রিসের অনুকরণে চিত্রিত হইয়াছে।

আশ্রম, হুগলি।
২৫শে আষাঢ়, ১৩২৭।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

মানদা

—॥—

প্রথম পরিচ্ছেদ

সপ্তস্বরের সাধনা।

শশীর সহিত কিংবা চারুতার সহিত একাদশবর্ষীয়া বালিকা শ্রীমতী চারুশশীর কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য ছিল না তাহা বলিতে আমরা সাহস করি না। চারুশশীর রূপগরিমা সম্বন্ধে তাহার পাড়া-বিজয়িনী মাতা যে সকল সাহঙ্কার অভিমত ঘোষণা করিতেন, কাহার সাধ্য, কাহার একটি স্কন্ধের উপর দুইটি মস্তক আছে যে, সে সেই মতের প্রতিবাদ করে? কিন্তু একটি বিষয়ে গগনবিহারী বিধুর সহিত বিধুবদনা চারুশশীর খুব সৌসাদৃশ্য ছিল;—তাহার ক্ষুদ্র দেহটি শশিকলার ন্যায় অতি অল্পকাল মধ্যে আশাতিরিক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহার এই অযথা দেহ-সৌষ্ঠব দেখিয়া তাহার পিতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় কন্যাভারের গুরুত্ব সবিশেষ অনুভব

করিতেছিলেন। তিনি ঘটকগণের স্তবস্তুতি করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি একটি সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালা দেশে সুপাত্রগুলি দুষ্প্রাপ্য পণ্য হইলেও, আমরা দেখিয়াছি, প্রায় সকল কন্যারই বর মিলে। বরকর্ত্তা, কন্যাকে দেখিবার একটা শুভ দিন স্থির করিয়া, গোবিন্দ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইলেন। চারুশশীকে, সমবেতা শশিমুখীগণের বিধানানুরূপ মার্জ্জিত, ঘর্ষিত এবং বস্ত্র ও অলঙ্কার ভারে সম্যক্ প্রপীড়িত করিয়া এবং তাহার চক্ষু দুইটী মুদিত রাখিবার জন্য সবিশেষ উপদেশ দিয়া বহির্ব্বাটীতে উপস্থিত করা হইল। যে কক্ষে চারুশশী আনীতা হইল, তাঁহার গবাক্ষ সকলের লৌহদণ্ড ধরিয়া, পাড়ার এবং ও-পাড়ার যাবতীয় বালিকাগণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহাদের কৌতূহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। অসংখ্য চক্ষু, অসংখ্য তারার ন্যায়, চারুশশীকে ঘিরিয়া রহিল। এই সকল চক্ষুর মধ্যে একযোড়া চক্ষু অত্যন্ত বিশাল,—বর্ণনাতীত কমনীয়। সেই চক্ষুর দিকে বরকর্ত্তার দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হইল। তিনি চারুশশীকে বলিলেন, "বস, মা, বস।" তাহার পর গবাক্ষ-পথ-দৃষ্ট সেই দুইটী বিশাল চক্ষুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "গোবিন্দ বাবু, ঐটী কার মেয়ে?" গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "ও অম্বিকা—ওপাড়ার কৃষ্ণ চাটুর্য্যের মেয়ে।"

বরকর্ত্তা। কৃষ্ণ চাটুর্য্যে? কৃষ্ণ চাটুর্য্যে কি করেন মশায়?

গোবিন্দ। কিছুই করেন না। পাঁচজনকে প্রবঞ্চনা করে', তাঁর বাপ কিছু টাকা রেখে গিয়েছিল, তাই ঘরে বসে বসে নবাবী করেন। এমন অহঙ্কারী আত্মম্ভরী লোক, মশায়, দেখা যায় না। ভদ্রলোক গেলে কথা ক'ন না; চশমা নাকে দিয়ে কেবল পড়েন। ছি! মেয়েটাকেও, মশায়, পড়িয়ে পড়িয়ে মাটী করে দিয়েছেন।

কৃষ্ণ চাটুর্য্যের নিন্দাটা বরকর্ত্তা বিশেষ রূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি না, আমরা তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি সেই মাটী-করা নলক-পরা ইন্দীবরাক্ষী বালিকার দিকে চাহিয়া ছিলেন। চাহিয়া চাহিয়া মনে করিতেছিলেন, যদি এই লক্ষ্মীস্বরূপাকে পুত্রবধূরূপে গৃহে লইয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে আমার গৃহে আর কখন অপ্রাচুর্য্য থাকিবে না; এ লক্ষ্মীর পদক্ষেপে আমার সংসার নিশ্চিত ধনধান্যপূর্ণ হইবে। এই সকল কথা মনে করিয়া তিনি গোবিন্দ বাবুকে বলিলেন, 'মশায়, আপনার মেয়েকে দেখলাম, দিব্যি মেয়ে। কিন্তু আজ 'আশীর্ব্বাদ' করিব না। 'আশীর্ব্বাদ' সম্বন্ধে পরে আপনাকে সংবাদ দিব।"

জলযোগের পর বরকর্ত্তা, অম্বিকা ও তাহার কতকগুলি সঙ্গিনী কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, অহঙ্কারী আত্মম্ভরী কৃষ্ণ চাটুর্য্যের বাসগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায় মূর্খ নহেন; বরকর্ত্তার অভিলাষ কি, তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র কালবিলম্ব হইল না।

তিনি গৃহিণীর নিকট সমাগত হইয়া নিজ বক্ষে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, "বৃথা গোবিন্দ নাম ধরি, যদি এর প্রতিকার করতে না পারি!"

গৃহিণী সা, নি, ধা এই তিন স্বরে তিনবার বলিলেন, "কি, কি, কি?"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "আবার কি? এই বয়সে এত বড় কলঙ্কিনী দেখা যায় না;—চোখ ঘুরিয়ে ববকর্ত্তাকে ডেকে নিয়ে গেল!"

পা, মা, গা,—এই তিন স্বরে গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, কে, কে?"

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "আবার কে? ও পাড়ার কৃষ্ণ চাটুর্য্যের মেয়ে অম্বিকা।"

গৃহিণী গর্জ্জন করিলেন, "রে, সা।"

তখন শ্রীগোবিন্দ ও তাঁহার শ্রীশ্রীমতী সপ্ত-স্বরের সাধনা দ্বারা কল্পনা-দেবীর আরাধনা করিলেন, এবং তাঁহার বরে যে সকল সুমধুর কথামৃত রচনা করিলেন, তাহাতে বেচারা অম্বিকার বরপ্রাপ্তি রহিত হইয়া গেল। অম্বিকার স্বর্গগতা পুণ্যময়ী মাতার নামে যে সকল কলঙ্কের কথা প্রচারিত হইল, তাহা কেহ বিশ্বাস না করিলেও, কেহ অম্বিকাকে বধূরূপে গ্রহণ করিয়া সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইতে আর সাহসী হইল না। লক্ষ্মীছাড়ারা লক্ষ্মীস্বরূপাকে কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে?—তাহারা মিথ্যার পদে প্রণত রহিল। হায় মিথ্যাশাসিত বঙ্গসমাজ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নায়কের রূপবর্ণনা।

দ্বিপ্রহর। মা-গঙ্গার রৌদ্র-তরঙ্গময় গাত্রবসনে অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল হীরা জ্বলিতেছিল। পৃথিবীর সমস্ত ধনবিনিময়ে কোনও রাজরাণী কি এরূপ আশ্চর্য্য বসন আহরণ করিতে সমর্থা হইয়াছেন?

নন্দরাণীর কোলে শিশু-শ্যামের ন্যায়, হীরকখচিত অঙ্গুরীয় মধ্যে মরকতমণির ন্যায়, আর, হে আমার পেটুক পাঠক, তোমার হস্তস্থিত নীহারধবল সন্দেশগোলকের বিমল গাত্রে পেস্তার বুকনির ন্যায়, গঙ্গা-উপকূলে তাল-তমাল-নারিকেল কাঁঠাল ছায়া-সমাকুল শ্যামপল্লব সুশীতল পল্লীরাণী শোভা পাইতেছিল। মনুষ্য-কোলাহলশূন্য পল্লীমধ্যে বৃক্ষে বৃক্ষে সুধাকণ্ঠ বিহঙ্গসকল গান গাহিতেছিল। বৃক্ষতলে শুইয়া সুরস-তৃণপুষ্ট ধেনু সকল বিশ্রাম করিতেছিল।

গ্রামখানির নাম নাড়িচা। হায়! কোন্ কাব্যরসশূন্য বর্ব্বর এমন মনোহর গ্রামটিকে এমন কর্কশ অমানুষিক নামে অভিহিত করিয়াছিল?

নাড়িচা গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের নাম মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সামান্য ইংরাজি

জানিতেন, এবং পূর্ব্বে জেলা মেজিষ্টারের আপিসে চল্লিশ টাকা বেতনে কেরাণীর কার্য্য করিতেন। কিন্তু এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, পেন্সন গ্রহণ করিয়া পল্লীর বাটীতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। যে বাটীতে তাঁহার বাস; তাহা অতি সামান্য, তাহাতে কেবলমাত্র মৃৎপ্রাচীর বেষ্টিত দুইটা তৃণাচ্ছাদিত গৃহ ছিল।

সেই গৃহে মধুসূদন একমাত্র পুত্র, এবং শ্রেষ্ঠ কুলীন হইলেও, একমাত্র গৃহিণী সহ বাস করিতেন। মধুসূদনের পুত্রের নাম গদাধর, আর গৃহিণীর নাম—আঃ! তোমরা সেই কুলবতীর নাম নাই বা শুনিলে,—তাহাকে তোমরা 'গদার মা' বলিও। আমার সন্দেহ হয়, তখনকার স্ত্রীলোকদিগের নামকরণের পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া যাইত; তখন বাল্য-বিবাহ-সংহারক সংস্কারকগণের আবির্ভাব হয় নাই।

মধুসূদনের যখন ত্রিশ বৎসর বয়স, তখন তিনি বাৎসরিক ছুটি উপলক্ষে একমাত্র আত্মীয়া মাতৃস্থানীয়া পিসিমাতাকে দেখিবার জন্য কর্ম্মস্থান হইতে নাড়িচা গ্রামে আসিয়াছিলেন, এবং সেই মাতৃস্থানীয়া বিধবা পিসিমাতার নির্ব্বন্ধাধিক্য জন্য পুঁটি নাম্নী একটি পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিয়া, পিসিমাতার সেবার জন্য গৃহে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পুঁটি পাঁচ বৎসর বয়স হইতে সেবাধর্ম্ম শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভবিষ্যৎ জীবনে স্বামীকে কাব্যালাপে বা বাক্যালাপে সুখী করিতে পারে নাই ইহা সত্য, কিন্তু সেই হলুদমাখা হাতের সেই ঘণ্ট, সেই সুক্তনি—আহা মধুসূদন, তুমিই ধন্য!

পুঁটির নামকরণ হইতে না হইতে একদিন সে 'গদার মা' হইয়া বসিল। আরও কিছু দিন পরে মধুসূদনের পিসিমাতা পরলোকগতা হইলেন। পল্লীগ্রামের বাটীতে একটি দুরন্ত বালক লইয়া বাস করা গদার মার পক্ষে একটু কষ্টকর হইয়া পড়িল, কাযেই মধুসূদন 'পেন্সন' লইয়া গৃহে আসিলেন।

এক্ষণে মধুসূদনের বয়ঃক্রম ছাপান্ন বৎসর। সুতরাং গদার মার বয়স একত্রিশ বৎসর এবং স্বয়ং গদাধরের বয়ঃক্রম—যেঠের কোলে—চৌদ্দ বৎসর।

এখন, আমি লেখক, আমি তোমাদিগকে একটা পরামর্শের কথা জিজ্ঞাসা করিব। আচ্ছা, এই চৌদ্দ বৎসরের গ্রাম্য গদাধরকে যদি আমি আমার এই উপন্যাসের নায়ক করি, তাহা হইলে তাহাতে তোমাদের কোনও আপত্তি আছে কি না? বাইশ বৎসরের নায়ক হইলেই বেশ সুবিধা হইত বটে; কিন্তু বাঙ্গালা দেশে উপন্যাসের সুবিধাজনক নায়ক হইবার জন্য কোনও কুলশীলসম্পন্ন বালকই অবূঢ় থাকে না। যাঁহারা অল্পবয়সে বিবহ করিয়া অত্যন্ত ঠকিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সম্প্রতি কেহ কেহ, বোধ হয় উপন্যাস-লেখকদের সুবিধার জন্য পঞ্চবিংশ বৎসরের অনধিকবয়স্ক যুবকগণের বিবাহ রহিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহা যদি কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে, আহা! উপন্যাস লিখিতে কি সুবিধা! আমার চৌদ্দ বৎসরের গদাধরকে নায়ক হইতে হইলেও সম্প্রতি আমি তাহাকে পরিণীত করিব না।—ষোল বৎসর পরে, তাহার ত্রিংশ

বৎসর বয়ঃক্রমে, তাহার পরিণয়-কার্য্য সমাধা হইবে। অতএব বয়ঃক্রম সম্বন্ধে বোধ হয় আর তোমাদের আপত্তি নাই। এখন আপত্তি হইতেছে, নায়কের রূপ লইয়া। গদাধর কি সুরূপ? হায়, আমার গদাধর ত সুরূপ নহে! কদম্বপুষ্পতুল্য কেশদাম ত তোমরা পছন্দ কর না। মল্লিকাকুসুম সুন্দর বটে, কিন্তু হায়, তাহার মত দন্ত ত তেমন নয়নানন্দদায়ক নহে। সে বর্ণ ত গোলাপনিন্দিত নহেই, তাহা অপরাজিতাকেও পরাজয় করিবার যোগ্য। সে নাসিকা দেখিয়া কখনও কাহারও বংশী বলিয়া ভ্রম হয় নাই। যাহা যাহা থাকিলে মানুষকে সুরূপ করে, গদাধরের তাহার কিছুই ছিল না। গদাধর মৎস্যজাতীয়গণের আততায়ী রূপে ছিপ্ নামক কাষ্ঠখণ্ড হস্তে গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতে পারিত; অভ্রভেদী তালবৃক্ষের শিখরদেশে সমাসীন বাবুই-শিশুগণকে মুষ্টিগত করিতে সমর্থ হইত; কদলীবনাগত বানরকুলকে লোষ্ট্রনিক্ষেপে বিতাড়িত করিতে পারিত। কিন্তু মাতা সরস্বতী তাহার প্রতি বিমাতার ন্যায় ব্যবহার করিতেছিলেন। আমি এহেন গদাধরকে আমার উপন্যাসের নায়ক করিবার মানস করিয়াছি।

কিন্তু মানুষমাত্রই কেবলমাত্র দোষের সমষ্টি হইতে পারে না। শত দোষের মধ্যে কুরূপ মূর্খ গদাধরের দুইটি গুণ ছিল। তাহার শারীরিক বল অত্যন্ত অধিক ছিল, এবং সে পিতামাতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিত। রন্ধন সময়ে, সে মাতার নিকটে থাকিয়া কখন ইন্ধন, কখনও কলসীপূর্ণ গঙ্গাবারি

নিমেষমধ্যে আহরণ করিত। পিতাকে 'তামুক' সাজিয়া দিবার সময়, সে আকাশের বাবুইপক্ষী এবং জল-বিচরণকারী মৎস্যগণকে বিস্মিত হইত।

মধুসূদনও একমাত্র পুত্র গদাধরকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পল্লীবাসিগণ কহিত, "মধু মুখুর্য্যে ছেলের মস্তকটি উত্তমরূপে চর্ব্বণ করছে।" মধুসূদন বলিতেন, "পিতাকে শ্রদ্ধা করায় যদি পুণ্য থাকে, তবে সেই পুণ্যের ফলে গদাধর সর্ব্বজয়ী হবে।" পল্লী-বাসিগণ কহিত, "মধুসূদন আদর দিয়ে ছেলেটাকে মূর্খ করে রাখল।" মধুসূদন বলিতেন, "আমার আশীর্ব্বাদে মা সরস্বতী আমার ছেলেকে আপনি বিদ্যাদান করবেন।" পল্লীবাসিগণ কহিত, "মধুর মূর্খ ছেলের সঙ্গে আমাদের ছেলেদের সংস্রব থাকলে, তারাও মূর্খ হবে।" মধুসূদন বলিতেন, "পিতৃভক্তি শিক্ষার জন্যে পাড়ার ছেলেরা গদাধরের কাছে আসুক।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নায়কের আহার বিহার।

আমরা পূর্ব্ব দুই পরিচ্ছেদে যে সময়ের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে তাহার দুই বৎসরের পরের ঘটনা বিবৃত করিতেছি। গদাধর এক্ষণে ষোড়শবর্ষীয় যুবক।

রন্ধনগৃহের বহির্ভাগে গদাধর দাঁড়াইয়া ছিল। মাতা গৃহমধ্যে রন্ধনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। গদাধরকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "গদাই, তোমার হাতে কি ?"

গদাই বলিল, "একটা মাছ এনেছি।"

মা। কর্ত্তা বারণ করেছেন, তবে তুমি আবার মাছ ধরলে কেন ?

গদা। মাছ ধরতে বারণ করেন নি, বলেছিলেন চিরকাল মাছ ধরলে চলবে না, কিছু কিছু লেখাপড়া শিখতে হবে। তা মা, আমি লেখাপড়া শিখব, মাছও ধরব। তোমরা বারণ করলেও ধরব। তোমরা দুজনেই মাছ খেতে ভালবাস ; আর, আমাদের মাছ কেনবার পয়সা নেই।

মা। না গদাই, আমরা আর মাছ খেতে ভালবাসি না, তুমি লেখাপড়া শেখ। দেখ, তুমি লেখাপড়া শিখতে পার নি বলে সকল লোকেই কর্ত্তাকে নিন্দা করে। তোমার জন্যে লোকের

কাছে তাঁর মাথা হেঁট হয়; লোকে যখন তোমাকে মূর্খ বলে, তখন তাঁর মনে কত কষ্ট হয় বল দেখি?

গদা। আমি মূর্খ বলে', বাবার মনে যে কষ্ট হয়, তা মা, আগে আমি বুঝতে পারি নি; এখন তা বুঝেছি। বুঝে, লেখাপড়া আরম্ভ করেছি।

মা। তুমি লেখাপড়া শিখতে আরম্ভ করেছ, এ কথা কৈ আমাদিকে ত বল নি।

গদা। না মা, এখনও সেকথা কাকেও বলি নি। কিন্তু খুব যত্ন করে' আমি বিদ্যা শিখছি। যদি বেঁচে থাকি, একদিন সমস্ত লোককে দেখিয়ে দেব, আমার বাবা মূর্খ ছেলের পিতা নন। না মা, আমার জন্যে তাঁহার মাথা হেঁট হবে না।

মা। গদাই, তুমি কার কাছে পড়া শিখছ?

গদা। সে কথা মা, আমি তোমাদের আরও কিছু দিন পরে বলব। আমি যার কাছে পড়ছি, তিনি অসাধারণ পণ্ডিত। তাঁর মত পণ্ডিত বোধ হয় বাঙ্গালা দেশে দু জন নেই। তিনি কেবলমাত্র পণ্ডিত নন, তিনি বড় দয়ালু। তিনি বলেছেন যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবার জন্যে তিনি আমাকে কলকাতায় পাঠাবেন, কলকাতায় আমার যা খরচ হবে, তিনি নিজে তা বহন করবেন। আরও কিছুদিন তাঁর কাছে লেখাপড়া করে' আমি কলকাতায় যাব। মা, তোমরা আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে ত?

মা। আমাদের কষ্ট হবে। কিন্তু কি করব বাছা,

তোমার উন্নতির জন্যে, তোমার ভাল'র জন্যে আমাদের সকল কষ্ট সহ্য করতে হবে।

গদা। মা, এ সকল কথা তুমি এখন বাবাকে বলো না। পরে, আমি নিজে সকল কথা তাঁকে জানাব। আজ আমাদের কি রান্না হবে মা?

মা। আজ বেশী কিছু রাঁধব না। তুমি মাছ এনেছ; মাছের ঝোল রাঁধব। আর যা হোক একটা অন্য তরকারি রাঁধব।

গদা। কলার ঝাড়ে একটা মোচা আছে, এনে দিচ্চি। মোচার ডাল্‌না রেঁধ।

এই বলিয়া, গদাই মাতাকে নিমেষ মধ্যে একটি সদ্য-আহৃত মোচা আনিয়া দিল। তাহার পর বঁটি লইয়া মৎস্যটি কুটিয়া দিল। পরে গাভীটিকে স্থানান্তরে বাধিয়া, গো-গৃহটি স্বহস্তে সংস্কৃত করিল, এবং পরিষ্কার পাত্রে দুগ্ধ দোহন করিয়া রাখিল।

পাঠকগণ, তোমরা আমার নায়কের প্রতি আর একবার ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত কর। তাহার পাদুকাবিহীন পদতল এবং দৃঢ়সংবদ্ধ মাংসপেশী অবলোকন কর। যানারোহণের জন্য নহে, এ চরণ ধরাতলে বিচরণের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। গদাধরের কটিতটে অপরিসর কর্কশ বস্ত্র পরিহিত। কিন্তু কটিতটের উপরি-ভাগ সম্পূর্ণ অনাচ্ছাদিত। সে অনাবৃত বক্ষ, সে অনাবৃত বাহু, কৃষ্ণমর্ম্মরবিনির্ম্মিত সুনিপুণ ভাস্কর্য্যের চরম আদর্শস্বরূপ। সে বক্ষে, সে বাহুতে অমিত বল। সে অমিত বল, সে বক্ষে সে বাহুতে পরিস্ফুট।

গদাধরের মস্তক বৃহৎ ; সুবৃহৎ ললাট ; ললাটতলে ক্ষুদ্র নিগূঢ় তীক্ষ্ণ চক্ষু। মস্তকোপরি কর্কশ বিশৃঙ্খল কেশরাশি। তাহার দন্তসকল অসমান, বিশেষতঃ সম্মুখের দুইটি দন্ত কিছু অধিক বড় থাকা হেতু, তাহার অধরের কিয়দংশ আবৃত রাখিত। দন্তনিবদ্ধ অধরে অমানুষিক সংকল্প সকল অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত। তাহার হাস্য-তরঙ্গিত কৃষ্ণ গণ্ড স্বাস্থ্যের আরক্তিম রাগে, রবি-রাগরক্ত কৃষ্ণ-তড়াগ-তরঙ্গ স্বরূপ সর্ব্বদা প্রতীয়মান হইত।

পাঠকগণের রুচিবিকার ঘটিবার আশঙ্কা থাকিলেও আমি গদাধরের আহার সম্বন্ধীয় কিছু বিবরণ এস্থলে লিখিতে অভিলাষী হইয়াছি। অসভ্য বর্ব্বর গদাধর প্রভাতে উঠিবার পূর্ব্বেই চা, ডিম্ব, বিস্কুট ইত্যাদি আহার করিত না। মানুষে যে এ সকল উপাদেয় দ্রব্য আহার করে, তাহা বোধ হয় গদাধর বা গদাধরের চৌদ্দ পুরুষের মধ্যে কেহই অবগত ছিল না। ইহা গদাধরের এবং গদাধরের চৌদ্দপুরুষের ইহজন্মের দুর্ভাগ্য এবং গতজন্মের পাপের ফল বলিতে হইবে। কিন্তু ইহা সত্য যে, গদাধর এবং তস্য পিতা পিতামহগণ, কেহ কখন চা পান করেন নাই। গদাধর প্রভাতে উঠিয়া প্রচুর মুড়ি ও গুড় বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইত, এবং তাহা আহার করিতে করিতে ছিপ হস্তে, মৎস্যসংগ্রহের অভিলাষী হইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইত। সকল বঙ্গ-সন্তান ভাত খাইয়া থাকে ; কিন্তু গদাধর বহু বঙ্গ-সন্তানের আহারের ভাত একা খাইতে পারিত। আহারান্তে সে কোথায় যাইত,

তাহা কেহ অবগত ছিল না। আমাদের সন্দেহ হয়, গদাধর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণপরিচয়' পাঠ করিয়া এই তত্ত্বটি অবগত ছিল না যে, রৌদ্রের সময় দৌড়াদৌড়ি করিতে নাই। আমাদের বিশ্বাস, গদাধর ত দূরের কথা, বাল্যকালে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ও উল্লিখিত নীতিবাক্যানুযায়ী কার্য্যানুবর্ত্তী হইতেন না। গদাধর রৌদ্রের সময় শীতল স্নিগ্ধ গৃহকোণে বসিয়া থাকিত না। দেবতা মরীচিমালী প্রখর সমরে তাহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হন নাই। বিকালে বাটী ফিরিয়া গদাধর আবার মুড়ি চর্ব্বণ করিতে বসিত এবং তৎসহ কখন শাঁকআলু, কখন শশা, কখন এবংবিধ অন্য উপকরণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গলাধঃকরণ করিত। রাত্রে পিতৃসন্নিধানে বসিয়া আবার সেই অন্নের স্তূপ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অম্বিকা।

গোবিন্দবাবুর উদ্যোগে, এবং কৃষ্ণ চাটুর্য্যের অনুদ্যোগে, অম্বিকার বিবাহ হইল না। ক্রমে তাহার বিবাহকালও উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সে বিদ্যাবতী হউক, সুশীলা হউক, কিন্তু সে ষোড়শী—এই পাপে হিন্দু সমাজের কোনও লোক এখন আর তাহাকে বিবাহ করিল না। পতিতা, বয়স্থা কন্যাকে কে বিবাহ করিবে?

কিন্তু কন্যার বিবাহ না হওয়ায় কৃষ্ণ চাটুর্য্যে কিছুমাত্র দুঃখিত ছিলেন না। চির-অভ্যাসানুরূপ প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া, তিনি চিরনির্দ্দিষ্ট এক ক্রোশ পথ পরিভ্রমণ করিতেন। যথাসময়ে সামান্য ব্যঞ্জনের সাহায্যে স্তূপাকার অন্ন আহার করিতেন। তাহার পর সকালে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যাকালে অবিরত অদম্য উৎসাহে বিদ্যালোচনা করিতেন। ইংরাজি, ফরাসী, জার্ম্মান, রুষ, আরবা, পারস্য, চীনীয়, হিন্দী, মারহাটী প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় তিনি যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনই সংস্কৃত, পালি, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু প্রভৃতি অপ্রচলিত ভাষাতেও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। সাহিত্য, কাব্য, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, দর্শন—কোন শাস্ত্রই তাঁহার অনধীত ছিল না। সংসারে তাঁহার একমাত্র ব্রত—অধ্যয়ন; অন্য কোন চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত

না। কন্যার বিবাহ দেওয়া যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তাহা বোধ করি তিনি কখনও ভাবেন নাই।

অম্বিকাও কখন আপনার বিবাহের কথা চিন্তা করে নাই। পিতার শিক্ষকতায়, অবিরত বিদ্যাচর্চ্চায়, তাহার মানসিক প্রবৃত্তি-সকল, কর্দ্দমশূন্য, অন্যের অপরিচিত, এক অভিনব পথে বিচরণ করিত। তাহার অতি বিশাল বিলোল চক্ষু দু'টি, চন্দ্রালোকিত নীল নির্ম্মল আকাশের ন্যায় জ্ঞানালোকে প্রভাসিত থাকিত। তাহাতে ক্ষুদ্র সুখদুঃখের ছায়া কখন নিপতিত হইত না। সে নয়নতারা, ভ্রাম্যমান ভ্রমরের ন্যায় সুখ-মধু অন্বেষণে কখন অপাঙ্গ-পথে বিচরণ করিত না। তাহা অগ্নিগর্ভ অঙ্গারের ন্যায় কেবলমাত্র অপরিসীম প্রতিভা-জ্বালায় প্রজ্জ্বলিত থাকিত।

পিতার শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই অম্বিকা অদূরপ্রবাহিতা গঙ্গার জলে অবগাহন করিত। কখন, গঙ্গাতরঙ্গ সকলকে আপন তরঙ্গিত বক্ষের তাড়নে সন্তাড়িত করিয়া সন্তরণ করিত। গ্রামের বালিকাগণ ত নহেই, যুবকগণের মধ্যেও কেহই তাহার মত সন্তরণ-পটু ছিল না। ক্রীড়ারত মীনগণের ন্যায়, বেগবান স্রোতের মধ্যেও সে অবলীলাক্রমে বিচরণ করিত; উচ্চ উর্ম্মির পৃষ্ঠে তাহার সুকুমার দেহ দেবপূজার পুষ্পের ন্যায় শোভা পাইত। কোথাও স্রোতোহীন গভীর জলে, সে ইন্দীবরনিন্দিত চক্ষু দুইটি, বাণীপদাশ্রিত পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিত। তাহার জলনিমজ্জিত বরদেহ অবলোকন করিলে মনে হইত, বুঝি পদ্মালয়া বরুণালয়ে দেবী বরুণানী কর্ত্তৃক সেবিতা হইতেছেন।

স্নান সমাপন করিয়া অম্বিকা গৃহকার্য্যে রত হইত। তোমরা তাহার নয়নে বিদ্যাজ্যোতি অবলোকন করিয়াছ; গঙ্গাবক্ষে তাহার সন্তরণ-পটু সঞ্চালিত দেহ-সৌষ্ঠব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ, এক্ষণে গৃহকার্য্যে তাহাকে ব্যাপৃতা দেখিয়া ধন্য হও। রবিকর-স্পর্শে পৃথিবী যেরূপ আলোকময়ী হইয়া উঠে, অম্বিকার সুনিপুণ করস্পর্শে গৃহসামগ্রী সকল তেমনই উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। যুদ্ধ-নিপুণ সেনাপতির শাসনাধীন সৈন্যশ্রেণীমধ্যে যে শৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়, অম্বিকার সর্ব্বত্রসঞ্চালনী দৃষ্টিতলে গৃহমধ্যে সেইরূপ শৃঙ্খলা বিরাজ করিত।

তোমরা পাঠিকাগণ! তোমরা কি আমার এই অম্বিকার মত সুশিক্ষিতা হইতে পারিবে? এবং সুশিক্ষিতা হইয়া, শিক্ষা-সুনিপুণ পটুতা লইয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে? হায়! গৃহকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে না পারিলে, তোমরা ত মনোমোহিনী হইতে পারিবে না। গৃহকার্য্যে অবহেলা করিলে তোমাদের মনো-মোহন-ব্রত বৃথা হইয়া যায়। মনের দ্বারস্বরূপ আমাদিগের যে পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে, তদ্দ্বারা মনের মধ্যে সুখ আনিয়া দিতে হইলে, গৃহকার্য্যে শৃঙ্খলা এবং নিপুণতা একান্ত আবশ্যক। তোমা-দিগের অমার্জ্জিত মলিন দেহ, কর্দ্দমলিপ্ত নন্দনাঙ্গ, শৃঙ্খলাবিবর্জ্জিত গৃহসামগ্রী, কলঙ্কিত তৈজস আমাদিগের নয়ন নামক ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-সাধন করিতে সমর্থ হয় না। তোমা-দিগের ঐ কর্কশ ভাষা, পুত্রকন্যাগণের ঐ তন্দ্রাঘাতী মহাক্রন্দন, দাসদাসীগণের তুমুল রণনিনাদ, হে মধুমুখি, আমাদের এ দুর্ব্বল

কর্ণের পক্ষে একটুও তৃপ্তিদায়ক নহে। গৃহমধ্যে গন্ধপুষ্প আহরণ করিয়া, ধূপধূনার সুগন্ধি ধূম বিকীর্ণ করিয়া, চন্দনচর্চ্চিত কমনীয় দেহটি গন্ধপুষ্পমাল্যে পরিশোভিত করিয়া, হে মোহিনি, আমাদের ঘ্রাণ নামক ইন্দ্রিয়টি বিমোহিত করিও। আমরা নিদ্রিত হইলে, আমাদিগের গ্রীষ্মতপ্ত অঙ্গোপরি তালবৃন্ত সঞ্চালন করিয়া, ৺পুরীধামের সাগর-উপকূলে সংগৃহীত ক্ষুদ্র শুক্তি-অর্দ্ধের দ্বারা 'ঘামাছি'গুলির সংহার করিয়া এ ত্বগিন্দ্রিয়ের সেবা করিও। সর্ব্বোপরি, রসনার তৃপ্তিকর রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা থাকিয়া, মূর্ত্তিমতী অন্নপূর্ণার ন্যায়, তোমাদের কৃপাভিখারী আমাদের সম্মুখে —তোমাদের এই দেবাধিদেব মহাদেবের সম্মুখে,—মসলা-সুবাসিত ব্যঞ্জনালঙ্কৃত অন্নপাত্র স্থাপন করিও।

গৃহকার্য্য সকল পরিসমাপ্ত করিয়া, অম্বিকা স্নেহময় পিতার পার্শ্বে বসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিত। অতি দুরূহ পাঠসকল সে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইত। হার্ব্বাট স্পেন্সার, মিল, বেন প্রভৃতি ইংরাজ দার্শনিকগণের আধুনিক যুক্তিসকল, সে এমন সহজে আলোচনা করিতে পারিত যে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। মহর্ষি কণাদের বৈশেষিক দর্শনপ্রণালীর প্রত্যেক সূত্রের সহিত সে আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের এরূপ সুন্দর তুলনা করিত যে, মহাপণ্ডিত কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ও তাহা মুগ্ধ হইয়া শ্রবণ করিতেন। অতি সূক্ষ্ম গণিততত্ত্বেও তাহার সূচ্যগ্রমুখী প্রতিভা প্রবেশলাভ করিয়াছিল। তাহার কোমল সুকণ্ঠে বেদসূক্তের বিশুদ্ধ আবৃত্তি

শুনিয়া একজন বৃদ্ধ বেদান্তবাগীশ ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"চাটুর্য্যে, দেবী বীণাপণি তোমার কন্যারূপে জগতে আবার আবির্ভূতা হয়েছেন।"

সন্ধ্যাকালে অম্বিকা গৃহছাদে বসিয়া গান করিত। রাগিণী সকল আজ্ঞাধীনা কিঙ্করীর ন্যায় তাহার কিন্নরীনিন্দিত কণ্ঠেঙ্গিতে নৃত্য করিত। নীল আকাশে তারা উঠিত; মনে হইত, বুঝি স্বর্গের অপ্সরাগণ আপনাদের গীতবাদ্য বন্ধ করিয়া, স্বর্গের স্বর্ণ-গবাক্ষ খুলিয়া, উজ্জ্বল রূপরাশি লইয়া, অম্বিকার অপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিতে বসিয়াছে; সন্ধ্যারতিমিরাবৃতা নীলাম্বরা নীরবা ধরা বুঝি অম্বিকার গান শুনিবার জন্য বিহঙ্গ-কাকলী বন্ধ করিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন; তানভঙ্গভয়ে পবনদেব অতিধীরে সঞ্চালিত হইতেছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গদাধরের নববেশ।

যে গ্রামে অম্বিকার বাস, তাহার নাম কালীদহ। কালীদহ গ্রাম গঙ্গাতীরে,—নাড়িচা গ্রামের প্রায় চারি ক্রোশ উত্তরে। নাড়িচা অতি ক্ষুদ্র গ্রাম—বৃক্ষলতাসমাকুল নীরব নির্জ্জন পল্লী,—ইহা আমরা পাঠকগণকে ইতঃপূর্ব্বে জানাইয়াছি। কিন্তু কালীদহ জনসমাকুল, দেবালয়-মন্দির-হর্ম্ম্যাদি-বিভূষিত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামে এক ধনশালী জমীদার বাস করিতেন। এই জমীদার বাবুর কথা আমরা এই কাহিনীতে পরে বিবৃত করিব। কালীদহ গ্রামে জমীদার বাবুদিগের অনেক সুকীর্ত্তি ছিল। উচ্চ দেবমন্দির, অতিথিশালা-সমন্বিত সুন্দর দেবালয়, ভাগীরথী-তীরে প্রশস্ত সোপানাবলীসম্বলিত বৃহৎ সুগঠিত চাঁদনি, রম্য উদ্যান, তন্মধ্যে সুরম্য আনন্দনিকেতন কালীদহ গ্রামখানিকে নগরের আকার প্রদান করিয়াছিল।

গ্রামমধ্যে এক সুরক্ষিত উদ্যান-পরিবেষ্টিত গৃহে, অম্বিকার পিতা পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাস করিতেন। কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন না। তাঁহার পিতা তেজারতির কারবার করিয়া, তাঁহার জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন।

বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয়ের গৃহের সম্মুখে উদ্যান মধ্যে বৃক্ষচ্ছায়ায় দাঁড়াইয়া ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর গদাধর। চারি ক্রোশ তপ্ত পথ পাদুকাবিহীন পদে অতিক্রম করিয়া সে তথায় আসিয়াছে। রোজই আসিত। চারি বৎসর পূর্ব্বে কোনও লোকের মুখে কৃষ্ণ চাটুর্য্যের বিদ্যাগৌরবের কথা শুনিয়া, সে বিদ্যাভিলাষী হইয়া তথায় আসিয়াছিল। তদবধি প্রত্যহ আসিত। বিদ্যালাভাশায় প্রত্যহ আট ক্রোশ পথ বিচরণ করিবার দৃঢ়তা যে বালকের আছে, তোমরা জানিও যে, সে বালকের বিদ্যালাভ হইবে। বিদ্যালাভে গদাধর কিরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিল, তাহা তোমরা ক্রমে অবগত হইতে পারিবে।

পাঠ্য পুস্তক হইতে চশমা-নিবদ্ধ চক্ষু উত্তোলন করিয়া গবাক্ষ পথে গদাধরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে তাহাকে গৃহমধ্যে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তোমাকে আমি যে ছাতাটি দিয়েছিলাম, তা কোথায় গেল ?"

গদাধর কহিল, "ছাতাটা, কাল একজন বুড়ো মুসলমান ভিখারীকে দিয়েছি। তাকে দেবার জন্যেই আমি ছাতাটী আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলাম। আমার নিজের ছাতা ব্যবহারের কোন আবশ্যক নেই।"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে। জুতো ?

গদাধর। জুতো পরবার উপায় নেই। মশায় যে জুতো দিয়েছিলেন, তা পোরে আমার পায়ে কয়েকটি ফোস্কা হয়েছে। আপনি বলেছিলেন যে, পা দুখানি রক্ষা করবার

জন্যে জুতো ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আমার পক্ষে তাতে কিন্তু বিপরীত ঘটেছে। যে পা চিরদিন নিরাপদ্ ছিল, জুতো পোরে তার বিপদ্ ঘটেছে। তাকে রক্ষা করতে পারি নি। কিন্তু কষ্ট স্বীকার করেও পরে আমাকে জুতো পরা অভ্যাস করতে হবে।

কৃষ্ণ। কেন?

গদা। আপনি বলেছিলেন যে, কলকাতার স্কুলে পড়তে হলে, অন্য ছেলেদের মুখের ঠাট্টা বিদ্রূপ বন্ধ রাখবার জন্যে জুতো—জুতো পরা—একান্ত আবশ্যক হবে।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ। তোমাকে শীঘ্রই কলকাতায় যেতে হবে। সেখানে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলি তোমায় লাভ করতে হবে।

গদা। আমাকে সেখানে কবে যেতে হবে?

কৃষ্ণ। এটা জুন মাস। আগামী ইংরাজী বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রাবেশিকার পরীক্ষা হবে। তোমাকে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। যত শীঘ্র তুমি কোন স্কুলে গিয়ে ভর্ত্তি হতে পার, ততই ভাল।

গদা। আপনি যেদিন অনুমতি করবেন, আমি সেই দিনই কলকাতায় যেতে প্রস্তুত আছি।

কৃষ্ণ। বেশ, তা হলে তুমি তোমার বাপ মার সঙ্গে পরামর্শ করে, আগামী সপ্তাহেই কলকাতা যাবার জন্যে প্রস্তুত থেক।

গদা। আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

কৃষ্ণ। তা হলে, আগামী সোমবারে বাড়ী থেকে কাপড় চোপড় গুছিয়া নিয়ে আমার এখানে এস। এখান থেকে নিত্য কলকাতায় লোক যায়, আমি তাদের কারও সঙ্গে তোমাকে কলকাতা পাঠিয়ে দিব।

গদা। আমার পরণে এই যে কাপড়খানি দেখছেন, এ ছাড়া বাড়ীতে আমার আর একখানি কাপড় আছে। 'চোপড়' আর কিছু নেই।

কৃষ্ণ। আচ্ছা, আচ্ছা, "চোপড়ের" বন্দোবস্ত আমি করব। তোমাকে এই বেশে কলকাতায় পাঠাতে পারব না।

এই বলিয়া কৃষ্ণ চাটুর্য্যে হাঁকিলেন, "অম্বা—অম্বিকা—মা! ওখানে আছ কি?"

অম্বিকা গৃহান্তরে বসিয়া অতি সূক্ষ্ম সূচিকার্য্যে নিরতা ছিল। তাহার সুদক্ষ অঙ্গুলি-সকলের শিক্ষকতায়, জড় ধাতুনির্ম্মিত সূচি অপূর্ব্বপ্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে বস্ত্রপ্রান্তে বিচিত্র চিত্র সকল চিত্রিত করিতেছিল। অম্বিকা পিতার আহ্বান শুনিয়া কহিল, "যাই বাবা।"

তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্টা দেখিয়া, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় কহিলেন, "মা অম্বিকা, গদাধর কলকাতায় যাবে। ওর কাপড় চোপড় ভাল রকম নেই। তুমি সকল সংগ্রহ করে রেখ।"

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা! আমি সমস্ত আনিয়ে রাখব।

তাহার পর অম্বিকা গদাধরের প্রতি নেত্রপাত করিয়া কহিল,

"গদাই, তোমার কি কি চাই।" গদাই যদিও অম্বিকা অপেক্ষা দুই বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ, তথাপি অম্বিকা, গ্রাম্য পাদুকাবিহীন সামান্য বস্ত্রপরিহিত এবং প্রথম সাক্ষাৎকালে মূর্খ গদাধরকে গদাই বলিয়াই সম্বোধন করিয়াছিল। গদাই সম্বোধনে গদাই-এর প্রতি অম্বিকার কোন প্রকার অবজ্ঞাভাব ছিল না। সহপাঠীকে যে ভাবে কেহ সম্বোধন করিয়া থাকে, এ সেই প্রকার সহজ সরল সম্বোধন। পণ্ডিতা ও মান্যা অম্বিকাকে গদাধরও তুমি বলিয়া সম্বোধন করিত। সে বয়ঃকনিষ্ঠা এবং স্ত্রীজাতীয়া বলিয়া যে সে তাহাকে 'তুমি' বলিত এমত নহে ; প্রথম সাক্ষাৎকালে অশিক্ষিত গদাধর 'আপনি' শব্দ ব্যবহারে সম্যক্‌প্রকার দীক্ষিত হয় নাই।

অম্বিকার প্রশ্ন শুনিয়া গদাধর কহিল, "আমি কথনও কলকাতায় যাই নি। তবে, সেখানে ভদ্রসমাজে স্থান পাবার জন্যে কি বেশের দরকার হবে তা তোমাকে কেমন করে বলব ?"

কৃষ্ণ। তুমি, মা, গদাধরকে কিছু জিজ্ঞাসা কোর না। তোমার আপনার বুদ্ধি মত সব সংগ্রহ কর।

অম্বিকা পিতার নিকট বসিয়া, সে সকল জিনিষ গদাধরের আবশ্যক হইবে বলিয়া মনে করিল, একখণ্ড কাগজে তাহা লিখিল। তাহার পর, আবার গদাধরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "গদাই, তোমার জন্যে পিরাণ তৈরী করতে দিতে হবে, তুমি উঠে দাঁড়াও, আমি তোমার মাপ নিই।"

ষোড়শবর্ষীয়া এক পূর্ণায়তা যুবতী, এক যুবকের কণ্ঠের বক্ষের হস্তের পরিমাণ স্বহস্তে গ্রহণ করিবে। তোমরা পাঠিকা।

তোমরা হয়ত এই অসম্ভব ব্যাপারটাকে সন্দেহ-কুটিল-কটাক্ষে নিরীক্ষণ করিবে। তোমরা অপাপবিদ্ধমনা ললিতলোচনা অম্বিকার ছলনাবিরহিত মুখমণ্ডল অবলোকন কর; দেখিবে, তাহাতে স্বর্গের সারল্য বর্ণনাতীত প্রভা বিস্তার করিতেছে। সে অত্যন্ত সহজে গদাধরের কৃষ্ণভূধর-প্রতিম অনাবৃত দেহে তাহার অত্যন্ত সুন্দর, যেন পুষ্পদলবিনির্ম্মিত, করতল বিন্যস্ত করিয়া, এবং তাহা বেষ্টন ও পরিবেষ্টন করিয়া, পরিমাপক রজ্জুর সাহায্যে তাহার পরিমাণসকল গ্রহণ করিয়া, তাহা লিপিবদ্ধ করিল। গদাধরের অসিত গাত্রে স্মিতমুখী অম্বিকার লাবণ্যময় বাহুযুগল কি অতুল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছিল! যেন জলদাবৃত নীরদ-গাত্রে সৌদামিনী ক্রীড়া করিতেছিল; যেন প্রস্তরময় ভূধরের ক্রোড়ে নির্ঝরিণীর শীতল রজতধারা নৃত্য করিতেছিল; যেন কৃষ্ণশিলা-বিনির্ম্মিত দেবমূর্ত্তির গলে বিচিত্র কুসুমদাম-বিরচিত অপূর্ব্ব মালা দুলিতেছিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীজ্ঞানদাপ্রসন্ন বসু মল্লিক।

অপরিমিত দেহ-গৌরব কোনক্রমে পরিমিত বস্ত্রাদিতে পরিবেষ্টিত করিয়া, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের পরিচিত কতকগুলি কলিকাতা-যাত্রী নৌকারোহীর সহিত গদাধর কলিকাতায় আসিল। তথায় এক ছাত্রাবাসে সে স্থান প্রাপ্ত হইয়া, অল্পদিন মধ্যে পরীক্ষিত হইয়া এক স্কুলে ভর্ত্তি হইল।

কয়েক দিনের মধ্যেই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ বুঝিলেন যে গদাধর অসাধারণ বালক; তাহার মত বালককে ছাত্ররূপে পাইয়া, তাঁহাদের বিদ্যালয় ধন্য হইয়াছে। তাহার অসামান্য প্রতিভা শিক্ষকগণের পরিপক্ক বিদ্যাগৌরবও ম্লান করিয়া দিল। তাঁহারা তাহাকে যে সকল প্রশ্ন করিতেন, সে অবাধে তাহার সম্যক্ সদুত্তর প্রদান করিতে পারিত; বরং অনেক সময় তাহার কূট প্রশ্নের তাঁহারা সদুত্তর দিতে সমর্থ হইতেন না।

গদাধরকে পাইয়া সহপাঠী ছাত্রগণও সুখী হইল। ক্রীড়া-ক্ষেত্রে তাহার অমিত বল অন্য বিদ্যালয়ের ক্রীড়া-প্রতিদ্বন্দ্বী বালকগণকে সর্ব্বদা পরাজিত রাখিত। গদাধরের সহপাঠীগণ গদাধরকে লইয়া ফুটবল ক্রীড়ায় দুইবার দুইটি ক্রীড়া-দক্ষ বিখ্যাত ইংরাজদলকে পরাজিত করিল। ইহাতে তাহাদিগের গৌরব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল।

কলিকাতায় কয়েকমাস অবস্থিতি করিবার পর গদাধরের মনে হইল যে, যদি কাহারও গলগ্রহ না হইয়া স্বাবলম্বন দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে সে তাহার শুভাকাঙ্ক্ষিগণের মনের সুখবিধান করিতে পারিবে। সে ভাবিল, কি উপায়ে পাঠের অনিষ্ট না করিয়া সে অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট সে আপনার মনোগত অভিলাষ ব্যক্ত করিল। তাঁহাদের মধ্যে একজন তাহার বাসনা পূর্ণ করিলেন। তাঁহার এক ধনাঢ্য পরিচিত ব্যক্তি আপন শিশু বালকদিগের জন্য একজন গৃহ-শিক্ষক অনুসন্ধান করিতেছিলেন। তিনি গদাধরকে তথায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। গদাধর এই ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে বাসস্থান, আহার এবং দশ টাকা হিসাবে বেতন প্রাপ্ত হইল। ইহাতে তাহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়কে পত্র লিখিতে বসিল ;—

"মহাশয়, আমার অসংখ্য প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আমি মহাশয়ের প্রেরিত পত্র ও কুড়িটি টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা না করিয়া একটা কায করিয়াছি, ভরসা করি, মহাশয় ইহার জন্য আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। এখানে আমি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে গৃহ-শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছি। নিজের ভরণপোষণের জন্য আমি উপার্জ্জন করিতে শিখিয়াছি শুনিয়া মহাশয় নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন ; কিন্তু আমি এইরূপে যে একটি দরিদ্র বালকের ভরণপোষণের অত্যন্ত সুখ হইতে মহাশয়কে বঞ্চিত করিতেছি, তাহাতে আশঙ্কা হয় যে,

আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন না। মহাশয়ের নিকট হইতে পত্রোত্তর প্রাপ্ত হইলে, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক পত্রের উত্তর দিয়া সুখী করিবেন। ভরসা করি, ভগবানের কৃপায় আপনি এবং অম্বিকা সুস্থ আছেন। আমি বেশ ভাল আছি। নিবেদন ইতি।"

কয়েক দিন পরে গদাধর, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের নিকট হইতে পত্রোত্তর প্রাপ্ত হইল—"গদাধর, আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। অম্বিকা ভাল আছে; কিন্তু আমার নিজের দেহ বিশেষ সুস্থ নহে; এ বয়সে ইহা অপেক্ষা অধিক সুস্থ থাকিবার ভরসা নাই। তুমি যে আপনার ভরণপোষণের ভার আপনিই গ্রহণ করিবে, ইহা আমি আগেই জানিতাম। পরান্নজীবী হইবার জন্য ভগবান তোমার মত বালককে সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার কৃপায় কেবল-মাত্র আপনার নহে, অনতিবিলম্বে বহুলোকের ভরণ পোষণের ভার তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে। তোমার দেহের অমিত বল তিনি বৃথায় সৃষ্টি করেন নাই। তোমাকে তিনি অলোকসামান্যা প্রতিভা অকারণ প্রদান করেন নাই। মনে রাখিও, দেশের এবং দশের কল্যাণের জন্য তোমার সৃষ্টি হইয়াছে। বৎস গদাধর! আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, যেন তোমার দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়; যেন তোমার গৌরবে বাঙ্গালী জাতি গৌরবান্বিত হইতে পারে। তোমাকে এই গৌরবে গৌরবান্বিত দেখিবার আগে যদি আমার মৃত্যু ঘটে, জানিও বৎস, মৃত্যুর পরপারে থাকিয়াও আমি ধন্য হইব। পরীক্ষার পর যখন বাটী আসিবে, তখন

আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। ইতি। আশীর্ব্বাদক শ্রীকৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায়।”

এই ক্ষুদ্র পত্রে গদাধরের উৎসাহ-অনল বিশেষভাবে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। কি অপরিমিত বল লইয়া, কি আবেগময় আগ্রহ লইয়া সে পাঠ্যপুস্তকসকলে মনোনিবেশ করিল, তাহা বর্ণনা করিতে, আমি ক্ষুদ্র লেখক চেষ্টা করিব না। পাঠের সময় তাহার আদরময়ী মাতাকে মনে পড়িত, সেই মাতাকে সুখী করিতে হইবে; পিতার স্নেহপ্লাবিত মুগ্ধ মুখ মনে পড়িত, সেই পিতার সেই মুখ উজ্জ্বল করিতে হইবে; জ্ঞানদাতা কৃষ্ণ চাটুর্য্যের পত্রের কথা মনে পড়িত, দশের কল্যাণ সাধিতে হইবে, বাঙ্গালী জাতিকে গৌরবান্বিত করিতে হইবে, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল করিতে হইবে। এই চিন্তার সহিত গদাধরের হৃদয়মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইত। তাহার অক্লান্ত পরিশ্রম-সময়ে একান্ত পরাজিত হইয়া, অধীত পুস্তকসকল শ্লথদেহে বিরাজ করিত। নিশীথে, মৃতপ্রদীপের তৈলবক্ষ সে উৎসাহ-অনলে পরিশুষ্ক হইয়া যাইত। এক অচিন্ত্য অতি মহান্ গৌরবশিখরে এক অচিন্ত্য শক্তি তাহাকে যেন অতি বলে আকর্ষণ করিতেছিল।

যে ধনাঢ্যের বাটীতে গদাধর স্থান পাইয়াছিল, তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসন্ন বসু মল্লিক। জ্ঞানদা বাবু প্রবীণ ব্যক্তি,—বয়সে—জ্ঞানে নহে। বাল্যকালে তিনি মাতার আদর যে পরিমাণ লাভ করিয়া-

ছিলেন, মা সরস্বতীর তাদৃশ কৃপালাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু ইহাতে তিনি ক্ষুণ্ণ ছিলেন না। তিনি মনে করিতেন, অর্থার্জ্জনের জন্যই বিদ্যার্জ্জনের আবশ্যক। তাঁহার মত ধনশালী লোকের পক্ষে বিদ্যার্জ্জনের আবশ্যকতা নাই। তাঁহার বালকগণের পঠনাসম্বন্ধে তিনি গদাধরকে বারবার বলিতেন,—উহাদের চাকুরী করিয়া খাইতে হইবে না; পাঠের জন্য উহাদের প্রতি বিশেষ পীড়াপীড়ির আবশ্যক নাই। জ্ঞানদা বাবু, কলিকাতার অন্যান্য অনেক ধনী ব্যক্তির ন্যায়, একটু প্রচুরপরিমাণে হুইস্কি-সুধা পান করিতেন। কিন্তু এই মদ্যপায়ী মূর্খ জমীদার বাবুর এক অসাধারণ গুণ ছিল। সমস্ত কলিকাতার মধ্যে তৎকালে তাঁহার মত, সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ অন্য কেহ ছিল না। তাঁহার সুশিক্ষিত সুদক্ষ করাঘাতে মৃদঙ্গসকল মেঘগর্জ্জন করিত, তাঁহার তান-লয়-মান-সংযোজিত গীতে, মুগ্ধ শ্রোতার চক্ষু বারিবর্ষণ করিত।

সুরাপ্রমোদিত চিত্তে তিনি কোন কোন দিন গদাধরের নিকটে আসিয়া বসিতেন। বলিতেন, “এস, পাখোয়াজ বাজাতে শেখ।” গদাধর অবকাশ পাইলেই তাঁহার উৎসাহে “তেটেকেটে” বাজাইতে অভ্যাস করিত। “ঠায়”, “দুন”, “চৌদুন” অভ্যস্ত হইল। অঙ্গুলিসকল সুশিক্ষিত হইল। কয়েক মাস মধ্যে মেধাবী কার্য্যকুশল গদাধর মৃদঙ্গ-আলাপে জ্ঞানদা বাবুকে মোহিত করিয়া দিল। শিক্ষক ছাত্রকে যে স্নেহচক্ষে অবলোকন করিয়া থাকেন, জ্ঞানদা বাবু তাঁহার বাদ্যশিষ্য গদাধরকে সেই

স্নেহচক্ষে অবলোকন করিলেন। ইহাতে জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে অবস্থিতি করা গদাধরের পক্ষে বিশেষ সুখকর হইয়া উঠিল। পুত্রস্থানীয় হইয়া সে তাঁহার বাটীতে বাস করিতে লাগিল।

রতন সিং দোবে ভারি পালোয়ান। তাহার বড় আক্ষেপ, কলিকাতাতে তাহার এমন প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই যে, তাহার সহিত সে কুস্তি লড়ে। সে জ্ঞানদা বাবুর বাড়ীতে থাকিত। বাবু তাহকে মাসে চল্লিশ টাকা হিসাবে দরমাহ দিতেন; উপরন্তু তাহার আহারের জন্য পর্য্যাপ্তপরিমাণ চানা, আটা, ঘিউ ইত্যাদি সরবরাহ করিতেন। বেতন দিতেন, আহার দিতেন, কিন্তু জ্ঞানদা বাবু এই পালোয়ানটিকে মোটেই পছন্দ করিতেন না। বোধ হয়, তাহার সাহঙ্কার উক্তিগুলি তাঁহার মনোমত হইত না। তবে, অর্থব্যয় করিয়া তাহাকে গৃহে স্থান দিয়াছিলেন কেন? কে বলিবে কেন? তুমি কি অকারণ কোন কার্য্য কর না? অথবা তুমি যে সকল কার্য্য কর, তাহার সকলগুলিরই কি এক একটি কারণ খুঁজিয়া পাও? অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে শান্ত ঘোটক ক্রয় না করিয়া, আরোহণ জন্য দুর্দ্দমনীয় অশ্ব ক্রয় করে কেন? দুর্দ্দমনীয়তা দমনের একটা যে অহঙ্কার আছে, তাহার সাফল্যলাভের জন্য। রতন সিংএর বীরত্ব এক দিন চূর্ণ করিতে পারিবেন, এই আশায়—এই আনন্দের পরিণতিলাভের জন্য জ্ঞানদা বাবু অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাকে গৃহে স্থানদান করিয়াছিলেন।

এক দিন রতন সিং কৌপীন পরিয়া, সর্ব্বাঙ্গে ধূলি অনুলেপন করিয়া, উরুপ্রদেশে চটাপট চপেটাঘাত করিয়া

"বৈঠক" করিতেছিল। উপরে জ্ঞানদা বাবু একটি গুরু লৌহপেটক স্থানান্তরিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি রতন সিংকে উপরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "রতন সিং, এই বাক্সটি ধরে পাশের ঘরে রাখ।" রতন সিং জ্ঞানদা বাবুর মুখের উপর উত্তর করিল, "বাবুজী, ইহা কুলির কার্য্য, আমি ইহা করিব না। আমি কুলি নহি, আমি পালোয়ান।" সেই লৌহ-পেটকের গুরুত্ব পাঁচ মণের অধিক। গদাধর একা অক্লেশে সেই পেটক উত্তোলন করিয়া পার্শ্বের ঘরে রাখিল। জ্ঞানদা বাবু মুগ্ধনেত্রে তাহার ক্ষুদ্রভূধরপ্রতিম অবয়বের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনে করিলেন, ইহার দ্বারা রতন সিংএর দর্প চূর্ণ করিতে হইবে। তিনি গদাধরকে ডাকিয়া কহিলেন, "গদাধর তুমি ব্যায়াম অভ্যাস কর, কুস্তিতে রতন সিংকে হারিয়ে দিতে হবে।"

গদাধর বলিল, এক্ষণে পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, পরীক্ষার পর সে বাটী যাইবে; বাটী হইতে ফিরিয়া, তাঁহার আজ্ঞানুরূপ কার্য্য সে করিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অতুলানন্দ চৌধুরী।

আমরা এই আখ্যায়িকার প্রথম পরিচ্ছেদে চারুশশী নাম্নী এক বালিকার কথা বলিয়াছিলাম। বালিকারা চিরকাল বালিকা থাকে না। একদিন তাহারা পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া, কৃষ্ণকেশের আন্দোলনে, ভ্রূর আকুঞ্চনে, নয়নের সম্মোহন-বাণবিক্ষেপণে এবং ললিত বিগ্রহের লাবণ্যহিল্লোলসঞ্চালনে সুস্থিরা স্থিরাকে সম্যক্ প্রকারে অস্থিরা করিয়া তুলে। তখন আমরা তাহাকে যুবতী বলি। এক্ষণে চারুশশী যৌবনের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহার ঢল ঢল যৌবন-নদী কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া, কল কল নাদে উছলিয়া পড়িতেছিল।

এক্ষণে সে আর পিতৃগৃহে বাস করিত না। শ্রীযুক্ত গোবিন্দ লাল মুখোপাধ্যায় তাহাকে উদ্বাহ-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়া, বহু পূর্ব্বে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সে শ্বশুরালয় শ্বশুর, শ্বশ্রূ এবং শ্বশ্রূবিহীন। একটী শ্মশ্রু-হীন বয়ঃপ্রাপ্ত বালক সে আলয়ের কর্ত্তা। তিনি একা চারু-শশীর ভর্ত্তা। চারুশশী ভাত খাইবার সময় ভর্ত্তার ভর্ত্তৃত্ব মানিত বটে, কিন্তু আমরা জানি, তাঁহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা সে কখনও আবশ্যক বিবেচনা করিত না। কেন করিবে? পীবরোন্নত

যৌবনের মহিমা-শিখরে বসিয়া, পুষ্পধন্বার দ্বারা প্রক্ষিপ্ত কুসুমের রাগে অঙ্গরাগ করিয়া, কোন্ মহিমময়ী কবে কাহার কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছে?

সেই কর্ত্তৃত্বহীন ভর্ত্তার নাম শ্রীমান্ অতুলানন্দ চৌধুরী। তিনি কলিকাতানিবাসী; ঝামাপুকুরে তাঁহার বাস। এই অতুলানন্দের কমনীয় রূপ। শুভ্র অকুঞ্চিত ললাটে কৃষ্ণ কুঞ্চিত সমবিভাগে বিভক্ত কুন্তলদল। কুন্তলতলে ভ্রমরসমাশ্রিত পদ্মের মত নয়নাভিরাম লোচনদ্বয়। সুদীর্ঘ—যেন শ্বেত মর্ম্মরবিনির্ম্মিত নাসা। মণিমধ্যে পদ্মরাগ সে অধরের তুলনা—তেমনই রক্ত জ্যোতিস্ময়, কিন্তু কোমল। অষ্ট্রীচ পক্ষীর ডিম্বের ন্যায় সুগোল শুভ্র শ্মশ্রুশূন্য কপোল। রূপের কথা শুনিলে; এইবার এই অতুলানন্দের গুণের কথা শুন। বিয়ের পূর্ব্বে তিনি বি-এ পড়িতেন, এবং বিয়ের পর তিনি বি এ পাশ করিতে সমর্থ না হইয়া চারুশশীর বাহুপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু বি-এ পাশ করিতে না পারিলেও তিনি সহাজে নানা স্থানে চাকুরী সংগ্রহ করিতে পারিতেন। ইহাতে তাঁহার স্বরূপ তাঁহার বিশেষ সহায় হইত। এক্ষণে ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি জ্ঞানদা বাবুর বিপুল জমিদারীর সহকারী ম্যানেজার হইয়াছিলেন। তাঁহার মাসিক বেতন একশত মুদ্রা, এবং বেতন ছাড়া এদিকে তাঁহার দু' পয়সা……ছিল। অতুলানন্দ বাবু ব্রাহ্মণ হইলেও, তাঁহার কায়স্থ প্রভুর পানপাত্রের প্রসাদ একটু বেশী রকম পান করিতেন।

একদিন নিশীথকালে, আহারাদির পর চারুশশী, প্রদীপালো-

কিত গৃহে শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাম্বুল চর্ব্বণ করিতেছিল। কখনও অঙ্গুলি দ্বারা অধর টানিয়া ধরিয়া নিম্ননয়নে তাহার রক্ত-শোভা অবলোকন করিতেছিল; কখন পদদ্বয় দোলাইয়া পদতলের অলক্তরাগ নিরীক্ষণ করিতেছিল; কখন মণিবন্ধে নিবদ্ধ নূতন সুবর্ণ-কঙ্কণের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিল। "টং টং"। চারু-শশী শব্দানুসরণ করিয়া ব্র্যাকেটের উপর স্থাপিত ক্লকের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। এগারটা বাজিয়া গেল। ওগো চারুশশীর বর! শীঘ্র গৃহে ফির। এইবার তিনি ফিরিবেন। মনিবের বাড়ী আহারের নিমন্ত্রণ—তা' যদি নয়টার সময় আহারে বসিয়া থাকেন, সাড়ে নয়টার সময় আহার শেষ হইয়াছে। তাহার পর আরও অর্দ্ধ ঘণ্টা পর—দশটা। এখন এগারটা বাজিল, এইবার তিনি বাড়ী ফিরিবেন। চারুশশী বাতায়নপথে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল; দেখিল, দূরে একটা গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, রাস্তা একান্ত জনতাশূন্য হইয়াছে। ঝি থাকিলে, তাহাকে ডাকিয়া চারুশশী গল্প করিত; কিন্তু সে বোনপোর পীড়া উপলক্ষ করিয়া পটল-ডাঙ্গার বাজারে বারওয়ারীর যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। বাড়ীতে ছিল কেবলমাত্র একটি চাকর। সে অত্যন্ত বৃদ্ধ, এজন্য বহি-র্ব্বাটীতে শুইয়াছিল।

ঘরে একটা সামান্য শব্দ হইল। চারুশশী একটু আশঙ্কিত হইল। বোধ হইল যেন শব্দটা খট্টাঙ্গতল হইতে উত্থিত হইল। চারুশশী কি খট্টাঙ্গ-তলে দৃষ্টি সঞ্চালন করিবে? না, না, ইহা অত্যন্ত অসম্ভব। তাহার বুকের ভিতর, তুমি ত

জান আমার পাঠিকা,—কি হইতেছিল। বিলম্বে গৃহপ্রত্যা গমনের জন্য যে সকল মধুমাখা বাক্য তাহার স্বামীর প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা খট্টাঙ্গপার্শ্বে বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে চারুশশী হৃদয় মধ্যে রচনা করিয়া রাখিয়াছিল—হৃৎপিণ্ডের ঘাত-প্রতিঘাতে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। এখন কোনও গতিকে তাঁহাকে এনে দাও ঠাকুর!

আমার এক মহানাস্তিক বন্ধু বলিতেন, "ঠাকুরের কাণ মলিয়া দিতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই ঠাকুরজাতীয়দের শ্রবণেন্দ্রিয় নাই।"

কাঞ্চনপল্লীর গুপ্ত কবিও গাহিয়াছিলেন,—

"হায় হায় কব কায় ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হয়ে তুমি হলে কালা।

ঠাকুর বাস্তবিক শ্রবণেন্দ্রিয়শূন্য কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। শুনিয়াছি ডাকার মত ডাকিতে পারিলে দয়াল ঠাকুর শুনিতে পান। পুরাকালে—যখন স্বয়ং ভগবানেরও সম্পূর্ণ নর-মূর্ত্তি কল্পিত হয় নাই—তখন প্রহ্লাদ তাঁহাকে ডাকিয়াছিলেন, শুনিয়াছি সে ডাক শুনিয়া, সেই দয়াল ঠাকুর আসিয়াছিলেন, আসিয়া দয়া করিয়া প্রহ্লাদকে পিতৃহীন করিয়াছিলেন। যখন মাতার দুঃখে ক্ষুব্ধ শিশু ধ্রুব তাঁহাকে 'পদ্মপলাশ লোচন' বলিয়া ডাকিয়াছিল, তখন তিনি তাহাকে অন্ধ করিয়া দেখা-দিয়াছিলেন। আর যখন কৌরব-সভায় দ্রৌপদী অপমানিতা হইয়া ক্ষোভে, দুঃখে লজ্জায় তাঁহাকে 'লজ্জানিবারণ' বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তখনও

তিনি আসিয়াছিলেন, আসিয়া তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে আপনার অন্তর্হীনতা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন। আমাদের বিশ্বাস, এক্ষণে চারুশশী ঠাকুরকে ডাকার মত ডাকিয়াছিল। বোধ হয়, তিনি তাহা শুনিতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে শুনাটা একটু "উল্টা বুঝিলি রাম" গোছের শুনা হইয়াছিল। কেননা, তিনি গৃহমধ্যে চারুশশীর মনোচোরের পরিবর্ত্তে, একটা আসল সজীব চোরকে সশরীরে আনিয়া দিয়াছিলেন। চোর—বিশ্রী ও কালো। অতুলানন্দ বাবু তাঁহার অতুল রূপ লইয়া চারুশশীর হৃদয় মধ্যে যে আনন্দ-প্রবাহ প্রবাহিত করিতে পারিতেন, এ বিশ্রী কালো চোর তাহা করিতে সমর্থ হয় নাই। সে তাহার বক্ষের ভিতর অতি ভয়ঙ্কর ভাবে দুরু-দুরু ত্রাস সঞ্চারিত করিয়াছিল।

দারুণ বিভীষিকায় চারুশশীর যৌবনদীপ্ত দেহের তপ্ত রক্ত জল হইয়া গেল। সে অর্দ্ধস্ফুট বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া, ছিন্নমূল কদলীকাণ্ডের ন্যায় সহসা ভূতলে পতিত হইল। বর্ব্বর চোর, স্ত্রীলোকের—বিশেষতঃ যুবতীর,—সম্মান জানিত না। সে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহার অনিন্দ্য অঙ্গ হইতে অলঙ্কার সবলে সংগ্রহ করিল। অঞ্চল হইতে পরিমার্জ্জিত কুঞ্চিকা-গুচ্ছ গ্রহণ করিয়া, তদ্দ্বারা পেটক সকল উদ্ঘাটিত করিল, এবং তাহার মধ্য হইতে যাবতীয় মূল্যবান্ দ্রব্য এবং প্রভুকে প্রবঞ্চনা করিয়া যে প্রচুর অর্থ অতুলানন্দ বাবু তন্মধ্যে সযত্নে সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, তাহা অপহরণ করিল। অতি সহজে কৃতকার্য্য হইয়া, চোর অপহৃত দ্রব্যসকল বস্ত্রমধ্যে লইয়া আনন্দচিত্তে

(চোরের চিত্তে কখন কি আনন্দ আসে?) নিঃশব্দপদক্ষেপে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া, বহির্দ্বারের অর্গল উন্মোচন করিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া কে?

চোর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল—পলাইবে। বৃথা চেষ্টা। যে ব্যক্তি বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল, সে গদাধর। সেদিন আহারের পূর্ব্বে এবং আহারের পর অতুলানন্দ বাবু একটু বে-আন্দাজ রকম পান করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি এরূপ উত্থানশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, পদব্রজে বা শকটারোহণ করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমন করা তাঁহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বিজড়িতস্বরে কহিয়াছিলেন—"গদাধর ভাই, আমি আজ রাত্রে বাড়ী ফিরতে পারছিনে। তুমি আমার বাড়ীতে যদি এ খবরটা দিতে পার, আর বাড়ীর খবরটা নিতে পার, তা হলে বড় ভাল হয়।" গদাধর তাহা শুনিয়া, অল্পকাল মধ্যে ঝামাপুকুরে অতুলানন্দ বাবুর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু অতুলানন্দ বাবুর ভৃত্যের নামটি সহসা স্মরণ না হওয়ায়, তাহা স্মরণ করিবার জন্য কয়েক মুহূর্ত্ত তথায় অবস্থিতি করিল। তৎপরে বিস্মিত হইয়া দেখিল, দ্বারটি আপনা হইতে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হইল এবং উন্মুক্ত দ্বারপথে এক অপরিচিত ব্যক্তি, বস্ত্রমধ্যে কতকগুলি দ্রব্য লইয়া নির্গত হইবার সময়, তাহাকে দেখিয়া সহসা অতিবেগে পলায়নপর হইল।

চোরের পলায়ন অবলোকন করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে গদাধরের মনে প্রতীতি জন্মিল যে, এই অপরিচিত ব্যক্তি গৃহমধ্যে কোন

গুরুতর অসৎকার্য্য সিদ্ধ করিয়াছে। সে তৎক্ষণাৎ তীরতীব্রবেগে তাহার অনুসরণ করিল, এবং অক্লেশে তাহাকে ধৃত করিয়া, অতুলানন্দ বাবুর গৃহদ্বারে ফিরিয়া আসিল, এবং তাহার ভৃত্যের সাহায্যে অপহৃত দ্রব্যসকল উদ্ধার করিয়া, অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় গদাধর মৃতকল্পা চারুশশীর চৈতন্য-বিধান করিল।

অতুলানন্দ বাবুর নিকট আসিয়া, গদাধর কহিল, "আজ রাত্রেই আপনাকে বাড়ী ফিরতে হবে। বাড়ীতে চোর ঢুকেছিল, এজন্য আপনার স্ত্রী ভারি ভয় পেয়েছেন।"

অতুলানন্দ স্বপ্নের ঘোরে গাহিল,—

"—গো শঙ্করি!
নৌকা হ'ল বাণচাল বল কি করি।"

গদাধর দেখিল, এ সুরাপ্রমোদিতের চৈতন্য-সম্পাদন চেষ্টা বৃথা। অতএব সে ভয়ব্যাকুলা চারুশশীর নির্দ্দেশমত অতুলানন্দ বাবুর বাটীতে আসিয়া শয়ন করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রেমের বিচিত্র গতি।

উপন্যাস-লেখকদিগের প্রধান কার্য্য, একটি আগ্রহময়ী প্রেম-লীলা সবিস্তারে বর্ণনা করা। আমি এ যাবৎ এই মহৎ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারি নাই বলিয়া পাঠকগণের নিকট করযোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। এক্ষণে এই ক্রটীর নিরাকরণ জন্য চেষ্টা পাইব।

কিন্তু আমার একটি বিশেষ অসুবিধা আছে। আমার নায়কটি রূপ এবং অর্থহীন। আমরা জানি, প্রেমিকার মন, ভ্রমরের মত রূপ-পদ্মের চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং অর্থ ব্যতীত প্রেম-লীলা একবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে। এজন্য বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখক জগৎসিংহকে, প্রতাপকে, গোবিন্দলালকে, নগেন্দ্রনাথকে রূপৈশ্বর্য্যসনাথ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ প্রকার এক একটি নায়ক সৃষ্টি করিতে আমি যদি সমর্থ হইতাম, তাহা হইলে, ঝাঁকে ঝাঁকে বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা-সকলকে আমার এই উপন্যাস মধ্যে সমবেতা করিয়া, ইহার বিশেষরূপ উৎকর্ষ বিধান করিতে পারিতাম, এবং পাঠকগণের চিত্ত-বিনোদনার্থে তাহাদের মধ্যে কাহাকেও জল-তরঙ্গে সঞ্চালিত করিয়া, কাহাকেও বা তন্মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া, একটা কৌতুকাবহ

ব্যাপারের অবতারণা করিতাম। হায়! আমার মন্দাদৃষ্ট, আমার গদাধর কালো। তুমি আমি "কালা আদ্‌মী"র মত কালো নহে,—তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী কালো।

তবে কি আমার এই কালো নায়কটিকে তোমরা কেহ ভালবাসিবে না? তবে রাজাধিরাজ হারুন্‌-উল্‌-রসিদের বিপুল ঐশ্বর্য্য এবং ভাস্করপ্রভ মোহন রূপ পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার মহিষীরা কেন কদর্য্য কাফ্রি ক্রীতদাসের অনুরক্তা হইয়াছিল?—তুমি বলিবে, ইহা প্রেম নহে, ইহা মূর্ত্তিমান পাপ। তবে মহারাজা মান্ধাতার কমনীয়া কন্যাগণ কেন উদ্‌গ্রীব হইয়া বৃদ্ধ, দরিদ্র, তপঃক্লিষ্ট দেহ, বহুজলবাসে নির্ব্বাপিত-প্রেমাগ্নি সৌভরিকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছিল?—তুমি বলিবে, মহর্ষির তপঃ-প্রভাবে রাজকন্যাগণ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তবে জগতের শ্রেষ্ঠ কবির প্রতিভা-প্রসূতা অপূর্ব্বা দেস্‌দিমনা কেন কৃষ্ণকায় মূর ওথেলোকে ভালবাসিয়াছিল?—তুমি বলিবে, ভ্রান্তি, ভ্রান্তি,—ওথেলোর হাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া দেস্‌দিমনা এই ভ্রান্তির প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। তবে কৃষ্ণকায় ত্রিভঙ্গ রাখাল-বালকের অদর্শনে মূর্ত্তিমতী প্রেম, যমুনাতীরে কেন গাহিয়াছিলেন,—

"জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তারকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥"

তুমি বলিবে, ইহাও প্রেম নহে, ইহা ঈশ্বরানুরক্তি বা ভক্তি।

তা, পাপে হউক, মোহে হউক, ভ্রান্তিতে হউক বা ভক্তিতে হউক, তোমরা ত দেখিলে যে কালোকে—দরিদ্রকে ভালবাসিবার লোক এ পৃথিবীতে আছে। তোমরা আবার দেখিবে, গদাধরকেও ভালবাসিবার লোক এ পৃথিবীতে দুষ্প্রাপ্য নহে।

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, ভয়ব্যাকুলা চারুশশীর নির্দ্দেশমত গদাধর অতুলানন্দ বাবুর বাটীতে আসিয়া শয়ন করিয়াছিল। বহির্ব্বাটীতে উপযুক্ত শয্যাদি প্রস্তুত না থাকায়, এবং দূরে থাকিলে, চারুশশীর বিভীষিকা বর্দ্ধনের সম্ভাবনা থাকায়, গদাধর অনন্যোপায় হইয়া অন্তঃপুর মধ্যে চারুশশীর শয্যাগৃহের অন্যপ্রান্তে শয়ন করিয়াছিল।

গৃহতলে আপন শয্যা হইতে কিছু দূরে চারু- শশী গদাধরের জন্য একটি শয্যা রচনা করিয়াছিল। তাহাতে শয়ন করিয়া গদাধর অবিলম্বে নিদ্রিত হইল।

চারুশশী খট্টাঙ্গের উপর, আপন শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। কিন্তু সে সহসা নিদ্রিতা হইতে পারে নাই। সে অনিদ্রিতা থাকিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল। কে তাহার মত দুর্ভাগা? কাহার স্বামী আপন পত্নীকে দুরন্ত চোরের হস্তে সমর্পণ করিয়া, আপনি সুরাপান করিয়া অচেতন থাকে? ভয়ব্যাকুলা যুবতী পত্নীকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া তাহার নিষ্ঠুর স্বামী কিরূপে পর-গৃহে নিশাযাপন করিতেছে? কিরূপে হতভাগ্য, তাহার মত সুন্দরী এবং প্রেমিকা প্রণয়িনীর আহ্বান উপেক্ষা করিল? কিরূপে পাষণ্ড এই মহা বিপদের সময় তাহাকে পরি-

ত্যাগ করিয়া রহিল? হা ধিক্! তাহার দুরদৃষ্ট! তাহার এ দুঃখ মরিলেও যাইবে না। মৃত্যুও এ অপমান অপনয়ন করিতে সমর্থ হইবে না!

ভাবিতে ভাবিতে বিক্ষুব্ধ-হৃদয়ে চারুশশী আপন শয্যা-নিম্নে তাহার যৌবনচঞ্চল দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া দেখিল, গদাধর আপন প্রশস্ত বক্ষ সুবিস্তৃত করিয়া শুভ্র শয্যার উপর শয়ান রহিয়াছে। তাহার নিরুদ্বেগ সুগঠিত কৃষ্ণ মূর্ত্তি, ক্ষীরোদ-সাগরশায়ী কমলাপতির ন্যায়, প্রদীপালোকোজ্জ্বল শুভ্র শয্যার উপর শোভা পাইতেছে। চারুশশী ভাবিল, এই মহাপুরুষ আজ আমার সর্ব্বস্ব রক্ষা করিয়াছে। আমাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ইহার জয় হউক। দেবতাগণ ইহাকে রক্ষা করুন।—চারুশশী কৃতজ্ঞ হৃদয়ে উদ্ধারকর্ত্তার শত মঙ্গল কামনা করিল। কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইল।

স্বামীর প্রতি ঘৃণা এবং গদাধরের প্রতি শ্রদ্ধা লইয়া, চারুশশী আপনার চঞ্চল নয়ন স্থির করিয়া, নিদ্রিত শান্ত গদাধরের প্রশান্ত এবং প্রশস্ত বক্ষের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই বক্ষ শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত উন্নত ও অবনত হইতেছিল। প্রত্যেক আকুঞ্চনে এবং প্রত্যেক সম্প্রসারণে, তাহাতে অসীম বল ক্রীড়া করিতেছিল। চাহিয়া চাহিয়া, মুগ্ধ হইয়া একাগ্রচিত্তে চারুশশী তাহা অবলোকন করিল।

সাবধান, চারুশশী! নির্জ্জনে নিশীথে আপন শয্যাগৃহ পাইয়া, গদাধরকে দেখিয়া তুমি মুগ্ধ হইও না। সেই বক্ষঃ পৌরুষের

আধার হউক, তাহার জন্য তুমি কুল-ললনার পুণ্য অধিকার অতি-ক্রম করিও না। আর তোমার স্বামীর নিন্দনীয় আচরণে যদি তুমি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে আমরা করযোড়ে মিনতি করিতেছি, তুমি আপনাকে হিন্দু জানিয়া, তোমার মন হইতে সেই ক্ষোভকে দূর করিয়া দাও। তোমার ধর্ম্মের সেই পবিত্র কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিও ;—

"নেক্ষেৎ পতিং ক্রূরদৃষ্টা শ্রাবয়েন্নৈব দুর্ব্বচঃ।
নাপ্রিয়ং মনসা বাপি চরেদ্ভর্ত্তুঃ পতিব্রতা॥"

তুমি সীমন্তিনী, তুমি আপন লোলুপ লোচনকে সংযত করিয়া, সনাতন পুণ্যের পথ অবলম্বন কর।

কিন্তু পিতামাতার সমস্ত আদরের আদরিণী, ভর্ত্তার মস্তকের মণি, কর্ত্তৃত্বাভিমানিনী চারুশশী কখনও আপনার মন শাসিত করিতে শিক্ষা করে নাই। সে ভাবিল, যদি নির্জ্জনে স্ত্রীজনদুর্লভ যুবকের সুগঠিত অবয়ব নিরীক্ষণ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, তবে তাহা দেখিয়া কেন চক্ষু সার্থক না করিব? ইহাতে ত পাপ নাই। আমি ত কুলত্যাগিনী হইতেছি না।

মূর্খা পাপিষ্ঠা সে জানিত না যে, আমাদের মানসিক পাপগুলি শারীরিক পাপ অপেক্ষা কোনক্রমে কম উপেক্ষণীয় নহে। নরকের পথ সুগম করিতে শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিধ পাপই তুল্য শক্তিশালী। মানসিক পাপে আমরা কখনও কখনও লোকলজ্জার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি বটে, কিন্তু দারুণ অন্ত-

দাহে হৃদয়মধ্যে ভীষণ নরক-জ্বালার সৃষ্টি করি। অনেক সময় আমাদের শারীরিক পাপগুলি, মানসিক পাপের স্ফুরণমাত্র।

গদাধরকে দেখিতে দেখিতে চারুশশীর বারবার মনে হইল, কেন সে ঐ প্রশস্ত বক্ষের আশ্রয়লাভে বঞ্চিত থাকিল; কেন তাহার নির্ব্বোধ পিতা তাহাকে এক মদ্যপায়ী হৃদয়হীন কাপুরুষের হস্তে সমর্পণ করিল? আরও অনেক কথা তাহার মনে উদয় হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল আমার পাঠকগণের শ্রবণযোগ্য নহে; এজন্য আমি তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা করি না।

নবম পরিচ্ছেদ

চারুশশীর প্রতিজ্ঞা।

আমাদের একান্ত দুর্ভাগ্য যে, আমাদের আখ্যায়িকার মধ্যে চারুশশীর ন্যায় এক পাপিষ্ঠার কাহিনী স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার কথা না কহিলে আমার এ কাহিনী অঙ্গহীনা হইবে; আমার সকল কথা আমি তোমাদিগকে বুঝাইতে পারিব না। এজন্য তাহার কথা আবার বলিব।

স্বপ্নশূন্য নিদ্রার পর, পরদিন সুন্দর প্রভাতে আমাদের গদাধর গাত্রোত্থান করিল। গবাক্ষপথে প্রভাতালোক প্রবেশলাভ করিয়াছিল। গৃহ-কোণে প্রদীপ-রশ্মি নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। সারা নিশা অনিদ্রায় থাকিয়া, নিশাশেষে চারুশশী নিদ্রার ক্রোড়ে স্থানলাভ করিয়াছিল। তাহার শ্লথদেহ খট্টাঙ্গের উপর শোভা পাইতেছিল। তাহার বিশৃঙ্খল কেশে অসংযত বেগে প্রভাত-বায়ু ক্রীড়া করিতেছিল। বায়ুর ক্রীড়ায় যুবতীর লাবণ্য নদীতে তরঙ্গ উঠিতেছিল। নিদ্রিতার মুদিত নয়ন কমল কোরকের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। নিঃশ্বাস-বায়ুতে তাহার বেশর-বিভূষিত নাসিকা বিকম্পিত হইতেছিল। তাহার তাম্বুলরাগরঞ্জিত রক্তাধর মধুরতায় মণ্ডিত ছিল। তাহার অবশ অলস বাহুতে সরসতা সঞ্চিত ছিল। গদাধর ভাবিল, এ দৃশ্য নয়নাভিরাম বটে, কিন্তু ইহা

দর্শন করিবার অধিকার তাহার নাই; অতএব সে ত্বরিত পদে গৃহের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবুর বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া গদাধর দেখিল, তখনও অতুলানন্দ বাবু তন্দ্রাঘোরে অচেতন রহিয়াছেন; তাঁহার পূর্ব্ব নিশীথের সুখস্বপ্ন তখনও ভঙ্গ হয় নাই।

বেলা দশটার সময়, যখন গদাধর বিদ্যালয়ে যাইবার উদ্দেশে বাহির হইতেছিল, তখন অতুলানন্দ বাবু জাগরিত হইলেন। তিনি গদাধরকে দেখিয়া কহিলেন, "গদাধর, স্কুল যাবার পথে আমাদের বাড়ীতে যদি তুমি খবর দাও যে আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমি বাড়ী ফিরতে পারব না, তা হলে বড় ভাল হয়। তা না হলে, বাড়ীতে বোধ হয়, আমি আসছি আসছি মনে করে তারা খাবে দাবে না।"

গদাধর স্বীকৃত হইয়া প্রস্থান করিল।

কিন্তু সে আপন অঙ্গীকার রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। পথে এক বৃহৎ জনতা অবলোকন করিয়া, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য সে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, নিম্নজাতীয় এক আতুর ব্যক্তি কদর্য্য রোগে আক্রান্ত হইয়া, একান্ত অসহায় অবস্থায় পথিমধ্যে শয়ান রহিয়াছে। রোগ-যন্ত্রণায় বিকৃত শব্দ করিতেছে। কিন্তু সেই বৃহৎ জনতার এক ব্যক্তিও তাহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইতেছে না। রোগ-ব্যথিতের ব্যথায় তাহাদের মধ্যে অনেকে ব্যথা অনুভব করিতেছে বটে; কিন্তু তাহারা উচ্চজাতীয় হিন্দু হইয়া কিরূপে অতি অস্পৃশ্য নীচ জাতীয়ের দেহ

স্পর্শ করিবে—কিরূপে আপনাদের পুণ্য দেহ কলঙ্কিত করিবে?

গদাধর আপনার সমস্ত দেহগৌরব লইয়া রুগ্নের পার্শ্বে উপস্থিত হইল; এবং অতি সহজে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নিকটবর্ত্তী হাঁসপাতালে রাখিয়া আসিল। তাহার পর বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া, অতি দ্রুতবেগে বিদ্যালয়ের সময়ের অব্যবহিত পরে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিল। অতুলানন্দ বাবুর বাটীতে যাইতে হইলে সে যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইত না, এজন্য সে তথায় যাইতে পারে নাই।

বিদ্যালয় হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া সে দিবাবসানে অতুলানন্দ বাবুর বাটীতে আসিল। বহির্ব্বাটীতে ভৃত্যকে, বাবুর বাটী প্রত্যাগমনের সম্বন্ধে সকল কথা বলিয়া সে গমনোন্মুখ হইলে,ভিতর হইতে দাসী আসিয়া কহিল, "আপনাকে মা ঠাকরুণ একবার বাড়ীর ভিতর আসবার জন্যে বলছেন।"

"কেন, কি আবশ্যক?"

"বলছেন যে, আপনি এখানে জলখাবার খেয়ে, পরে বাড়ী যাবেন।"

"এ কথা ভাল; চল যাই।"

ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র, চারুশশী গদাধরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "এস, ঠাকুরপো।"

গদাধর। বাঃ, আপনি যে আমার সঙ্গে একটা নিকট সম্বন্ধ করে' ফেলেছেন।—আমি আজ থেকে আপনার ঠাকুরপো হলাম।

চারুশশী। হ্যাঁ ভাই! আজ থেকে তুমি আমার ঠাকুরপো হলে। তুমি যে বিপদ থেকে আমাকে বাঁচিয়েছ, তাতে আমি তোমাকে আমার পরম আত্মীয় বলেই জেনেছি; এখানে কিছু জলখাবার খাও।

গদাধর। তা, দিন। আমার ক্ষুধার কিছুমাত্র অপ্রতুল নেই।

চারুশশী স্বহস্তে পাত্রপূর্ণ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া গদাধরের সম্মুখে রাখিল। নিজ অলক্ত অধরে, বিলোল লোচনে, বলয়কঙ্কণ-মুখরিত বাহুতে তীব্র বিলাসাগ্নি জ্বালিয়া, অদূরে দাঁড়াইয়া গদাধরের বিশাল বীরমূর্ত্তি দেখিল। গদাধর কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া আহারে সবিশেষ মনোনিবেশ করিল। আহার সমাপ্ত হইলে, চারুশশী আপন হস্তে করঙ্ক ধরিয়া কহিল, "পাণ খাও।"

গদাধর। পাণ খাওয়া আমার অভ্যাস নেই। কখনও খাই নি।

চারুশশী। আমি নিজে হাতে সেজেছি; আজ আমি অনুরোধ করছি, একটি খাও। খেলে আমি সুখী হব।

গদা। আপনি অনুরোধ করবেন না। ওটা খেতে আমার ভাল লাগবে না।

চারুশশী। আমার হাতের সাজা পাণ ত কখনও খাও নি, খেলে জানতে পারতে কত মিষ্টি!

গদাধর। আমি কারও হাতের সাজা পাণ কখনও খাইনি। ও জিনিষ তেতো কি মিষ্টি, তা জানবার ইচ্ছে আমার নেই।

তবু আমি স্বীকার করছি, ওটা দেখতে মিষ্টি বটে। এখন তবে আমি যাই। অতুলানন্দ বাবু সন্ধ্যার পরই আসবেন।

চারুশশী। না না ঠাকুরপো, এখনই যেও না! উপরে চল; সেখানে একটু বসবে, গল্পসল্প করব।

গদাধর। আমার গল্প করবার কিছু মাত্র অবকাশ নেই। চল্লাম বউদিদি।

মুহূর্ত্তমধ্যে গদাধর চলিয়া গেল। চারুশশী নির্ব্বাক্ হইয়া গমনশীল গদাধরের সরল সুদৃঢ় মূর্ত্তির দিকে তাকাইয়া রহিল। সে ত তাহাকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইল না! আকুঞ্চিত কৃষ্ণ ভ্রু-ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণ কটাক্ষের বাণসকল লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল। প্রদীপ্ত যৌবনের লাবণ্যপরিপ্লুত দেহের সমস্ত আকর্ষণ মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যর্থ হইয়া গেল। হায়, বিমূঢ়া বিবশা নারী! আর তুমি এ লাবণ্যের—এ কটাক্ষের—অহঙ্কার করিও না।

কিন্তু চারুশশী ভিন্নাপ্রকৃতির যুবতী। সে তাহার কদর্য্য প্রকৃতিকে সংযত করিতে চেষ্টা করিল না। বল্গাবিচ্যুত অশ্বের ন্যায়, তাহার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি গদাধরের পশ্চাৎ প্রধাবিত হইল। সে ভাবিল, আবার চেষ্টা করিব; এ কমনীয় দেহতটে নূতন শ্রী সঞ্চারিত করিয়া, পলাতক গদাধরকে ধরিবার নূতন ফাঁদ পাতিব। নয়নজ্যোতিতে প্রবল প্রমত্ততা পূরিয়া পুনঃ পুনঃ কটাক্ষ-সন্ধানে পলাতককে জর্জ্জরিত করিয়া দিব।

দশম পরিচ্ছেদ

পুত্রের প্রতীক্ষায়।

নাড়িচা গ্রামে গদাধরের মাতা আজ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। গদাই কলিকাতা হইতে পত্র লিখিয়াছিল যে তাহার পরীক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, সে আজ বেলা বারটার সময় নৌকাযোগে বাটী ফিরিবে। কত দিন পরে প্রাণাধিক পুত্র আবার মাতার অঞ্চল-তলে ফিরিয়া আসিবে! আনন্দে মাতা সারারাত্র জাগিয়াছিলেন। জাগিয়া, প্রত্যূষে উঠিয়া পুত্রের জন্য কি কি আহার-সামগ্রী প্রস্তুত করিবেন, মনে মনে শতশত-বার তাহার আলোচনা করিতেছিলেন।

অতি সত্বর গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া, তিনি জেলে-বৌএর পথ-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। জেলে বৌ রোজ কত সকালে আসে; আজ আর তা'র বার হয় না! ঐ যে জেলে বৌ আসিতেছে। মাতা ডাকিলেন, "আয় জেলে বৌ! শীগ্‌গির আয়। আজ তুই বাছা এত দেরী করে কেন এলি? তোর ঝুড়ি নামা, দেখি কি মাছ আছে। ওমা! তোর ঝুড়িতে যে একটিও ভাল মাছ নেই। আজ যে আমার গদাই বাড়ী আসবে! কত দিন পরে বাছা আমার বাড়ী আসবে, বল্‌ দেখি তাকে কি রেঁধে দিব?"

জেলে বৌ। আমি ত জানিনি মা যে দাদাবাবু আজ বাড়ী আসবে ; নইলে কত ভাল ভাল মাছ নিয়ে আসতাম।

মাতা। তা' মা, যা' এনেছিস্ তাই দিয়া যা'। এই পুঁটিমাছ গুলি ভাজব। আর এই খড়কে-বাটাগুলি ঝাল দিয়ে রাঁধব। আর এই কয়লা মাছগুলি তেঁতুল দিয়ে অম্বল রাঁধব।

জেলে বৌ বেশী দামে মৎস্য বিক্রয় করিয়া, আনন্দিতা হইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর দুধের কেঁড়ে লইয়া এবং কেঁড়ের মুখে, দুগ্ধপরিমাণজন্য সুমার্জ্জিত কাংস্য নির্ম্মিত ঘটীটি লইয়া এবং নিজের মুখে একটি মুখ দোক্তা ও পাণ লইয়া আতরের মা আসিল ;—রোজের দুধ দিতে। গদাধর কলিকাতা যাইবার পর মধুসূদন মুখোপাধ্যায় গৃহে গাভী রাখিবার সুবিধা করিতে পারেন নাই। কে তাহাকে দোহন করিবে ? কে তাহার সেবা করিবে ? আর গদাধরের প্রবাসকালে তত দুগ্ধের আবশ্যকতাই বা কি ? মাতা আতরের মাকে দেখিয়া বলিলেন, "ও আতরের মা! শুনেছ, আজ আমার গদাই আসবে।"

আতরের মা বলিল, "তা'ত শুনিনি। দাদাবাবু কখন্ আস্‌বে ?"

মাতা বলিলেন, "এই বারটার সময় আসবে। এখানে এসে খাবে। আজ বাছা, রোজের দুধে হবে না ; এক সের বেশী দুধ দিতে হবে।"

আতরের মা, রোজের দুধ এবং বেশী দুধ দিয়া অন্য বাড়ীতে যোগান দিতে গেল। তাহার পর ধোপা মিন্সে আসিল, তাহাকে মাতা বলিলেন, "বাবা, আজ আমার গদাই বাড়ী আসবে। অন্য কাপড় দিতে না পার, আজ বিছানার চাদরখানি দিয়ে যেও।"

মাছ কিনিয়া, দুধ লইয়া, ধোপাকে চাদরের কথা বলিয়া, মাতা রন্ধন-কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রন্ধনকার্য্যে গদাইএর মাতা বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। এক্ষণে পারদর্শিনী পাককুশলার প্রত্যেক ব্যঞ্জনটি পুত্রস্নেহের সঞ্চিত সুধারসে পরিপ্লুত হইয়া আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিল। পরিচ্ছন্ন পাত্রে সুধাপূর্ণ ব্যঞ্জনগুলি শোভা পাইল। তাহাদের জিহ্বাসরসকারী সৌরভ দিক্‌সকলকে আমোদিত করিল।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় সকালে উঠিয়া কোথায় গিয়াছিলেন। এক্ষণে বেলা এক প্রহরের সময় তিনি রন্ধনশালার দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বৃদ্ধের মাথায় রঙীণ গামছার পাগড়ি, বাহুতলে ছিপ্ এবং বাম হস্তে অতি সুদর্শন গোলাপ-বর্ণ-বিনিন্দিত উদর-বিশিষ্ট-রোহিত মৎস্য। মরি, মরি কি সুন্দর বর্ণ সে রোহিত মৎস্যের! তপ্তকাঞ্চনবর্ণ সে পুচ্ছ, নধর সে দেহ, রজত-বিগঠিত কোমল সে অধর—তাহার মধুর মর্ম্ম, হে আমার বাঙ্গালী পাঠক! তুমি যদি বুঝিতে সমর্থ না হইয়া থাক, তাহা হইলে তুমি বৃথায় বাঙ্গালী নাম গ্রহণ করিয়াছ।

জানিও ভাই, এই রোহিত মৎস্যই নিজের মুণ্ডপাত করিয়া, তোমাকে পৃথিবীর অন্য সমস্ত জাতি অপেক্ষা বুদ্ধিমান করিয়া রাখিয়াছে।

মাছ দেখিয়া গদাইএর মার আহ্লাদ আর ধরে না!

মধুসূদন পত্নীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ওগো, এই মাছের ঝোল রাঁধতে হবে; আর পেটীর মাছ দু' চার খানা ভেজে রেখ, গদাই ভাজা মাছ খেতে ভালবাসে। আর মুড়োটা দালে দিও। এখন আমি একটা মোচা সংগ্রহ করবার জন্যে চল্লাম; মোচার দালনা রাঁধতে হবে, গদাই মোচার দাল্না খেতে বড় ভালবাসে।"

গদাইএর মা কহিলেন, "না, না, তোমার মোচার জন্যে যেতে হবে না। এই দেখ আমি মোচার দাল্না রেঁধে রেখেছি।"

মধুসূদন বলিলেন, "আচ্ছা, তা'হ'লে এখন আমি গঙ্গাতীরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি; গদাইএর নৌকা দেখতে পেলেই আমি শীঘ্র এসে তোমাকে খবর দিব।"

এই বলিয়া নগ্নপদ এবং গামছার দ্বারা বিরচিত সেই উষ্ণীষধারী মধুসূদন, ভাগীরথী তীরাভিমুখে গমন করিলেন। পথে এক গ্রামবাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি তাহাকে গদাধরচন্দ্রের পরীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে এবং বাটী শুভাগমন সম্বন্ধে সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিলেন। বলিলেন, "দেখ, তোমরা বলতে গদাধর মূর্খ হবে। আমি বলতাম, আমার

আশীর্ব্বাদে সে বিদ্যালাভ করবে। এখন আমার আশীর্ব্বাদ সফল হয়েছে, গদাধর পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী আসছে।”

উমাকালী চক্রবর্ত্তীর সহিত গঙ্গাতীরে সাক্ষাৎ হইলে মধুসূদন কহিলেন, “উমাকালী ভাই। গদাই আমার পরীক্ষা দিয়েছে; আজ বাড়ী আসবে।”

কালীকৃষ্ণ ঘোষ গঙ্গাস্নানের পর বাটী ফিরিতেছিলেন, তাহাকে দেখিয়া মধুসূদন সংবাদ দিলেন, “ঘোষজা, তুমি বলতে গদাইএর লেখাপড়া হবে না; দেখ, আজ সে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী আসছে।”

গঙ্গাবগাহন-অভিলাষী শ্রীযুক্ত হরিহর সিংহ মহাশয়, হরিনামের ঝুলিটি লইয়া হরিনাম জপ করিতে করিতে মন্থরগমনে অগ্রসর হইতেছিলেন। সহসা তাঁহার জপ-ভঙ্গ লইল। মধুসূদন তাঁহাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “সিঙ্গি মশায়, আজ গদাই আমার বাড়ী ফিরবে।”

এইরূপে মধুসূদন গ্রামের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আপনার সুখসংবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বনের পাখীরা কিংবা জলের মৎস্যেরা যদি মানুষের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে, বুঝি বা তিনি তাহাদিগকেও গদাধরের আগমন-বার্ত্তা প্রদান করিতেন। যদি গ্রাম্য বৃক্ষসকলের, কিংবা বৃক্ষবিলম্বিতা লতাসকলের শ্রবণেন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকেও আহ্বান করিয়া কহিতেন, “ওগো! আজ আমার গদাই বাড়ী ফিরবে।” ফলতঃ গদাধরের আগমনবার্ত্তা

ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রত্যেক কুটীরে প্রতিধ্বনিত হইল। একটি লোকের হৃদয়ানন্দে সমস্ত গ্রামখানি আনন্দিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু হায়! পৃথিবীর সমস্ত আনন্দের যেমন একটা সীমা আছে, বৃদ্ধ মধুসূদনের আনন্দেরও একটা সীমা ছিল। গঙ্গাতীরে বসিয়া, আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, তিনি দেখিলেন,—গগনপটে সহসা একখানি ক্ষুদ্র কৃষ্ণ মেঘ উদিত হইয়াছে। দেখিয়া মধুসূদন চিন্তিত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গদাধর কোথায় ?

সেই ক্ষুদ্র কৃষ্ণ মেঘের আকার ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আকাশে আরও মেঘ সকল উদিত হইল। তাহারা দিগন্ত-প্রান্ত চুম্বন করিয়া, বনমধ্যে করিযূথের ন্যায়, নীল গগন-মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাদের কৃষ্ণচ্ছায়া মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রচণ্ড প্রভাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তাহাদের কৃষ্ণ-মূর্ত্তি গঙ্গাজলে প্রতিবিম্বিত হইয়া, রজত-তরঙ্গ সকলকে মলিন করিয়া দিল। পৃথিবীর উপর স্বর্গের যে শুভদৃষ্টি অহরহ বর্ষিত হইতেছিল, তাহাদের বিকট ছায়া, তাহাও যেন আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। তাহাদের ধূম্র বক্ষ, মহাশব্দে বিদীর্ণ হইয়া, বজ্রাগ্নি উদ্গীরণ করিল। বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বেই পর্জ্জন্যদেব সুনীল যোদ্ধৃবেশে সম্যক্ সুসজ্জিত হইয়া, অসংখ্য নারাচরাশির ন্যায় তীব্র জলধারা বর্ষণ করিয়া, মেদিনীর শ্যাম মেদুর বক্ষ ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিলেন। কেবলমাত্র বৃষ্টিপাত নহে। তাহার সহিত প্রবলবেগে ঝড় বহিল। বৃক্ষ সকলকে বিতাড়িত করিয়া, গঙ্গাতরঙ্গ সকলকে বিক্ষুব্ধ করিয়া, পল্লীর শ্যামল শ্রী বিদীর্ণ করিয়া, প্রভঞ্জন-দেবতা অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইলেন। গদাধরের মাতা পুত্রের জন্য পরিচ্ছন্ন পাত্রে যে সকল

শোভন সুস্বাদু ব্যঞ্জন সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, পবনসঞ্চালিত ধূলিতে ও বৃক্ষবিচ্যুত পল্লবখণ্ডে তাহা প্লাবিত হইয়া গেল। বৃদ্ধ মধুসূদন গঙ্গাতীরে গদাধরের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া যে বৃক্ষ-তলে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহাও মহাশব্দে উন্মূলিত হইয়া তট-ভূমিতে শয়ন করিল।

মধুসূদন গদাধরকে না লইয়া গৃহে ফিরিতে পারেন না, এজন্য এ পর্য্যন্ত তাঁহার আহার হয় নাই। তা' না হউক। তিনি সেই রঙীন গামছার উষ্ণীষ মাথায় বাঁধিয়া, অন্য এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া, বৃক্ষবিধৌত বৃষ্টিজলে স্নাত হইতে লাগিলেন।

হায়! এই দুর্দ্দিনে, দুর্য্যোগে কোথায় গদাধর?

মধুসূদন ভাবিলেন, নিশ্চিত গদাধরের নৌকা ভাগীরথীর কোন নিরাপদ নিভৃত উপকূলে আশ্রয়লাভ করিয়াছে; দুর্য্যোগের অবসানে সে নির্ব্বিঘ্নে বাটী আসিয়া পৌঁছিবে।

কিন্তু সে ত আসিল না!

বৃষ্টিপাত বন্ধ হইল। বায়ুর প্রবলতা মন্দীভূত হইল। পল্লীর বিদীর্ণ শ্যামল শ্রী আবার প্রফুল্লতা প্রাপ্ত হইল। মধুসূদনের বৃষ্টিজলসিক্ত বসনখানি অঙ্গেই বিশুষ্ক হইল। কিন্তু গদাধর ত আসিল না!

কোথায় সে?

গঙ্গা! মা আমার! তোমার করুণ বুকে থাকিয়াও কি গদাধর নিরাপদ নহে?—মাতার বক্ষ কি পুত্রকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ নহে?

আমরা পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, মধুসূদন গদাইকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি তাহার শাসন জন্য কখনও তাহাকে সামান্য প্রহার পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। কখনও তাহার প্রতি একটি দুর্ব্বচন প্রয়োগ করেন নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একবার গদাধরের পীড়া হইয়াছিল। তখন ক্রমান্বয়ে তিন দিন কাল অভুক্ত থাকিয়া এবং ক্ষণকালের জন্য একটিবার নিদ্রিত না হইয়া, বৃদ্ধ পুত্রের পার্শ্বে বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। অনাহারে, অনিদ্রায় বৃদ্ধ আপনি মরণাপন্ন হইলে তাঁহার শীর্ণ অবয়ব, কোটরগত চক্ষু, এবং বিশুষ্ক গণ্ড দেখিয়া আমাদের পূর্ব্বকথিত পল্লীবাসী উমাকালী চক্রবর্ত্তী তাঁহাকে বলিয়াছিল, "মধু, ভাই! তোমার মত স্নেহশালী পিতা,আমি কখনও কোনও খানে দেখিনি। তুমি আপনার প্রাণ দিতে বসেছ।" উমাকালী চক্রবর্ত্তীর এই বাক্যের উত্তরে মৃতকল্প মধুসূদন, বিশুষ্ক অধরে ম্লান হাসি হাসিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "ভাই, প্রাণটা কি এমন বড় জিনিষ যে, ছেলের জন্যে তা বিসর্জ্জন করা আমরা একটা অসাধারণ কার্য্য বলে' মনে কর? গদাইএর পায়ের একটি কাঁটা তুলে দেবার জন্যে, আমার যদি সহস্র প্রাণ থাকত, তা হলে আমি সেই সহস্র প্রাণই দিতে পারতাম। তোমার সন্তান নেই; থাকলে আমার কথা বুঝতে পারতে।"

যাহার পায়ের একটি কণ্টক উদ্ধারের জন্য মধুসূদন সহস্র প্রাণ প্রদান করিতে পারিতেন, সেই স্নেহের পাত্র, সেই প্রাণাধিক প্রাণ কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অস্থির দেহ প্রাণহীন কাষ্ঠ-

মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলতা প্রাপ্ত হইল। তাঁহার নিস্পন্দ দৃষ্টি দিগন্তসীমায় নিবদ্ধ হইল। তাঁহার ব্যাকুল হৃদয়, তাঁহার স্পন্দিত বক্ষপঞ্জরে পিঞ্জরাবদ্ধ বনবিহঙ্গের ন্যায় বারবার আঘাত করিতে লাগিল।

ঐ—ঐ—ঐ দূরে দিগন্তপ্রান্তে, পদ্মপলাশপ্রান্তে কৃষ্ণ ভ্রমরের ন্যায় যে ক্ষুদ্র কৃষ্ণ দ্রব্যটুকু জাহ্নবীর গগনচুম্বিত বক্ষে নয়নগোচর হইতেছে, দেখ দেখ, উহা একখানি তরণী ; বৃদ্ধ মধুসূদন ভাবিলেন, নিশ্চিত তরণীমধ্যে গদাধর আছে। তরণী নিকটবর্ত্তী হইল। তাহার ক্ষেপণী সকল উজ্জ্বল মুক্তাদল সৃষ্টি করিয়া, তাহার মালা গাঁথিয়া গলায় পরিল। কিন্তু তাহা ত নাড়িচার ঘাটে ভিড়িল না ; তাহা ত গদাধরকে আনিয়া বৃদ্ধের বক্ষে তুলিয়া দিল না। তাহা একান্ত নির্দ্দয়ার মত, কলকল হাসিয়া, তরঙ্গতাড়নে নৃত্য করিয়া চলিয়া গেল।

আবার দেখ, আবার একখানি তরণী—এক বৃহৎ শ্বেত রাজহংসীর ন্যায় দূরে গঙ্গাবক্ষে দেখা গিয়াছে। মধুসূদনের মনোমধ্যে আবার আশা সঞ্চারিত হইল। তিনি আবার ভাবিলেন,—হয়ত এই তরীতেই তাঁহার গদাধর আছে। কিন্তু না, ইহাতেও গদাধর নাই।

দিবা অবসান হইল, তবু গদাধর আসিল না !

তা, না আসুক। বৃদ্ধ তেমনই ভাবে মস্তকে সেই রঙীন গামছাখানি বাঁধিয়া, পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় চিরদিন জাহ্নবী-উপকূলে দাঁড়াইয়া থাকিবেন। চিরদিন তাঁহার নিশ্চল দৃষ্টি, পুত্রের দর্শনলালসায় দিগন্তপ্রান্তে নিবদ্ধ থাকিবে।

গদাধরের মাতা বাড়ীতে কি করিতেছেন, চল আমরা তথায় গিয়া দেখি। তাঁহার রন্ধনকার্য্য বহুপূর্ব্বে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছিল। তিনি রন্ধন-গৃহের দাওয়ায় বসিয়া ভাবিতেছিলেন, কেমন করিয়া তাঁহার গদাই আসিয়া তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকিবে। সে সময় তিনি কি করিবেন? তাহাকে কি বলিবেন? ভাবিতে ভাবিতে তিনি গগনপটে ঘনঘটা দৃষ্টিগোচর করিয়াছিলেন। তাহার পর, প্রবল ঝঞ্ঝা যখন প্রলয়ের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র পাক-শালাটি আলোড়িত করিয়া দিল, তখন তিনি গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া ঊর্দ্ধ মুখে দেবতাদিগকে উদ্দেশ করিয়া ডাকিলেন, "দোহাই বাবা তারকনাথ, দোহাই মা কালী, আমার বাছাকে আমার অঞ্চলের নিধিকে নির্ব্বিঘ্নে ঘরে এনে দাও।"

তাহার পর ঝড় থামিয়া গেল, কিন্তু কৈ গদাধর ত বাড়ী ফিরিল না হায় হায়! দেবতারা স্নেহময়ী মাতার অশ্রুসিক্ত প্রার্থনা কিরূপে উপেক্ষা করিলেন? এ পাষাণময় দেবতাগণ কি নির্ম্মম! যাহারা প্রস্তর দিয়া এ দেবমূর্ত্তি সকল গঠিয়াছিল, তাহারা বুঝি বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এ দেবতাগণ ঐ প্রস্তরের মত নির্ম্মম! প্রস্তরময় দেবতারা মানুষের কাতরক্রন্দন শ্রবণ করেন না। তথাপি আমাদের অনন্তপদাশ্রয়-প্রার্থিনী ঊর্দ্ধমুখী ভক্তিকে আপনাদের পাষাণভারে প্রপীড়িত করিয়া রাখেন।

যে নরদেহ আশ্রয় করিয়া ভূতভাবন ভগবান দুষ্কৃতদিগকে দমিত করিয়া, সাধুদিগকে পরিত্রাণ করিয়া, বারবার ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছেন, যে নরদেহ বারবার বহুবৎসর যাবৎ

পরমাত্মার পবিত্র আধারস্বরূপ বিরাজ করিয়াছে, এস, প্রস্তর ছাড়িয়া আমরা সেই পুণ্যময় মানব-দেহের মধ্যে দেবত্বের অনুসন্ধান করি। তিনি কতবার মানুষের দেহের মধ্যে বিরাজ করিয়াছেন, অনুসন্ধান করিলে হয়ত এখনও তাঁহাকে নরদেহ-মধ্যে দেখিতে পাইব। তাঁহার কথা ত কখনও মিথ্যা নয়!—সত্যসিন্ধু নিজে বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অম্বিকার জন্মপত্র।

বৃষ্টির পর, আকাশ পরিষ্কার দেখিয়া শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গঙ্গার উপকূলের পথ অবলম্বন করিয়া ভ্রমণ জন্য বাহির হইলেন। তাঁহার যুবতী কন্যা অম্বিকা তাঁহার সঙ্গিনী হইল। তিনি অনেক সময়ই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া পথে পরিভ্রমণ করিতেন। এজন্য পল্লীগ্রামবাসীরা হয়ত গোপনে তাঁহার নিন্দা করিত। কিন্তু কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় লোকনিন্দায় বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না। যাহা তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইত, স্তুতি বা নিন্দার অপেক্ষা না করিয়া, তাহা তিনি সম্পাদন করিতেন। লোক-বাক্যের দ্বারা কখনও তিনি অভিভূত হন নাই।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, কালীদহ গ্রামের জমিদার-দিগের, গঙ্গাতীরে একটি সুরম্য চাঁদনি ছিল। এই চাঁদনি হইতে আরম্ভ করিয়া, দক্ষিণ দিকে, গঙ্গার উপকূলাশ্রিত এক রাজপথ প্রসারিত ছিল। এই রাজপথ নাড়িচা এবং অন্য অনেক পল্লী-গ্রাম অতিক্রম করিয়া হাওড়ার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে "গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড" নামক বিখ্যাত রাজবর্ত্মে মিলিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়, কন্যা সহ আজ এই রাজপথে পদচালনা করিতেছিলেন।

কথোপকথন সময়ে, প্রসঙ্গক্রমে তিনি কন্যাকে সম্বোধন

করিয়া কহিলেন, "মা অম্বিকা, তোমার ছেলেবেলার কথা মনে আছে? তুমি যখন চার বছরের বালিকা, তখন একদিন আমাদের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন; তাঁর গেরুয়া বসন আর মাথার চুল লম্বা, তিনি ফলমূলমাত্র আহার করতেন; তাঁর কথা কি তোমার মনে আছে?"

অম্বিকা। হ্যাঁ বাবা, আমার সে কথা মনে আছে। পরে তোমার কাছে শুনেছিলাম যে, ঐ সন্ন্যাসীর কাছে তুমি ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করেছ।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, আমি তাঁর একজন শিষ্য।

অম্বিকা। তাঁকে ত আর কখন দেখি নি।

কৃষ্ণ। না, তিনি সেই এসেছিলেন, ত[illegible] পর, আর কখনও এখানে আসেন নি।

অম্বিকা। তিনি কোথায় থাকেন?

কৃষ্ণ। তা, তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউই জানে না।

অম্বিকা। আমরা আবার কবে তাঁর সাক্ষাৎ পাব?

কৃষ্ণ। তা বলা আমার সাধ্যাতীত। বোধ হয়, এ জীবনে আর কখনও তাঁহার সাক্ষাৎ পাব না।

অম্বিকা। একদিন তোমার মুখে শুনেছিলাম যে, তিনি অসাধারণ ব্যক্তি।

কৃষ্ণ। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, ত্রিকালজ্ঞ, আর পরম পুণ্যাত্মা। আমার মনে হয়, সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁর মত জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আর দ্বিতীয় নেই।

অম্বিকা। শুনেছিলাম, তিনি দয়া করে, আমার কোষ্ঠী তৈরী করে দিয়েছিলেন।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, তিনিই তোমার জন্মপত্রিকা প্রস্তুত করেছিলেন।

অম্বিকা। তুমি ত বাবা, সে জন্মপত্রিকা আমাকে কখনও দেখাও নি।

কৃষ্ণ। না। না দেখাবার বিশেষ কারণ ছিল, এজন্যে দেখাই নি। আপনার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা জানতে পারা, অল্পবয়সী ছেলেমেয়ের পক্ষে অনেক সময় ভাল নয়। এখন তুমি লেখাপড়া শিখে জ্ঞানলাভ করেছ। আর, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এখন তোমার বুদ্ধির পরিণতি হয়েছে। এখন এই কোষ্ঠীর দুটি বিশেষ কথা তোমাকে জানাব।

অম্বিকা। সে কি বাবা?

কৃষ্ণ। সে তোমার জীবনের কথা, সে তোমার মৃত্যুর কথা। ভগবানের ইচ্ছায় তোমার এমনই মুহূর্ত্তে জন্ম হয়েছিল, যাতে তোমাকে চিরজীবন কুমারী থাকতে হবে; আর, যাতে জলে ডুবে তোমার মৃত্যু ঘটবে। তোমার প্রসূতি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আমার পা ছুঁয়ে মিনতি করেছিলেন, 'আমার এই মাতৃহীন মেয়েকে তুমি যত্ন করে রেখ।'—হায়! আমার যদি কাউকে রক্ষা করবার শক্তি থাকত, তা হলে তিনিই কি আমাকে ছেড়ে যেতে পারতেন? তাঁকেও রক্ষা করতে পারি নি, তোমাকেও রক্ষা করা আমার সাধ্য নয়। যিনি সর্ব্বজীবের পরম রক্ষক, সর্ব্বজীবের কল্যাণের জন্যে যদি তিনি তোমাকে রক্ষা

করা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তা হলে, তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন। আমি মানুষ, আমি তোমার রক্ষার জন্যে চেষ্টামাত্র করতে পারি ; কিন্তু সেই চেষ্টায় ইচ্ছানুযায়ী সাফল্য লাভ করা মানবশক্তির সাধ্যাতীত। জলের বিপদ থেকে তোমাকে রক্ষা করবার জন্যে, আমি অতি যত্নে তোমাকে ভাল করে সাঁতার শিক্ষা দিয়েছি। এ ছাড়া, তোমাকে জলে ডোবা থেকে রক্ষা করার আর কোনও ভাল উপায় আমি ভেবে পাইনি।

অম্বিকা। বাবা, তুমি আমার জন্যে কাতর হয়ো না। জলে ডুবেই যে আমার প্রাণনাশ ঘটবে, তার নিশ্চয়তা কি ? তোমার গুরুদেব অসাধারণ জ্ঞানী হলেও—মানুষ ; মানুষের কথা অভ্রান্ত নয়।

কৃষ্ণ। কিন্তু আমার গুরুদেবের কথা মানুষের কথা নয়। মানুষ যখন জ্ঞানের শেষ সোপানে আরোহণ করে, তখন সে দেবত্ব লাভ করে। তখন সে যা বলে, তা মানুষের কথা নয়, তখন তা দেবতার অমোঘ আদেশ। আমাদের শাস্ত্রের লেখা অধিকাংশ ঋষির মহাজ্ঞানের কথাগুলি যে রকম অভ্রান্ত সত্য, ঋষিতুল্য আমার গুরুদেবের কথাগুলিও সেই রকম সত্য। তাতে সন্দেহ নেই।

অম্বিকা। তা, সত্য হোক। কিন্তু কবে আমি জলে ডুবে যাব, তা ত তুমি জান না। হয়ত বুড়ো বয়সে—

কৃষ্ণ। না। গুরুদেব গণনা করে দেখেছেন যে, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করবে না।

অম্বিকা। বুড়ো, অকর্ম্মণ্য, পরমুখপ্রত্যাশী হয়ে বেঁচে থাকা অপেক্ষা অল্প বয়সে, শরীরের সমস্ত সামর্থ্য নিয়ে, মনের সমস্ত বল নিয়ে মরা, স্ত্রীলোকের পক্ষে ভাল। তার পর, মরণই যদি হল, তবে তা জলের ভিতর ঘটলে ক্ষতি কি? যখন মরতেই হবে, তখন তা তুলোর রাশির উপরে না হয়ে, শীতল কোমল জলরাশির উপর হলে ক্ষতি কি বাবা?

কৃষ্ণ। তোমার সে অবস্থা দেখবার পূর্ব্বেই যেন আমি দেহত্যাগ করতে পারি মা!

পিতা পুত্রীতে কথোপকথন করিতে করিতে পাদচারণা করিতেছিলেন; সহসা তাঁহারা স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; সহসা তাঁহাদের কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। সহসা দূরে স্রোতোজলে তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। গঙ্গার চঞ্চল স্রোতোমধ্যে একখানি নিমগ্ন নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছিল। নৌকার সহিত গুণরশ্মির দ্বারা বিজড়িত একটি নরদেহ স্রোতোমধ্যে কখনও ডুবিতেছিল, কখনও ভাসিতেছিল। অম্বিকা তাহার অতি বিশাল চক্ষুর সমস্ত শক্তি নিক্ষেপ করিয়া দেখিল যে, নরদেহ এখনও একেবারে প্রাণশূন্য হয় নাই। এখনও বিজড়িত গুণরশ্মি হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য তাহার অতিক্ষীণ চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গদাধরের উদ্ধার।

অম্বিকা। বাবা!

কৃষ্ণ। কেন?

অম্বিকা। আমি যাব, তুমি বারণ কোর না।

কৃষ্ণ। তুমি আমার সংসারের সব। আমি মায়াবদ্ধ জীব; তুমি, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কোর না। কর্ত্তব্যময়ী তুমি, আপন কর্ত্তব্য স্থির কর। সাঁতারে তুমি পারদর্শিনী; জলমধ্যে হয়ত কারও একমাত্র সন্তান, হয়ত কারও একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র, হয়ত কারও বৃদ্ধ পিতা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছেন; তুমি তাকে উদ্ধার করতে যাচ্চ; তুমি সর্ব্বশক্তিমানের আদেশে পরিচালিত হয়েছ। মূঢ় মুগ্ধ আমি, আমার কি সাধ্য যে আমি তোমাকে নিষেধ করি! তবুও আমার গুরুদেব বলেছিলেন যে, মৃত্যু ঘটবে। জানি না, মরণে কেউ অমরতা লাভ করতে পারে কি না। কিন্তু পরকে মরণ থেকে রক্ষা করবার জন্যে যে মরণ, সে মহামরণ; এ যার ভাগ্যে ঘটে, সে অমরতা লাভ করে। আমি পিতা হয়ে তোমাকে এ অমরতা থেকে কি করে' বঞ্চিত করি?

পিতার বাক্যের দিকে অম্বিকার লক্ষ্য ছিল না। সেই স্থির-

নেত্রা অপূর্ব্বা বালিকা আপনার লক্ষ্য স্থির করিয়া তখন গঙ্গাজলে অবতরণ করিতেছিল। সে দেবীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া, কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয় চীৎকার করিয়া উঠিলেন; কহিলেন, "দাঁড়াও দাঁড়াও অম্বিকা, মা আমার, বাছা আমার, দাঁড়াও। আর একবার তোমাকে ভাল করে' দেখি। আমার সংসারের তুমিই একমাত্র অবলম্বন, দাঁড়াও, তোমাকে একবার ভাল করে' দেখি। হয়ত জীবনে আর কখনও তোমাকে দেখব না। হায় ভগবান, মানুষের কর্ত্তব্য কেন তুমি এত কঠিন করে' নির্দ্দেশ করলে! আমি চিরজীবন কেবলমাত্র যদি বিদ্যাচর্চ্চায় অতিবাহিত না করে,' অম্বিকার মত সন্তরণ শিক্ষা করতে পারতাম, তা হলে পরের জীবন উদ্ধারের জন্যে তাকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ না করে', নিজেই এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হতে পারতাম।"

বৃষ্টিজল-বিধৌত শ্যাম-তরু-লতা-সুশোভিত-তটিনী গঙ্গা, দিবাবসানকালের ম্লান সূর্য্যরশ্মিতে স্নাতা হইয়া অত্যন্ত শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে কুমারী অম্বিকার লাবণ্যময় উজ্জ্বল স্বর্গীয়াবয়ব বুকে লইয়া তাঁহার নৈসর্গিক শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। গঙ্গাজলে অম্বিকার সন্তরণশীল দেহ, চাকচিক্যময় সুবর্ণহারের সুখদর্শন মধ্যমণির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। সেই পবিত্র দেহ ক্রোড়ে করিয়া, পুণ্যসলিলার সলিলও যেন আরও পবিত্র হইয়া উঠিল। অম্বিকা জলস্রোতের সহায়তায়, এবং আপন সুদক্ষ বাহুসঞ্চালনের নিপুণতায়, অতি শীঘ্র নিমগ্ন তরণীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার চরণপ্রক্ষিপ্ত জলকণা সকল

সূর্য্যকরে রঞ্জিত হইয়া, দেবতার পুষ্পবৃষ্টির ন্যায় তাহার অঙ্গে বর্ষিত হইল।

কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তীরে দাঁড়াইয়া সজলনেত্রে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করিলেন। .

নিমগ্ন তরীর সন্নিকটে আসিয়া, নিমগ্ন ব্যক্তির দিকে লক্ষ্য করিয়া, অম্বিকার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অদর্শনকালে যাহার কথা সে শতবার ভাবিয়াছিল, যাহার কালো মূর্ত্তি তাহার পুষ্পিত হৃদয় মধ্যে অল্পে অল্পে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইতেছিল, পিতার আদেশ-ক্রমে একদিন সে যাহাকে বর্ণপরিচয় শিক্ষা দিয়াছিল, পরে তাহার পিতার শিক্ষকতায় যে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছিল, এবং একদিন যাহাকে স্বহস্তে সজ্জিত করিয়া, উন্নতির পথ অবলম্বন জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করিয়াছিল, এ যে সেই গদাধর! ধন্য মধুসূদন! আজ গদাধরের উদ্ধার কার্য্যে অম্বিকাকে নিয়োজিত করিয়া তুমি তাহাকে ধন্য করিলে।

গদাধরের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। এক্ষণে পরিচিতা অম্বিকাকে তাহার উদ্ধারকার্য্যে ব্রতী এবং নিকটবর্ত্তী দেখিয়া, তাহার অন্তঃকরণ মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। সে কহিল, "অম্বিকা তুমি আমাকে উদ্ধার করবার জন্যে আপনি বিপদা-পন্ন হয়েছ; কিন্তু আমাকে উদ্ধার করা সহজ নয়। কি রকমে জানি না, কিন্তু দেখ, গুণের দড়িতে আমার সর্ব্বাঙ্গ এমন বদ্ধ হয়েছে যে, এ থেকে মুক্ত হবার কোন সম্ভাবনা দেখি না।"

অম্বিকা। না, গদাধর, আমি তোমাকে উদ্ধার করব। যদি না

পারি, তোমার উদ্ধারের চেষ্টায় বরং মরব, তবু ডাঙ্গায় ফিরব না।”
—বলিয়া অম্বিকা তখন গদাধরের দক্ষিণহস্ত-বদ্ধ রজ্জুর এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া, আপনার মুক্তাসদৃশ দন্তের দ্বারা সবলে চর্ব্বণ করিতে লাগিল। বহুক্ষণ জলমধ্যে থাকিয়া রশ্মিসকল অপেক্ষাকৃত কোমল হইয়াছিল। চর্ব্বণে সেগুলি অল্পায়াসে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তথাপি সে কর্কশ রজ্জু অম্বিকার কোমল মুখ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল।

দক্ষিণ হস্ত মুক্ত পাইয়া, আপনাকে বন্ধনমুক্ত করা গদাধরের পক্ষে মুহূর্ত্তের কার্য্য হইল। সে অবশ মৃতকল্প দেহেও যথেষ্ট বল ছিল। রজ্জু সকল সামান্য সূত্রের মত মুহূর্ত্ত মধ্যে খণ্ডিত হইয়া গেল।

তাহার পর, গদাধর ও অম্বিকা সন্তরণ করিয়া তীরাভিমুখে ফিরিল।

তীরে কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাহু প্রসারিত করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। উভয়কে পাইয়া, আনন্দে তাহাদিগকে বক্ষোমধ্যে নিপীড়িত করিলেন; গঙ্গাজলসিক্ত তাহাদের গাত্র, গঙ্গাজলের অপেক্ষাও পবিত্র স্নেহাশ্রুর দ্বারা বিধৌত করিলেন। তাহার পর গদাধরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “তুমি আমার বাড়ীতে চল, কাপড় ছাড়বে। পরে আমি আর অম্বিকা দুজনে তোমাকে নিয়ে তোমার বাপ মার কাছে নাড়িচা গ্রামে যাব।”

গদাধর। না, না, আপনাদের আর কষ্ট দিব না। এই ক্লান্তির পর অম্বিকার কিছু বিশ্রাম আবশ্যক। আমি একলা যাব।

অম্বিকা। তোমার শরীরের এই অবস্থায় আমরা তোমাকে একলা ছেড়ে দিতে পারি নে।

গদাধর। কেন? আমার শরীরের কি অবস্থা?

—এই বলিয়া গদাধর আপনার বিশাল শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

গদাধর তখন নিজ নিমজ্জনের ইতিহাস যাহা বর্ণনা করিল তাহা এইরূপঃ—ঝড়ে নৌকাখানা উল্টাইবার আগে আমি এবং দুই জন মাঝি জলে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলাম। কিন্তু তৃতীয় মাঝি নৌকার মধ্যে ছিল; তাহাকে সম্পূর্ণ আবৃত করিয়া, নৌকাখানা তাহার উপর উল্টাইয়াছিল। দুইজন মাঝি ও আমি সন্তরণ করিয়া তীরের দিকে যাইতেছিলাম। কিন্তু আমরা ক্ষিপ্ত তরঙ্গের দ্বারা প্রতি মুহূর্ত্তে বাধাপ্রাপ্ত হইতে-ছিলাম। সহসা একজন মাঝি বলিল যে, তৃতীয় মাঝি আসিতে পারে নাই, নিমগ্ন নৌকার মধ্যে বদ্ধ হইয়া আছে। একটা লোকের প্রাণ যাইবে? বড় কষ্ট হইল। নিজের কথা আর মনে রহিল না। ফিরিলাম। তরঙ্গের শত বাধা অতিক্রম করিয়া ফিরিলাম। উল্টানো নৌকার নিকটে আসিয়া, ডুব দিয়া, নৌকার খোলের মধ্যে অনুসন্ধান করিলাম। বহু কষ্টে মরণোন্মুখ মাঝিকে ধরিয়া বাহিরে আনিলাম। কিন্তু এই সময় নৌকামুখ তরঙ্গচালিত হইয়া সবলে আমার মস্তকে প্রহত হইল। তাহার পর আমার আর কিছু স্মরণ ছিল না। যখন জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম, নিমগ্ন তরীর সহিত আমি ভাসিয়া চলিয়াছি; আমার

হস্তপদ গুণরজ্জুতে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। যতক্ষণ সামর্থ্য ছিল, ততক্ষণ এই রজ্জু ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু হস্তপদ বদ্ধ, সে চেষ্টায় কোনও ফল হয় নাই। তাহার পর, অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া মরণের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এক একবার স্বপনের মত তোমাদের সব মনে পড়িতেছিল। এমন সময় অম্বিকা আসিয়া আমার উদ্ধার সাধন করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

গৃহাগত।

কালীদহ গ্রামের জমীদার বাবুর নাম শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তিনি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি। রত্নেশ্বর বাবু মনে করিলে হয়ত অম্বিকার বর মিলিত; কিন্তু তিনি ভীরুস্বভাবের লোক ছিলেন। জাতি-চ্যুতা, নিন্দিতা, বয়ঃপ্রাপ্তা অম্বিকার বিবাহ দিবার জন্য যে সৎসাহসের প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ছিল না। অথবা বিধিলিপি অন্যরূপ বলিয়াই বোধ হয় তিনি এই সৎকার্য্যে মনোযোগী হইতে পারেন নাই। তথাপি তিনি অম্বিকার পিতাকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাকে লইয়া, বা তাঁহার কন্যা অম্বিকাকে লইয়া আহারাদি করিতে গ্রামের অধিকাংশ লোকের ন্যায় তিনিও কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং অনেক সময়ে তাঁহাদিগকে আপন বাটীতে আহ্বান করিয়া যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করিতেন।

রত্নেশ্বর বাবুর আস্তাবলে গাড়ী ও বলবান অশ্ব সকল ছিল। আবশ্যক হইলে কানাত, সামিয়ানা, গালিচা, ঝাড় লণ্ঠন, তৈজসাদির ন্যায়, গাড়ী এবং জুড়ি তিনি গ্রামবাসীদিগকে ব্যবহার করিতে দিতেন। এখনও বাঙ্গালায় অনেক মান্য জমীদার গ্রামবাসিগণের বিবাহাদি উৎসবের জন্য কানাত, সামিয়ানা প্রভৃতি

বহু দ্রব্য আপনাদিগের তোষাখানায় মজুত রাখিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রকারের পরোপকার ক্রমে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে।

রত্নেশ্বর বাবুর গাড়ী চড়িয়া সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে, অম্বিকা ও গদাধরকে লইয়া নাড়িচা অভিমুখে চলিয়াছিলেন। গদাধর পিতামাতার কথা ভাবিতেছিল। হায়, যদি তাহার জীবননাশ ঘটিত, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধ হইয়া যাইতেন! এতক্ষণ তাহাকে বাড়ীতে আগত না দেখিয়া, না জানি তাঁহারা কতই অধীর হইয়া পড়িয়াছেন!

গদাধরের হাতে একটি পুঁটুলি, দেখিয়া কৃষ্ণ চাটুর্য্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গদাধর তুমি পুঁটুলি কোথায় পেলে? ওতে কি তোমার কাপড় চোপড় আছে? তা হলে, তুমি তোমার জিনিষ পত্তর বাঁচাতে পেরেছ। সে রকম বিপদের সময় জিনিষ পত্তর রক্ষা করা আশ্চর্য্য বটে।"

গদাধর। আজ্ঞে, কাপড় চোপড় আমি কিছুই রক্ষা করতে পারিনি।

কৃষ্ণ। তবে তোমার এ পুঁটুলিতে কি আছে?

অম্বিকা। বাবা, তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কর। আমি বলব, পুঁটুলিতে কি আছে। আমি ওটা খুলে দেখেছিলাম।

গদাধর। অ্যাঁ, তুমি আমার পুঁটুলি খুলে দেখেছ?

কৃষ্ণ। পুঁটুলিতে আছে কি?

অম্বিকা। আছে এক টিন তামাক, আর দশটি বেগুন, আর দশটি মূলো।

কৃষ্ণ। এ সকল নিয়ে তুমি কি করবে গদাধর? সমস্ত ছেড়ে, এমন বিপদের মধ্যে কেন তুমি এইগুলি যত্ন করে' রক্ষা করলে?

গদাধর। আমাদের গ্রামে ভাল তামাক পাওয়া যায় না। বাবা বলতেন, কলকাতার ফৌজদারী বালাখানার তামাক বড় ভাল। তাই বাড়ী আসবার সময় কিছু তামাক নিয়েছিলাম।

অম্বিকা। আর বেগুন মূলো?

গদাধর। সে বাবার জন্যে। এ সময় আমাদের গ্রামে বেগুন মূলো পওয়া যায় না। বাবা বেগুন মূলোর তরকারী খেতে বড় ভালবাসেন।

কৃষ্ণ। তাই, প্রাণসংশয় অবস্থাতেও তুমি ওগুলি ত্যাগ করনি! তুমি ধন্য, গদাধর! মা, অম্বিকা! গদাধর যেমন তার বাপকে ভালবাসে, তুমিও কি তোমার বুড়ো বাপকে তেমনই ভালবাস?

পিতার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অম্বিকা সক্ষম হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার অতি মধুর চক্ষুতে ভক্তি শ্রদ্ধা ও স্নেহ পূর্ণ করিয়া এমন একটি অদ্ভুত দৃষ্টি পিতার মুখের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিল যে, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রত্যেক অবয়ব এক স্বর্গীয় সুধায় আপ্লুত হইয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই একটি দৃষ্টিতে, তিনি পৃথিবীতে থাকিয়া, দেবতাদিগের বাঞ্ছিত স্বর্গীয় সুধা উপভোগ করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সময় তাঁহারা নাড়িচা গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন।

বড় রাস্তায় গাড়ী রাখিয়া, ক্ষুদ্র গ্রাম্য পথ অনুসরণ করিয়া, তাঁহারা গদাধরের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মধুসূদন মুখোপাধ্যায় এখনও গঙ্গাতীরে পুত্রের অপেক্ষায় দণ্ডায়মান ছিলেন; বাটীতে প্রত্যাগমন করেন নাই। গদাধর শয়ন-গৃহের দাওয়ায় একটী মাতুর বিস্তৃত করিয়া, তাহাতে অম্বিকা ও অম্বিকার পিতাকে বসিতে বলিয়া, মাতার অনুসন্ধানে পাকগৃহের দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

পাকগৃহের দাওয়ায় গদাইএর মাতা বসিয়া ছিলেন। তিনি গদাইকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর, গৃহের বংশ-স্তম্ভ ধরিয়া ধীরে ধীরে মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া, ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিলেন, "গদাই, বাবা আমার, বাড়ী এলে?"

গদাই দাওয়ার উপর উঠিয়া, মাতার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল, "মা, আমি এসেছি।"—"মা আমি এসেছি" এই তিনটি সামান্য শব্দে না জানি কি অপ্রমেয় মধুরতা সঞ্চিত ছিল; তাহাতে মাতার কর্ণ, বক্ষ—সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠিল; স্নেহরস মনো-মধ্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

গদাধর আবার কহিল, "মা, বাবা কোথায়?"

মাতা বলিলেন, "তোমার চক্রবর্ত্তী কাকা বোধ হয় বাড়ী-তেই আছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা কর। বোধ হয় তিনি এখনও গঙ্গাতীরে তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন। সেই সকালে গিয়েছেন, আর বাড়ী ফেরেন নি। সমস্ত দিন তাঁর খাওয়া হয় নি।"

গদাধর দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আমি যাই মা, আমি তাঁকে ডেকে আনি। আমার অপেক্ষায় সমস্ত দিন উপোস করে থাকা তোমাদের ভাল হয় নি।"

পুরাতন পরিচিত পথ সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্ণয় করা গদাধরের পক্ষে কিছুমাত্র ক্লেশদায়ক হইল না। অনতিবিলম্বে সে সহজেই তাহার চক্রবর্ত্তী কাকার বাটীতে উপস্থিত হইল। চক্রবর্ত্তী কাকা অন্য কেহ নহেন, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত উমাকালী চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী কাকার বাটীতে উপস্থিত হইয়া গদাধর ডাকিল, "চক্রবর্ত্তী কাকা।"

উমাকালী তাঁহার হস্তধৃত মৃৎপ্রদীপের আলোক সাধ্যমত উজ্জ্বল করিয়া, এবং তাহা ঊর্দ্ধে তুলিয়া, তাহার পূর্ণ রশ্মি গদাধরের উপর নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "আরে কে-ও? গদধর নাকি? কখন এলে? এস বাবা এস।"

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গদাধর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি বলতে পারেন কি, বাবা কোথায় আছেন? এখনও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।"

উমা। তুমি এই দাওয়ায় বসে' তোমার খুড়িমার কাছে কলকাতার গল্প কর। আমি মধুসূদন ভায়াকে ডেকে আনছি। এখনও বোধ হয় তিনি গঙ্গাতীরে তোমারই জন্যে অপেক্ষা করছেন।

গদাধর। না, আপনাকে যেতে হবে না, আমিই গঙ্গাতীরে গিয়ে তাঁকে ডেকে আনছি। আপনি বরং আমাদের বাড়ীতে

যান; সেখানে কালীদহ গ্রামের কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মশায় আর তাঁহার মেয়ে এসেছেন।

উমা। তোমাদের বাড়ীতে ত যাবই। কিন্তু তার আগে, আমিই মধুসূদন ভায়াকে ডেকে আনব। তোমাকে হঠাৎ তাঁর কাছে যেতে দিব না। তোমার বাবাকে ত তুমি চেন না! তোমাকে হঠাৎ দেখলে অত্যন্ত আহ্লাদে হয়ত কি একটা ভয়ঙ্কর রকম—"

গদাধর বুঝিল, কথাটা যুক্তিসঙ্গত বটে। বহুদিন, এবং বহু নিরাশার পরে হঠাৎ তাহাকে দেখিলে, তাহার অত্যন্ত স্নেহময় পিতা, দিনের মনঃকষ্ট এবং অনাহারের পর, মূর্চ্ছিত হইতে পারেন। অতএব সে পিতাকে আহ্বান করিতে যাইবার জন্য আর উদ্যত হইল না। উমাকালী চক্রবর্ত্তী একটি পুরাতন ধূচনির মধ্যে মৃতপ্রদীপটি লইয়া, এবং স্কন্ধদেশে গামছাখানি বিলম্বিত করিয়া, মধুসূদনের সন্ধানে গঙ্গার উপকূলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং অল্পসময় মধ্যে মধুসূদনকে লইয়া আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গদাই পিতার পদে প্রণত হইল। মধুসূদন নিজ মস্তক হইতে সেই রঙীন গামছার উষ্ণীষটি খুলিয়া, তাহার দ্বারা পুত্রের মুখ মার্জ্জিত করিয়া দিলেন। স্নেহাপ্লুত প্রকম্পিত দুই হস্তের দ্বারা পুত্রের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিলেন। আমার পাঠকবর্গের মধ্যে যদি কেহ গদাধরের ন্যায় পিতার স্নেহস্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া, পৃথিবীতে ত্রিদিবের সুখলাভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বুঝিবেন, গদাধর আজ কি পরিমাণে অতুলনীয়, অভাবনীয়

সুখে অভিভূত হইয়াছিল। সে স্পর্শ মোহিনীর সুধাভাণ্ডস্থিত সুধা অপেক্ষা সুধাময়। তাহা সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত হইয়া, অক্ষয় কবচের ন্যায়, বুঝি বা স্বয়ং মৃত্যুকেও পরাজয় করিতে সক্ষম হয়।

গদাই পিতাকে এবং তাহার চক্রবর্ত্তী কাকাকে লইয়া বাটীতে ফিরিল। শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও অম্বিকার নিকট তাঁহাদিগকে পরিচিত করিয়া দিল। তাহার পর, সে নিজের বিপদ ও তাহা হইতে উদ্ধারের কথা আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল।

মধুসূদন, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে ও তাঁহার কন্যা অম্বিকাকে দেখিয়া ধন্য হইলেন। হুঁকার জল পরিবর্ত্তন করিয়া, গদাধর কর্ত্তৃক কলিকাতা হইতে আনীত সেই বালাখানার তামাকু কলিকাতে সজ্জিত করিয়া, স্বহস্তে ধরিয়া কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়কে তামাকু খাইতে অনুরোধ করিলেন। কৃষ্ণবিহারী কহিলেন, "মশায়, আমি এখনও তামাক খেতে অভ্যাস করি নি।"

মধুসূদন। বলেন কি? আপনি তামাক খান না?

কৃষ্ণ। না মশায়, ওটা এ পর্য্যন্ত অভ্যাস হয় নি। যদি উৎকৃষ্ট তামাক বালাখানা থেকে আনবার জন্যে, আর নিজে জলে ডুবে মরণাপন্ন অবস্থাতেও তা রক্ষা করবার জন্যে, আমার গদাধরের মত একটি ছেলে থাকত, তা হলে কি হত বলা যায় না। কেননা, এরকম ছেলের আদর-মাখা তামাকটা আর তামাক থাকত না। তা অমৃত হয়ে যেত।

মধুসূদন। আপনি সত্য বলেছেন, গদাধর আমাকে বড় ভালবাসে।

কৃষ্ণ। আপনি স্নেহবান্ পুরুষ। মানুষের মন যতদিন স্নেহরসে পরিপ্লুত না হয়, ততদিন তা নরক থাকে;—আমাদের শাস্ত্রকরেরা তাকে পুন্নামক নরক বলেছেন। পুন্নাম নরক থেকে উদ্ধার করে বলেই ত এর নাম পুত্র হয়েছে।

মধুসূদন ও কৃষ্ণ চাটুয্যে যখন কথোপকথনে ব্যাপৃত, তখন উমাকালী চক্রবর্ত্তী মধুসূদনের হস্ত হইতে হুঁকাটি লইয়া নীরবে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন।

শুভ্র স্নুগন্ধি ধূম দীপালোকে আলোকিত হইয়া, চন্দ্রালোকিত শারদ নীরদমালার ন্যায়, তাঁহার মুখের চারি পার্শ্বে শোভা পাইতেছিল। তাম্রকূটের সুবাসিত মধুরতায় বিজড়িত, অর্দ্ধনিমীলিত তাঁহার লোচনদ্বয়, অম্বিকার স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য অবলোকনে নিতান্ত নিযুক্ত ছিল। তাম্রকূটের ধূমের মধ্য দিয়া, এবং ক্ষীণ দীপালোকে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন বলিয়া, এবং নিরীক্ষণকালে তাঁহার চক্ষু অর্দ্ধনিমীলিত থাকায়, উমাকালীর বক্ষে অম্বিকার মধুর মূর্ত্তি, ধূপ ধূনার ধূমমধ্যবর্ত্তিনী স্বপ্নদৃষ্টা এক অপূর্ব্ব দেবী প্রতিমার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। মূর্ত্তি দেখিয়া, মুগ্ধ উমাকালী ভাবিতেছিলেন, কে এ বালিকা? শরীরিণী বীণাপাণির ন্যায়, দেব-চিত্রকরের মূর্ত্তিমান্ চিত্রাদর্শের ন্যায়, কুসুমসুষমাগঠিত জীবন্ত পুত্তলিকার ন্যায়, কে এ বালিকা? মহিমময়ীর ন্যায়, কমলাপতির শিরোভূষণ ললিত পুষ্পমালার ন্যায়, কে এ বালিকা? ইনি কি দেবী সরস্বতী, মধুসূদনের পুত্রকে বিদ্যাদান করিবার জন্য জগতে আবার আবির্ভূতা হইয়াছেন? মধুসূদন আমাদিগকে সত্য

বলিত যে, তাহার আশীর্ব্বাদে দেবী বীণাপাণি তাহার পুত্রকে আপনি বিদ্যাদান করিবেন। তাহার আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছে; গদাধর বিদ্যালাভ করিয়াছে; স্বয়ং বিদ্যাদেবী তাহাকে বিদ্যাদান করিয়াছেন।

কৃষ্ণ চাটুর্য্যের সহিত কথা কহিতে কহিতে মধুসূদন বামহস্ত প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "উমাকালী ভাই, হুঁকোটা এদিকে।"

কথাটা শুনিয়া, উমাকালীর স্বর্গের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাহার পর অম্বিকাও গদাধরের মাতার আহ্বানে গৃহমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

মধুসূদন তামাকু খাইতে খাইতে কৃষ্ণ চাটুর্য্যেকে প্রসঙ্গ-ক্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, মেয়েটির বিবাহ দিয়েছেন কোথায়? যে রকম রূপ দেখছি, তাতে রাজমহিষীও এঁর নিকট লজ্জিতা হবেন।"

কৃষ্ণ। আমার মেয়ের এখনও বিবাহ হয় নি।

মধুসূদন। কেন? বিবাহের বয়স ত উত্তীর্ণ হয়েছে।

কৃষ্ণ। এ পর্য্যন্ত, আমার মেয়েটিকে বিবাহ করবার জন্যে আমি সুপাত্র পাই নি। আর—

মধুসূদন। আর কি, মশায়?

কৃষ্ণ। আমার মেয়ের কোষ্ঠীর এই ফল যে, ওর কথনও বিবাহ হবে না।

মধুসূদন। বলেন কি? এরকম কথনও ত শুনি নি!

কৃষ্ণ। না। কিন্তু এই তার বিধিলিপি।

গদাধর পিতার পার্শ্বে বসিয়া শুনিল যে, অম্বিকার কথনও

বিবাহ হইবে না ; কেননা, উহাই অখণ্ডনীয় বিধিলিপি। বিধাতার আদেশ লঙ্ঘন করিয়া অম্বিকাকে বিবাহ করিতে পারে, এমন মানুষ পৃথিবীতে কোথা? যদি সে অর্থবান্, রূপবান্, বিদ্বান্, হইয়া অম্বিকা-লাভের উপযুক্ত হইতে পারিত, তাহা হইলে হয়ত সে বিধিলিপি লঙ্ঘনের জন্য একবার চেষ্টা করিত। কিন্তু না ;—এই কদর্য্য দেহ লইয়া, এই অসম্ভব অর্থহীনতা লইয়া, এই রাজমুকুটের মণি লাভ করিবার আশা করা নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কর্ম্ম। গদাধর তাহার পতি হওয়া অপেক্ষা, অম্বিকার চিরদিন কুমারী থাকাই শ্রেয়স্কর। না,—অম্বিকাকে পত্নীরূপে লাভ করিবার দুরাশা গদাধরের হৃদয়মধ্যে আর কখনও, স্থানলাভ করিবে না।

রাত্রি নয়টার পর, আহারাদি করিয়া, জমীদার শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গাড়ী চড়িয়া, গদাধর এবং গদাধরের পিতা ও মাতার নিকট বিদায় লইয়া, অম্বিকা ও তাহার পিতা কালীদহ গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

উমাকালীও বিদায় লইল। যাইবার সময় মধুসূদন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উমাকালী ভাই, তামাকটা কেমন খেলে বল দেখি?"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

উপন্যাস-রঙ্গমঞ্চে নায়িকার-আবির্ভাব।

চলি, চলি পা পা।

পাঠকগণ, তোমরা সমাহিত হও—আমার সুন্দরী নায়িকা আমার এই গল্পের আসরে অবতীর্ণা হইতেছেন। এতদিন তিনি আসেন নাই বলিয়া তোমরা তাঁহাকে কত খুঁজিয়াছ। তাঁহার নূপুরমুখরিত চরণধ্বনি শুনিবার জন্য কত উদ্‌গ্রীব হইয়া বসিয়া আছ। এখন ঐ দেখ, ঐ তিনি আসিতেছেন। পদ্মিনী-সমাশ্রিত ভ্রমরগুঞ্জনের ন্যায়, রুণুরুণু ঐ শুন তাঁহার মধুর নূপুর-ঝঙ্কার। বেলাপ্রতিহত নিনাদিনী তটিনী তরঙ্গের ন্যায় কলকল হাসি। মধুবসন্তের প্রথম কোকিল-কুহুরবের ন্যায়, ঐ শুন তাহার সরস মুখের মধুর ভাষণ।

চলি চলি, পা পা।

ঐ দেখ, ঐ আমার নায়িকা আসিয়াছে। দিক্‌সকল তাহার আগমনে ঐ দেখ আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, পূর্ণিমার পূর্ণ জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত মেদিনীর বক্ষের ন্যায়, আমার এ উপন্যাসের রঙ্গমঞ্চ, আমার এ নায়িকার রূপালোকে প্রভাসিত হইয়াছে। দেখ দেখ, তাহার চরণের কি চমৎকার শোভা;—কি কোমল ফুল্ল কুসুমবৎ চরণ দু'খানি; তাহাতে—আ মরি—

আভরণের কি সুমধুর অস্ফুটধ্বনি! তাহার পীবর নগ্ন কটিতট, দেখ দেখ, সুচারু সুবর্ণ অলঙ্কারে কিরূপ অপরূপ বিভূষিত হইয়াছে। তাহার লীলা-প্লাবিত উন্মুক্ত উরসে, দেখ দেখ, দলদলায়মান কনক-কণ্ঠভূষা সুবর্ণবর্ণ সর্পের ন্যায় কেমন দুলিতেছে। তাঁহার বিকচ ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া, দেখ দেখ, তাহার নোলকের স্ফীত মুক্তাটি কেমন কাঁপিতেছে। তাহার কেশাগ্রভাগ ধরিয়া, কেশ-নিবদ্ধ সুবর্ণ বিজড়িত রত্নমালা দিক্‌সকলকে রোমাঞ্চিত করিয়া, দেখ দেখ, কেমন কোমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতেছে।

পরিচারিকা করতালি দিয়া ডাকিতেছে, 'চলি চলি, পা পা।' আর মানদা—এই উপন্যাসের নায়িকা—তাহার করতালির তালে তালে পা ফেলিয়া অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু সে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। অল্প অগ্রসর হইয়াই, বারান্দার মেঝের উপর বসিয়া, চুড়ি ও বালার দ্বারা পরিশোভিত হস্ত উত্তোলন করিয়া, সঙ্কেতে পরিচারিকাকে আহ্বান করিল এবং জানাইল, "আমাকে কোলে কর।"

কে এ মানদা?

আমি তোমাদিগকে কালীদহ গ্রামের কথা বলিয়াছি। আর বলিয়াছি যে, সেই কালীদহ গ্রামে একজন জমীদার ছিলেন। এবং ইহাও বলিয়াছি যে, সেই জমীদার বাবুর নাম শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। মানদা রত্নেশ্বর বাবুর কন্যা; একমাত্র কন্যা। চারি বৎসর ধরিয়া যোড়া কার্ত্তিক পূজার একমাত্র পুণ্যফলস্বরূপ

কন্যা ; এবং তাঁহার ত্রিংশ সহস্র মুদ্রা বার্ষিক আয়ের জমিদারীর উত্তরাধিকারিণী কন্যা।

মানদা পরিচারিকা ও পরিজনগণের গলার হার ; জমিদার-গৃহিণীর বক্ষের নিধি এবং স্বয়ং জমিদার বাবুর নয়নের মণি। মানদা হাসিলে সকল লোক মনে করিত যে, হাসিরাশির সহিত রাশি রাশি কোহিনূর বর্ষিত হইতেছে ; আর কাঁদিলে মনে করিত যে, অশ্রুধারার সহিত গজমুক্তার বৃষ্টি হইতেছে। মানদা কথা কহিলে মনে হইত, কর্ণবিবরে যেন বাগবাজারের রসগোল্লা প্রবিষ্ট হইতেছে। মানদা অঙ্গ সঞ্চালন করিলে মনে হইত, যেন ক্ষীরসমুদ্রে মণিমণ্ডিত তরঙ্গ উঠিয়াছে।

কিন্তু এ হেন মানদাকে নায়িকারূপে পাইয়াও, তোমাদের দুঃখিত হইবার কারণ বিদ্যমান আছে। তাহার বয়সের কথা শুনিলে তোমরা সবিশেষ হতাশ্বাস হইয়া পড়িবে। বুঝি বা আমার এ নীরস কাহিনী পড়িতে বিরত হইবে। তবু, এ অকথ্য কথা তোমাদিগকে শুনাইতেই হইবে। তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও। মানদার বয়ঃক্রম দুই বৎসর মাত্র।

হায় হায় ! কি সর্ব্বনাশ! নায়িকার বয়স দুই বৎসর মাত্র ! তথাপি তোমরা হতাশ হইও না। তোমাদের আশা ক্ষীণ অগ্নিকণার ন্যায় হইলেও, কালে ঐ অগ্নিকণা হইতেই বিশাল অনল-শিখা গগন স্পর্শ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিবে। ধৈর্য্য ধর। এই দুই বৎসরের ক্ষুদ্র নায়িকার মধ্যে মহা প্রেম-মহীরুহের অঙ্কুর বিদ্যমান আছে। এ অঙ্কুর কালে বৃদ্ধি প্রাপ্ত

হইবে। ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। যে মেহেরউন্নিসা বিবি, নূরজাহান নাম গ্রহণ করিয়া, আপন চম্পককলি-বিনিন্দিত ক্ষুদ্র তর্জ্জনী সঞ্চালনে বিশাল ভারত রাজ্য,—অপিচ ভারত-সম্রাট্‌কে প্রকম্পিত করিয়াছিলেন, তিনিও একদিন মরুপথ-পার্শ্বে পরিত্যক্তা অসহায়া ক্ষুদ্র বালিকা ছিলেন। ভারত-শাসনের সমস্ত মন্ত্র, বীজ-রূপে সেই সদ্যঃপ্রসূতার ক্ষুদ্র দেহমধ্যে নিহিত ছিল। এক্ষণে মানদা—নায়িকার অঙ্কুর। কিন্তু এই অঙ্কুরই একদিন বড় হইবে। বড় হইয়া ভারতসাম্রাজ্য অপেক্ষা বৃহৎ এবং আকাশের ন্যায় উদার এক মনোরাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে। সেই শুভদিনের শুভাগমনের জন্য, তোমরা পথপানে চাহিয়া থাক।

আপাততঃ, 'নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল' এই মহাবাক্যের অনুসরণ করিয়া, তোমরা মানদার কিঞ্চিৎ মধুর ভাষা শ্রবণ কর। নায়িকারা বয়োধিকা হইলে, তাহাদের 'তেল নাই, ঘি নাই' ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ভাষা শ্রবণ করা অপেক্ষা, আমার মতে, নায়িকাদের নাবালিকা অবস্থার কথা শ্রবণ করা অনেক সুখকর।

মানদার ভাষাশিক্ষয়িত্রী—শ্রীমতী লাবণ্যসুন্দরী দাসী। কিন্তু লাবণ্যসুন্দরী নামটা তাহার নামকরণের পর আর ব্যবহার হয় নাই। না না, তাহার বিবাহের সময় নামটা আর একবার ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহা আমার পূজনীয় ঠাকুরদাদা মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। তদতিরিক্ত সময়ে শ্রীমতী লাবণ্যসুন্দরী, "নুলি" এই অপূর্ব্ব আখ্যায় অভিহিত হইত। লাবণ্যসুন্দরী কিরূপে 'নুলি'তে

পরিণত হইল, তদ্বিষয়ে আমার নিজ অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র নাই। আমার এক প্রত্নতত্ত্ববিৎ বন্ধু কহিয়াছিলেন যে, বয়োবৃদ্ধিসহকারে লাবণ্যসুন্দরীর সুন্দরীত্ব, বেঙাচির ল্যাজের ন্যায় খসিয়া খসিয়া পড়িয়াছিল; পরে লাবণ্য শব্দের 'লাব' স্থানে 'লু' এব 'ণ্য' স্থানে 'নু' হইয়া লাবণ্যটা 'লুনি' হইয়াছিল। পরে 'লু'টা 'নু' আর 'নি'টা 'লি'তে সহজেই পরিণত হইয়াছিল; 'লবণ' হইতে এইরূপে 'নুন' হইয়াছে। নুলির উননমুখো, হতচ্ছাড়া, হাড়জ্বালানে মিন্সে যখন তাহাকে জন্মের মত মৎস্যাহারে বঞ্চিত করিয়া, নূতন প্রেতিনীর অনুসরণে প্রেতাত্মা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তখন নুলির বয়স আঠাইশ বৎসর। সে সেই আঠাইশ বৎসর বয়সে কালীদহ গ্রামের জমীদার বাবুদিগের গৃহে দাসীরূপে প্রবেশ-লাভ করিয়াছিল। যে বৎসর সে পরিচারিকা নিযুক্ত হইল, সেই বৎসরেই বর্ত্তমান জমীদার শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর বাবু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নুলি রত্নেশ্বর বাবুকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। আজ রত্নেশ্বর বাবুর বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, এবং নিজের যাটি বৎসর বয়সে, নুলি রত্নেশ্বর বাবুর কন্যা মানদাকে কোলে করিয়া ভাষা শিক্ষা দিতেছিল। নুলি নিরক্ষর। তথাপি উপাধিধারী মহাপণ্ডিতগণ সিবিল সার্ভিসের ছাত্রগণকে বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপন্ন করিতে যেরূপ প্রয়াস পাইয়া থাকেন, নুলি দুই বৎসরের শিশু কন্যাকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার অর্দ্ধেক পরিশ্রমও স্বীকার করিত না। নুলির শিক্ষাপ্রণালী বিচিত্র। সে মানদার সম্মুখে বসিয়া শত প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া, দন্তহীন মুখ-

বিবরে লালাবিজড়িত হাসির তরঙ্গ তুলিয়া বলিত, "চলি চলি, পা পা।" আর মানদা, অরুণালোকিত শিশিরকণার ন্যায় ছয়টি নূতন দন্ত বাহির করিয়া, নুলির অঙ্গভঙ্গির তালে তালে পা ফেলিয়া বলিত, "তলি তলি, তা।" নুলি করতালি দিয়া তালে তালে বলিত, "তাই তাই তাই, মামার বাড়ী যাই।" মানদা দুলিয়া দুলিয়া, ক্ষুদ্র করপল্লবের উপর ক্ষুদ্র করপল্লব স্থাপন করিয়া বলিত, "তা, তা, তা।"

এইরূপে মানদার ভাষাশিক্ষা হইতেছিল। আর আমরা ত বলিয়াছি—ঘি নাই, তেল নাই—ইত্যাদি ভাষা অপেক্ষা এই ভাষা অধিক শ্রুতি-সুখকর।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অম্বিকার গোপন প্রেম।

গুরু, শিষ্যকে ভালবাসেন। কেন? শিষ্যের শিক্ষার জন্য যত্ন করিয়া, পরিশ্রম করিয়া, তাহার শিক্ষিত মনটি, গুরুর নিকট, একটি পরিশ্রমলব্ধ যত্নের জিনিষ হইয়া পড়ে। তাই তিনি শিষ্যকে ভালবাসেন। তুমি গুরু না হইয়াও, যদি কাহারও শিক্ষার জন্য এইরূপ যত্ন কর, তাহা হইলে, তোমারও তাহার প্রতি শিষ্যের ন্যায় একটা ভালবাসা জন্মিবে। এই হিসাবে অম্বিকা গদাধরকে একটু ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু তখন ভালবাসার বীজটিমাত্র তাহার কোমল হৃদয়োদ্যানে রোপিত হইয়াছিল; তাহা অঙ্কুরিত হয় নাই।

তাহার পর অম্বিকা, সেই একটু ভালবাসার সামগ্রীকে আপন জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া, সঙ্কটাপন্ন এবং প্রাণনাশক বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। যাহার প্রাণটা আমার প্রাণ দিয়া বাঁচাইতে যাই, তাহার প্রতি আমার মনের কেমন একটা টান আসিয়া উপস্থিত হয়। অম্বিকার মনে এই টান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এই টানে পড়িয়া, পূর্ব্বরোপিত ভালবাসার বীজটি তাহার করুণাসরস হৃদয় মধ্যে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল।

তাহার পর, গদাধরের কৃষ্ণমূর্ত্তিকে স্বর্গীয় প্রভায় প্রভাসিত করিয়া, তাহার অন্তরস্থ অপূর্ব্ব পিতৃভক্তি অম্বিকার বিস্ফারিত

লোচনাগ্রভাগে প্রতিভাত হইয়া উঠিল, তাহার অন্তরের শোভা, বাহিরের কর্কশ দেহ আচ্ছন্ন করিয়া শত সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত হইল ; অমনি অম্বিকার হৃদয়নিহিত ভালবাসার অঙ্কুরটি শোভন পল্লবদলে পরিশোভিত হইয়া, বৃক্ষের আকার ধারণ করিল।

এইরূপে গদাধরের প্রতি অম্বিকার ভালবাসা জন্মিল। এইরূপে ভালবাসার বীজ অম্বিকার পবিত্র হৃদয়োদ্যানে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইল। এখন দেখা যাউক, এ গাছে কি ফুল ফোটে, কি ফল ফলে।

যে দিন অম্বিকা গদাধরের পুঁটুলি খুলিয়া, তাহার মধ্যস্থিত তামাকুর কৌটা প্রভৃতি দেখিয়াছিল, সেই দিন, তাহার নিকট তৎকার্য্যের সংবাদ পাইয়া গদাধর তাহাকে বলিয়াছিল যে সে কার্য্যটা নিতান্ত স্ত্রীলোকের ন্যায় হইয়াছে। সেই দিন হইতে গদাধরের বাক্যে সে আপনাকে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিয়াছিল। আপনার পরিচয় পাইয়া, সেই দিন হইতে নারী হৃদয়ের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাহার মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মন ভালবাসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। একটি চির-পূজ্যকে ভক্তিবিনির্ম্মিত পূজার আসনে বসাইয়া, তাহার চরণে শোভাময় সৌরভময় প্রেমপুষ্প উপহার ঢালিয়া পূজা করিবার বিপুল বাসনা, তাহার মনের মধ্যে যেন পূজার বাদ্যোদ্যমে জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই যে পূজা করিবার সাধ, ইহাই নারীধর্ম্ম।

কিন্তু অম্বিকা জানিয়াছিল যে, তাহার বিবাহ হওয়া বিধিলিপি নহে। পিতার যে গুরুদেবের বাক্য বেদবাক্যের ন্যায় আমোঘ, সেই গুরুদেব এই কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। বিধিলিপি খণ্ডন

করিতে মানবশক্তি কি সমর্থ নহে? অম্বিকার অনুরোধে গদাধর যদি তাহাকে বিবাহ করে? কে তাহা নিবারণ করিবে? বিধাতা আপনি আসিয়া তাহা কি নিবারণ করিবেন? কিরূপে? বিবাহের দুই দণ্ড পূর্ব্বে গদাধরকে লোকান্তরে চিরনির্ব্বাসিত করিয়া, তিনি যদি অম্বিকার ভাগ্যলিখন অক্ষুণ্ণ রাখেন, তখন অম্বিকা কি করিবে? না না, গদাধর চিরজীবী হউক,—অম্বিকা তাহাকে কখন বিবাহ করিবে না। তবে বিবাহ না করিয়া, সে কিরূপে গদারধকে পূজা করিবে? তাহা ত সম্ভব নহে। সে আপনার কলঙ্কের কথা ভাবে না। কিন্তু সে তাহার নির্ম্মল পূজার সামগ্রীটি কিরূপে কলঙ্কিত করিবে? অম্বিকার চক্ষে প্রেমের এমনই মহিমা,—গদাধর তখন স্বর্গের দেবতা অপেক্ষা মহান্। এই দেবতাকে তাহার স্বর্গের উচ্চ আসন হইতে বিচ্যুত করিয়া, কিরূপে সে আপনার দীনবক্ষে পূজার জন্য লইয়া আসিবে? না, ইহা হইবার নহে। তাহা অপেক্ষা, অম্বিকার দেবতা স্বর্গেই থাকুন। আর অম্বিকা, পৃথিবীতে থাকিয়া, উদ্দেশে আপনার সুখ তাহার চরণে নিবেদন করিবে। অতএব অম্বিকা প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহার ভালবাসার কথা কাহাকেও জানিতে দিবে না। সে তাহার প্রেম, পেটকবদ্ধ রত্নের ন্যায়, যত্নপূর্ব্বক হৃদয়মধ্যে গোপন করিয়া রাখিল।

অম্বিকা ভুল বুঝিয়াছিল। ভালবাসা গোপন করিতে পারা যায় না। অন্য সকলের নিকটে হয়ত তাহা গোপন রাখিতে সমর্থ হইবে, কিন্তু যাহাকে ভালবাসিবে, তাহার নিকট হইতে

ভালবাসা গোপন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। মাতা কিছু বলেন না, বলিলেও তাঁহার ভাষা তাহার বোধগম্য নহে, তথাপি ছয় মাসের শিশুটি মাতার কোলে শুইয়া বুঝে যে ইহা মাতৃক্রোড় বটে। মাতার অন্তরের ভালবাসা তাহার অন্তরকে বুঝাইয়া দেয় যে হাঁ, এই ক্রোড় স্নেহসিক্ত বটে। ছয় মাসের শিশুটি যদি মাতার ভালবাসা অনুভব করিতে পারিল, গদাধর কি বহু কথা কহিয়া, একত্র গ্রন্থালোচনা করিয়া, একত্র ভ্রমণ করিয়া এবং আপনার হৃদয়ের আকর্ষণ লইয়া অম্বিকার ভালবাসা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে না? হইবে। অথবা হইয়াছে। সে দিন যখন বিধিলিপি লঙ্ঘন করিয়া অম্বিকাকে বিবাহ করিবার দুরাশা তাহার হৃদয় মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছিল, তখনই তাহার অজ্ঞাতে অম্বিকার গোপন প্রেম আসিয়া তাহার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিয়াছিল। বসন্তের অদৃশ্য বায়ুর স্পর্শে কুসুমের অস্ফুট কলিসকল যেমন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, অম্বিকার অদৃশ্যে, প্রেমের স্পর্শে গদাধরের হৃদয়মধ্যে তেমনই সৌরভময় ফুলসকল ফুটিয়াছিল।

তথাপি, প্রেম গোপন রাখিবার জন্য অম্বিকা সাধ্যমত চেষ্টা করিল। পূর্ব্বে সে গদাধরের সহিত যে ভাবে কথা কহিত, এক্ষণে তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন করিল না। তবে আপনার চক্ষুর দৃষ্টিকে সে বিশেষরূপে প্রশমিত রাখিল। হায়! তখন ত সে বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার এই বদ্ধ প্রেম, গিরিনিরুদ্ধ নির্ঝরিণীর ন্যায় অসীম শক্তি সঞ্চয় করিয়া, তাহার সংযমের সমস্ত বাঁধ একদিন ভাঙ্গিয়া ভাসাইয়া দিবে!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

চারুশশীর প্রেমলিপি।

গঙ্গাস্নানের সময় যখন উমাকালী চক্রবর্ত্তীর সহিত মধুসূদনের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তিনি তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছিলেন, "উমাকালী ভাই, আজ বিকেলে তুমি আমাদের বাড়ীতে যেও। গদাই যে ভাল তামাক এনেছে, এখনও তার কিছু আছে, আজ দু' চার ছিলিম খাওয়া যাবে।" তদনুসারে উমাকালী চটি জুতা পরিয়া, চম্পকবর্ণ গামছাখানি স্কন্ধে স্থাপন করিয়া, এবং তৈলপক্ক বংশযষ্টি হস্তে লইয়া, মধুসূদনের বাটীতে বিকালে বেড়াইতে আসিলেন।

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মধুসূদন অত্যন্ত আনন্দসহকারে কহিলেন, "শুনেছ, ভাই, আজকের সোমপ্রকাশে পাশের খবর বেরিয়েছে। গদাই আমার পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হয়েছে। সে মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পাবে।"

উমা। বল কি? কুড়ি টাকা বৃত্তি পাবে? মধুসূদন ভাই, তোমার গদাই ছেলেটিকে সামান্য ছেলে ভেব না। ছেলেবেলায় যখন ও গাছে চড়ে', মাছ ধরে', খেলা করে' বেড়াত, তখন আমরা ওর মর্ম্ম কিছুই বুঝতে পারি নি। দেখ ভাই, তোমাকে আমি চুপি চুপি একটা কথা বলি।

মধু। কি কথা?

উমা। তোমার এই ছেলেটির প্রতি, দেবী সরস্বতীর কৃপা হয়েছে।

মধু। তুমি কি করে' জানলে?

উমা। তোমার মনে আছে, তুমি তখন বলতে যে দেবী স্বরস্বতী স্বয়ং আবির্ভূতা হয়ে তোমার ছেলেকে বিদ্যাদান করবেন? সেদিন কালীদহ গ্রাম থেকে যে ভদ্রলোকটি এসেছিলেন,—তাঁর নামটি কি ভাল?

মধু। তাঁর নাম কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায়।

উমা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায়। এই কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায়ের মেয়েটিকে তুমি ভাল করে' দেখেছিলে?

মধু। দেখছিলাম। খুব সুন্দর মেয়ে।

উমা। মেয়েটি মানুষ নয়, সাক্ষাৎ দেবী। দেবী সরস্বতী।

মধু। বল কি? শুনলাম মেয়েটির বিবাহ হয় নি।

উমা। ওহে ভাই! সরস্বতী দেবীকে কি পৃথিবীর লোকে বিবাহ করতে পারে?

যখন দুই বন্ধুতে বসিয়া, ফৌজদারী বালাখানার তামাকুর ধূম উদগীরণ করিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন গ্রাম মধ্যে গ্রামবাসিগণের মুখে মুখে গদাধরের সুখ্যাতি উছলাইয়া পড়িতেছিল।

গদাধর কিন্তু এ সংবাদ তখনও প্রাপ্ত হয় নাই। দিবানিদ্রার

পর গাত্রোত্থান করিয়া বৃদ্ধ মধুসূদন দেখিয়াছিলেন যে, গদাধরের নামে দুই খানি পত্র এবং একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আসিয়াছে। তিনি পত্র দুইখানি গদাধরের জন্য বালিশের নীচে রাখিয়া, মোড়ক খুলিয়া সোমপ্রকাশখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, প্রবেশিকা-পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। দেখিলেন, সর্ব্ব প্রথমেই গদাধরের নাম। দেখিয়া, গদাধরকে সংবাদ দিবার জন্য তিনি তাহার অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু সে ছিপ্ লইয়া কোথায় কাহাদের পুকুরে মাছ ধরিতে গিয়াছিল—কোনও স্থানে তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু তাহাকে সন্ধান করিতে যাইয়া, রাস্তায় যাহার সহিত মধুসূদনের সাক্ষাৎ হইল, তিনি তাহাকেই তাঁহার অত্যন্ত সুখসংবাদটি প্রদান করিয়া সুখী হইলেন। বাটীতে ফিরিয়া, অল্পকাল মধ্যে উমাকালী চক্রবর্ত্তীকে সমাগত দেখিলেন।

সন্ধ্যাকালে, দুইটি বৃহদাকার রোহিত মৎস্য হস্তে করিয়া গদাধর বাড়ী ফিরিল। প্রবেশমাত্র মধুসূদন ত্বরিতপদে তাহার হস্ত হইতে মৎস্য দুইটি লইয়া, সংবাদ দিলেন, "গদাই, তুমি পাশ হয়েছ ; প্রথম হয়েছ।"

গদাধর ছিপ্ রাখিয়া, ধূলির উপর জানু স্থাপন করিয়া দুই হস্ত দ্বারা পিতার পবিত্র পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল।

মধুসূদন পুত্রের মস্তকে স্নেহ-মণ্ডিত করের দ্বারা স্পর্শ করিয়া মনে মনে ডাকিলেন, "দয়াময় প্রভু, আমার এ বংশের তিলককে তুমি রক্ষা করিও।" পরে উমাকালী চক্রবর্ত্তীর দিকে ফিরিয়া

কহিলেন, "ভাই! গদাধর আজ দুটো মাছ ধরেছে, এ মাছ দুটো তুমি নিয়ে যাও; খাবে।"

উমাকালী কহিল, "সর্ব্বনাশ! আমরা দুটি প্রাণী, এই দুটো বড় মাছ কি খেতে পারব? এর একটি মাছ বয়ে নিয়ে যাবার শক্তিও আমার নেই।"

গদাধর বলিল, "চক্রবর্ত্তী কাকা, বাবা যা বলছেন তা আপনাকে শুনতেই হবে। আমি মার সঙ্গে দেখা করে মাছ আপনাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেব, কুটে দেব, আর যদি দরকার হয়, তা হলে মাছ ভাজবার তেল কলুবাড়ি থেকে এনে দেব।"

উমাকালী একটু চিন্তিত হইলেন, পরে গদাধরকে বলিলেন, "বাবাজি, তুমি যখন মাছ সম্বন্ধে এতটা ভার গ্রহণ করলে, তখন মাছ খাবার ভারও গ্রহণ কর; কেননা তোমার বুড়ো চক্রবর্ত্তী কাকার এই বয়সে এমন সাধ্য নেই, আর তোমার খুড়িমারও এমন সাধ্য নেই যে এই দুটি বড় মাছের—বুঝেছ?"

গদাধর মৎস্য দু'টি কুটিয়া, ধুইয়া, লবণাক্ত করিয়া, তাহার চক্রবর্ত্তী কাকার বাটীতে পৌঁছিয়া দিল। সে রাত্রে মধুসূদন স্ত্রী-পুত্র লইয়া, উমাকালীর বাটীতে আহার করিলেন। গ্রামের আরও দুই চারি ব্যক্তি মৎস্য খাইবার জন্য উমাকালীর বাটীতে আহূত হইয়াছিল। গদাধরের খুড়িমা রাঁধিয়াছিলেন ভাল, কিন্তু সকলেই কহিলেন, "অম্বলটা যদি টাটকা না হয়ে বাসি হত, তা হলে মাছগুলি মজ্‌ত ভাল।"

আহারাদির পর বাটী ফিরিয়া, মধুসূদন কহিলেন, "গদাই, তোমাকে বলতে ভুলেছিলাম ; বালিশের নীচে তোমার দু'খানি চিঠি আছে ; আজ ডাকে এসেছে।" গদাই প্রদীপের কাছে মাদুরে বসিয়া পত্র পড়িতে লাগিল।

একখানি পত্র, তাঁহার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নিকট হইতে আসিয়াছিল। পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করার জন্য তিনি তাহার কত প্রশংসা করিয়াছেন। ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাহাকে কত সদুপদেশ দিয়াছেন।

দ্বিতীয় পত্রখানি কাহার নিকট হইতে আসিয়াছে, তাহা গদাধর সহজে বুঝিতে পারিল না। তাহা প্রেম-লিপির ন্যায়। যেন কোন প্রেমপীড়িতা যুবতী তাহার প্রাণধিককে প্রেম সম্ভাষণ করিয়াছে। কে এ যুবতী? পত্রের নিম্নে স্বাক্ষর দেখিয়া, সে কিছুই অবধারণ করিতে পারিল না। পত্রখানি কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। তাহার সহপাঠী কোনও বালক পরিহাস করিয়া কি তাহাকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছে? পত্রে এইরূপ লেখা ছিল—

"তোমাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিব জানি না। এ জন্য কোন প্রকার সম্বোধন করিলাম না। তোমার ঠিকানা জানিতে পারি নাই বলিয়া, এত দিন তোমায় পত্র দিতে পারি নাই। তা' না হইলে অনেক দিন আগে তোমাকে পত্র লিখিতাম। আজ বহুকষ্টে তোমার ঠিকানা জানিয়া তোমায় পত্র লিখিতে বসিয়াছি। তুমি কেমন আছ? বাড়ী যাইবার আগে আমার সহিত দেখা করিয়া যাও নাই কেন? আমি তোমাকে

একটিবার দেখিবার জন্য যে কত কাতর, তাহা তোমাকে কিরূপে বুঝাইব? বিধাতা মেয়েমানুষকে পাখীদের মত পাখা দেন নাই কেন? যদি আমার পাখা থাকিত, আমি এই দণ্ডে তোমার নিকট উড়িয়া যাইতাম। তুমি আমার পাখা দেখিয়া মনে করিতে, আকাশ হইতে পরী নামিয়া আসিয়াছে। আমি তোমাকে আদর করিতাম। আমার আদরে, তুমি শিহরিয়া উঠিতে। পাখা থাকিলে, এই সব হইত বটে, কিন্তু পাখা ত নাই। তাই, তোমাকে পত্র লিখিয়া যতটুকু সুখ পাওয়া যায়, তাহা উপভোগ করিবার জন্য, ঘরে খিল দিয়া বসিয়াছি। তুমি কবে কলিকাতায় ফিরিবে, তাহা আমাকে লিখিও। আর এখানে আসিয়াই আমার সহিত দেখা করিতে আসিও। তুমি কেন সর্ব্বদা আমাদের বাটীতে আস না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। কেন, আমি ত কুরূপা নহি, আমার যৌবনও গত হয় নাই। এবার তোমাকে ছাড়িব না। আমার কাছে বসাইয়া তোমার সহিত গল্প করিব। এবার যদি আমার সহিত গল্প না কর, তাহা হইলে আমি কাঁদিব। আমার স্বামীর মুখে শুনিলাম, তুমি খুব ভালরূপে পাশ হইয়াছ; শুনিয়া আমার অতিশয় আহ্লাদ হইল। আমার হাতের লেখা ভাল নয় বলিয়া, তুমি যেন হাসিও না। তুমি যদি শেখাও, আমি বেশ ভাল রকম লেখা শিখিতে পারি। আমি ভাল আছি; কিন্তু তোমাকে দেখিবার জন্য আমার মন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। এস সখা, আসিয়া আমার প্রাণ স্থির কর। ইতি।

চারু।”

কে এ চারু? সুচারু নামে গদাধরের এক সহাধ্যায়ী বালক ছিল; এ কায কি তাহারই? না, তাহা সম্ভব নহে। লেখাটা অল্পশিক্ষিতা কোন বালিকার লেখার ন্যায়; তাহার সহপাঠিগণের মধ্যে কাহারও লেখা এরূপ হইতে পারে না। এ কোন্ বালিকা? কে এ কুৎসিত প্রেম-পত্র তাহাকে লিখিল?

গদাধর ত জানিত না যে, অতুলানন্দ বাবুর পাপীয়সী পত্নীর নাম চারুশশী! জানিলে হয়ত সে বুঝিতে পারিত যে, এ তাহারই কায! কি লজ্জা! এই প্রমত্ত পাপ, কি রূপে, মাতা-পিতার স্নেহাবৃত পবিত্র শান্ত কুটীরের মধ্যে গদাধরকে অনুসরণ করিয়াছে? ধিক্।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

চারুশশীর জাল বোনা।

চারুশশীর মনোবাসনা পূর্ণ না করিয়া গদাধর চলিয়া যাওয়ার পর, অতুলানন্দ বাটী ফিরিয়াছিল। যে চোর পূর্ব্ব রাত্রে চুরি করিবার জন্য সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, আমাদিগের বিশ্বাস, তাহার চকিত অন্তঃকরণও আজ অতুলানন্দের অন্তঃকরণের ন্যায় আশঙ্কিত হয় নাই। অতুলানন্দ চারুশশীকে চিনিত। তাহার দুরন্ত শাসন-ভয়ে সে আজ কম্পিত-কলেবর হইয়াছিল। অতি সন্তর্পণে এবং সভয়চিত্তে সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

কিন্তু সে পত্নীর শ্রীমুখ-বিনির্গত যে ঝটিকার দ্বারা গৃহভিত্তি প্রকম্পিত হইবার আশঙ্কা করিয়াছিল, সে ঝটিকা মোটেই উত্থিত হইল না। পাপীয়সী চারুশশী তখন ভর্ত্তাকে ভর্ৎসনা করা অপেক্ষা গুরুতর পাপে আপনার মনকে নিমজ্জিত রাখিয়া, আপনার শয্যাগৃহ-কোণে নির্ব্বাক্ হইয়া বসিয়া ছিল। পলাতক গদাধরের প্রতি তাহার বিফল প্রয়াস কি সহজ উপায়ে সফল হইবে, এই চিন্তায় তখন তাহার সমস্ত মন আচ্ছন্ন ছিল। এ চিন্তা ত্যাগ করিয়া, স্বামীকে কুকথা প্রয়োগের অবসর ছিল না। কুকথা কহিবারই যখন অবসর ছিল না, তখন সে ভাল কথা কহিবার অবসর কোথায় পাইবে? অতএব সে নির্ব্বাক্ রহিল।

অতুলানন্দ তাহার নিকটে আসিলে, সে কথা না কহিয়া গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। গমনকালে তাহার যৌবনভারাক্রান্ত দোদুল্যমান অঙ্গের বিভ্রম দেখিয়া, অতুলানন্দ ছেলে-ধরা জুজুর মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহিয়া রহিল। এবং আত্মরক্ষার্থ ধূমময় দুর্গ প্রস্তুত করিবার জন্য, ঝিকে ডাকিয়া এক ছিলিম তামাকু দিবার জন্য অনুরোধ করিল। আমি দেখিয়াছি যে শ্রীমতী মনসা দেবী ধূনার ধূমে যেমন জব্দ হইয়া থাকেন, আমাদের গৃহের মানময়ী মাল্‌সামুখী মনসারাও তামাকুর ধূমে তেমনি জব্দ হইয়া থাকেন; কিন্তু চারুশশীর পক্ষে এ ধূমবিদ্যা কার্য্যকরী হয় নাই।

তাহার পরদিনও চারুশশী অতুলানন্দের প্রতি বিমুখ থাকিয়া, সারাদিনটা মৌনাবলম্বী ঋষির ন্যায় অতিবাহিত করিল।

তৎপরদিন মানময়ীর মুখ ফুটিল। স্বামী একখানি নূতন শান্তিপুরে শাড়ী হস্তে লইয়া, পত্নীসম্ভাষণ জন্য তাহার নিকটবর্ত্তী হইলে, সে কহিল, "যাও, আর আদর জানাতে হবে না।"

অতুলানন্দ চারুশশীর চিবুক ধরিয়া কহিল, "কেন আদর জানাব না? তুমি যে আমার সকল আদরের আদরিণী; তুমি যে আমার বোকা মনের জ্ঞানদায়িনী।"

চারুশশী অতুলানন্দের হস্ত তাহার চিবুক হইতে সবলে অপসারিত করিয়া এবং তাহার প্রতি কোপ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "যাও, যাও, আর রসিকতা করতে হবে না,—রসিক পুরুষ আমার!"

অতুলানন্দ চারুশীলার বদন-কমলের নিকট আপনার মুখ

লইয়া, পদ্ম-বদন-চুম্বনপ্রয়াসী মধুমক্ষিকার ন্যায় গুন্ গুন্ স্বরে গাহিল,—

"আমি তোমার রসিক পুরুষ,
করবো তোমার জুতো বুরুষ।"

অতুলানন্দের এই নীরস রসিকতায় চাঁরুশশীর হাড় জ্বলিয়া গেল। তথাপি অতুলানন্দের সহিত কথা কহিবার তাহার প্রয়োজন ছিল। গদাধরের নামটি পর্য্যন্ত সে জানিত না। তাহার পরিচয় জানা এবং তাহাকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করা একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। স্বামীর সহিত কথা না কহিলে ত এসব কিছু হইবে না। তাই সে দুই দিন পরে কথা কহিল। এখন স্বামীর রসিকতায় সে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বলিল, "তোমার এই রসিকতা সে দিন রাত্রে কোথায় ছিল? ভাগ্যিস্ ভাল মানুষের ছেলে এসে আমাকে রক্ষা করলে; তা'না হ'লে, কি হ'ত বল দেখি? তোমার না আছে বুদ্ধি, না আছে আক্কেল।"

অতুলানন্দের সুর তখনও থামে নাই। সে আবার গাহিল,—

"আমি বি-এ ফেল,
নাইক আক্কেল,
(আমি শুধু নই)
আমার চৌদ্দ পুরুষ বেজায় বেঁহুস্
করবো তোমার জুতো বুরুষ॥"

অতুলানন্দের অঙ্গভঙ্গিযুক্ত এই গান শুনিয়া, মানিনীর গুরু মান কিঞ্চিৎ লঘু হইল। বলিল, "ওগো! রক্ষে কর; আর

তোমার গানে কায নেই। তুমি যে বড় সুরসিক, তা' বেশ বোঝা গেল।"

অতুলানন্দ সুযোগ বুঝিয়া কহিল, "দেখ ভাই চারু, এইবার কিন্তু আমাকে ক্ষমা করতে হবে। আমার বড়ই অপরাধ হয়েছে। চোর বেটা বড় বেকুব; সে ত আগে আমাকে কিছু বলে নি। আমি কিছুই জানতাম না। জানলে কি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতাম? হ'লই বা মনিব বাড়ী!"

চারু। তোমার ঐ এক কথা। আমি কি তোমাকে নিমন্ত্রণে যেতে নিষেধ করেছি?

অতুল। না, না। নিমন্ত্রণে যেতে বারণ করবে কেন? আমি সে কথা বলছি নে। তবে কি না, আহারাদির পর শরীরটা বড়ই বেতরিবত হয়ে গেল, তাই আর আসতে পারলাম না। তবু সেই অবস্থাতেও আমি গদাধরকে—

চারু। কি বল্লে? তার নামটি কি?

অতুল। নামটা শুন্‌লে বড় হাসি আসে, নয়? গদাধরচন্দ্র।

চারু। তাহারা বামুন না কি?

অতুল। আরে, বামুন বই কি! তুমি চেহারাটা দেখে বুঝি বাগ্‌দী টাগ্‌দী কিছু ভেবেছিলে?

চারু। হ্যাঁ, চেহারাটা ভাল নয়। কিন্তু দেখ্‌লে মনে হয়, গায়ে খুব জোর আছে।

অতুল। ভয়ঙ্কর জোর। এমন জোর তুমি আর কখন দেখনি। বাবুদের বাড়ীতে রতন সিং বলে একটা পালোয়ান আছে জান?

চারু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই যে তুমি একবার কুস্তি দেখবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিলে? তা' রতন সিংএর কথা তুমি কি বলছিলে?

অতুল। জান্‌লে, সেই রতন সিং, একটি লোহার সিন্দুক সরাতে পারেনি। আর গদাধর অক্লেশে তা সরিয়ে রাখলে। জান্‌লে, গদাধরটি একটি কলিকালের ভীম।

চারু। তারা কি বামুন? চক্রবর্ত্তী, ঘোষাল, মুখুর্য্যে, না কি?

অতুল। গদাধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়!

চারু। ওদের কি এই কলকাতাতেই বাস?

অতুল। না, না, কলকাতাতে বাস হতে যাবে কেন? সেই চেহারা দেখলে কি তাকে সহরের লোক ব'লে বোধ হয়? শুনেছি, তোমাদের গ্রামের নিকটে কোনও পল্লীগ্রামে তার ধাড়ী।

চারু। কোন্ গ্রামে?

অতুল। ওর নিজের নামের চেয়েও, ওর গ্রামের নামটা আরও বদ্।

চারু। তা' বদ্ হোক। কিন্তু গ্রামটার নাম কি?

অতুল। সত্যি বলছি, গ্রামটার নাম আমি একেবারে ভুলে গেছি।

চারু। মনে কর। নন্দীপুর?

অতুল। না, না, নন্দীপুর নয়।

চারু। কল্যাণেশ্বর?

অতুল। না।

চারু। কলসবাটী?

অতুল। না।

চারু। দেবেন্দ্রগ্রাম?

অতুল। না।

চারু। তেপুর?

অতুল। না।

চারু। চৌগ্রাম?

অতুল। না, না, সে নাম ওরকমের কিছু নয়। তার গোড়ায় "রা" আছে। তুমি আগে 'রা' ওয়ালা কথা যতগুলো জান বল দেখি। রাম, রাবণ, রাখাল, রাখালী, রাজা, রাজস্ব, রাজত্ব—এই রকম যত কথা জান বলে যাও দেখি।

চারু। রাগ?

অতুল। না না, আর রাগে কায নেই।

চারু। আমি কি রাগ করছি নাকি? আমি আগে 'রা'-ওয়ালা কথা বলছি। রাক্ষস?

অতুল। না।

চারু। রাজর্ষি? রাগী? রাব্ড়ি?

অতুল। না।

চারু। রাখী? রামী? রাঙ্গা?

অতুল। না না, ও সব কিছু নয়।

চারু। রায়, রাস, রাধা, রাত্রি, রাশি?

অতুল। না, হ'ল না। কিছুতেই সেই কথাটা মনে পড়ল না।

চারু। ছি ছি তুমি বড় ভুলো! তোমার কিছুই মনে থাকে না। একটা গ্রামের নাম, তাও মনে করে' রাখতে পার না?

অতুল। মনে করে রাখবার যে এত দরকার ছিল, তা' আগে বুঝতে পারি নি। এখন গদাধরকে আবার জিজ্ঞাসা করে' ভাল রকম ইয়াদ্দস্ত করে' রাখব।

চারু। কাল যখন বাড়ীতে খেতে আসবে, তখন গ্রামের নামটা নিশ্চয় আমাকে বলা চাই। আর দেখ—

অতুল। আর কি?

চারু। তোমার এই গদাধর, তোমার সাত পাক দেওয়া, বিয়ে করা স্ত্রীকে, আর তোমার চুরি-করা আর রোজগার-করা সমস্ত সম্পত্তি চোরের হাত থেকে উদ্ধার করেছে। আমার মনে হয়, তাহাকে নেমন্তন্ন করে' একবার খাওয়ান আমাদের উচিত। তুমি কি বল?

অতুল। তোমার যা মত, তাতে কি আমার অন্য মত আছে? আমি কালই তাকে নেমন্তন্ন করব।

চারু। আর দেখ—

অতুল। কি?

চারু। সেই বিপদের সময় আমি ওর সঙ্গে কথা কয়ে ফেলেছি; আমার জ্ঞান ছিল না। তুমি রাগ করবে না?

অতুল। গদাধরের সঙ্গে আমি একত্রে কায করি। সে আমার ছোট ভায়ের মত। বড় ভাল ছেলে। তার সঙ্গে

তুমি কথা কইবে, এতে আমার রাগ হবে কেন? তুমি বরাবর তাহার সঙ্গে কথা কোয়ো।

গদাধরকে ধরিবার জন্য চারুশশী যে জাল বোনার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল, সে কার্য্য বহুদূর অগ্রসর হইল। কাল রাত্রে গদাধর তাহাদের বাটীতে আহার করিতে আসিবে। সে কি রাঁধিবে, কোন্ বসনখানি কিরূপে পরিধান করিয়া, কি কথা কহিয়া, তাহাকে পরিবেষণ করিবে, এই চিন্তায় সে সমস্ত রাত্রি ভালরূপ নিদ্রা যাইতে পারিল না। হায়! সে ত জানিত না যে নরকাগ্নি সে হৃদয়মধ্যে জ্বালিয়াছিল, গদাধর দূর হইতে তাহার তাপ অনুভব করিয়া, তাহার দাহ হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য, আরও দূরে আপনাকে সরাইয়া রাখিয়াছিল।

পরদিন মধ্যাহ্নে আহার সময়ে বাটী ফিরিয়া যখন অতুলানন্দ তাহাকে বলিল যে, গদাধরের পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী বলিয়া সে আহার করিতে আসিতে পারিবে না, তখন চারু গর্জ্জিয়া উঠিল। হৃদয়ের সমস্ত আক্রোশ উদ্গার করিয়া, লোচন মধ্যে অগ্নিজ্বালা পূরিয়া কহিল, "তুমি একটি ঢেঁকি, তোমার দ্বারা কোন কায হবার নয়। একটা লোককে নিমন্ত্রণ করে' নিয়ে আসবার ক্ষমতাও তোমার নেই। যাও তুমি আর মুখ নেড়ে কথা কোয়ো না।"

উপরি-উক্ত ঘটনার পর চারুশশী একপক্ষ কাল ভর্ত্তার সহিত বাক্যালাপ করা আবশ্যক বিবেচনা করে নাই।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

গদাধরের নিমন্ত্রণ।

পনের দিন বাদে মানভঞ্জন পালায় স্বামীর নিকট পরাজিত হইয়া চারুশশী যখন তাহার সহিত পুনরায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল, তখন জানিতে পারিল যে গদাধর, তাহার বাক্যশূন্য পক্ষকাল মধ্যে, পড়া মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিয়া, মনানন্দে আপনার পল্লীগ্রামে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু গদাধরের আশা ত্যাগ করা চারুশশীর পক্ষে অসম্ভব। সে তাহাকে আপনার হৃদয়ে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল—গদাধর যত দূরে যাইতেছিল, চারুশশীর হৃদয়ের বাঁধনে ততই জোরে টান পড়িতেছিল। টান যত জোরে পড়িতে-ছিল, তাহার হৃদয়ের ব্যথা ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল। এই ব্যথিত হৃদয় লইয়া সে কিরূপে প্রাণধারণ করিবে? কয়েক দিন চিন্তার পর সে স্থির করিল যে, গদাধরকে সে একখানা পত্র লিখিবে।

এইরূপ স্থির করিয়া সে যে পত্রখানা লিখিয়াছিল, তাহা তোমরা দেখিয়াছ। কিন্তু সেই পত্রখানা তাহার বহু পরিশ্রমের ফল। প্রথম দিন যখন পত্র লিখিতে বসিল, তখন "প্রাণেশ্বর" বলিয়া পত্রের প্রথম ছত্রটা আরম্ভ করিবামাত্র, তাহার মনে হইল যেন ঘরের বাহিরে কাহার পদশব্দ হইল। সে তাড়াতাড়ি কাগজ-

খানা ছিঁড়িয়া, লেখন সামগ্রী সকল লুক্কায়িত করিয়া, প্রকম্পিত হৃদয়ে বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, কেহ কোথাও নাই। তবে সে জুতার শব্দ কোথা হইতে আসিল? সে জুতার শব্দ তাহার স্বামীর জুতার শব্দের ন্যায়। সে নিম্নতলে নামিয়া, ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল। ঝি কহিল, "কৈ না, বাবু ত বাড়ী আসেন নি।" চারু-শশী বুঝিতে পারে নাই যে, যে শব্দ তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহা সনাতন। তাহা চিরদিন মানুষের কাণের কাছে ধ্বনিত হইতেছে। সে বুঝিতে পারে নাই যে, ভগবানের নিষেধ আজ্ঞা, পাপের দ্বারে, তাহার স্বামীর জুতার শব্দে মুখরিত হইয়া উঠিয়া-ছিল। সে দিন সে আর পত্র লিখিতে পারিল না।

দুই দিন পরে সে আপন শয়নগৃহের দ্বার আবার অর্গলবদ্ধ করিল। লেখন-সামগ্রী সকল সংগ্রহ করিল। কিন্তু সেদিনও লেখা হইল না। প্রাণধিক, প্রাণেশ্বর, প্রাণনাথ, প্রাণসখা,—ইত্যাদি "প"এ-র-ফলা প্রমুখ শব্দের মধ্যে কোন্ শব্দটা গদাধরের প্রতি অধিক প্রযোজ্য, তাহা স্থির করিতে অত্যন্ত দীর্ঘকাল অতি-বাহিত হইয়া গেল। গৃহদ্বারে ঝি আসিয়া কহিল, "মা, বাবু এসেছেন, জলখাবার দাও।" শুনিয়া, হৃদয়ের অযথা ঘাত-প্রতিঘাতে চারুশশীর সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। কাগজপত্র, কালী-কলম অতি সত্বর পেটকবদ্ধ করিয়া এবং আপনার সমস্ত পাপ হৃদয়মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া, সে স্বামী-সম্ভাষণ জন্য অর্গল খুলিয়া বাহিরে আসিল।

সপ্তাহ পরে, সে পুনরায় গদাধরকে পত্র লিখিবার জন্য যত্নবতী

হইল। কিন্তু এক্ষণে তাহার সহসা স্মরণ হইল যে, তাহাকে পত্র লিখিতে হইলে অগ্রে তাহার ঠিকানা জানা আবশ্যক। গদাধরের বাটী কোন্ গ্রামে তাহা জানিয়া লইবার জন্য সে বহুদিন পূর্ব্বে তাহার স্বামীকে অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার নির্ব্বোধ এবং এবং নিতান্ত স্মরণশক্তিবিহীন স্বামীটি এতকাল তাহাকে সে সংবাদ দেয় নাই। সেও নির্ব্বোধের মত ক্রোধের বশীভূত হইয়া, পক্ষকাল স্বামীর সহিত ব্যাকালাপ বন্ধ করিয়া, গদাধর সম্বন্ধে নানা সংবাদ যথাসময়ে শুনিবার সুযোগ হারাইয়াছে। সে এরূপ ক্রোধ আর কখন করিবে না। সরস কথায়, মিঠা চাহনিতে স্বামীকে ভুলাইয়া, মার্জ্জারের ন্যায় থাবার মধ্যে মধ্যে তীক্ষ্ণধার নখ লুক্কায়িত রাখিয়া, নরম "তুলা" বাড়াইয়া, গদাধর সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য নিষ্কাসিত করিবে।

অতঃপর অতুলানন্দ কয়েক দিন দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যমান ছিলেন। এত সোহাগ তিনি জীবনে কখনও ভোগ করেন নাই। এই সময় অতুলানন্দ বাবু বহুযত্নে গদাধরের এক সতীর্থের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হইলেন যে, গদাধর যে গ্রামে বাস করে তাহার নাম নাড়িচা, এবং ঐ নাড়িচা গ্রাম, নান্দিপুর নামক গ্রামের পোষ্ট আপিসের অধীনে এবং উহা হুগ্‌লি জেলার অন্তর্গত।

ঐ সংবাদ চারুশশী শীঘ্র স্বামীর নিকট হইতে অবগত হইতে পারিল বটে, কিন্তু সে পত্র লিখিবার সুযোগ শীঘ্র লাভ করিতে পারিল না। যে সোহাগের গাঢ় রসে সে স্বামীকে ভিজাইয়া ছিল,

তাহাতে তিনি মধুলিপ্ত মধুমক্ষিকার ন্যায় বিজড়িত হইয়া অনেক দিন চারুশশীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিলেন। অতএব চারুশশী পত্র লিখিবার জন্য নির্জ্জন অবসর সহসা লাভ করিতে পারিল না।

অবশেষ, গদাধরের স্বদেশযাত্রার এক মাসেরও অধিক সময় পরে সে পত্র লিখিতে সমর্থ হইল।

পত্র লিখিয়া, উত্তরলাভের প্রত্যাশায় সে পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল। সূর্য্য-উপাসকগণ, উষাস্নান সমাপনান্তে, প্রভাতে অরু-ণের রক্তমূর্ত্তি দেখিবার জন্য যেমন অগ্রসহকারে আকাশের পূর্ব্ব দিকে চাহিয়া থাকে, চারুশশীও ডাকপিয়নের রক্তবর্ণ পাগ্‌ড়িটি অবলোকন করিবার জন্য, তেমনই পথপ্রান্তে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাহিয়া থাকিত। পথপ্রান্তে প্রত্যহ যথাসময়ে সে রক্ত পাগ্‌ড়িটি উদিত হইত বটে, কিন্তু সে চারুশশীকে তাহার ঈপ্সিত রত্ন আনিয়া দিত না। প্রত্যহ সে ঝিকে জিজ্ঞাসা করিত, "ঝি, আমার নামে কোন চিঠি আছে কি না, হরকরাকে জিজ্ঞাসা করে আয় ত।" ঝি প্রত্যহ ফিরিয়া আসিয়া বলিত, "না, তোমার নামে কোন চিঠি আসে নি।"

এইরূপে কত দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। তথাপি গদাধরের নিকট হইতে সে সেই আকাঙ্ক্ষিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইতে পারিল না। অবশেষে একদিন স্বামীর মুখে শুনিল যে, গদাধর বাটী হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছে। শুনিয়া, উৎফুল্লমুখী, স্বামীকে আদর করিয়া কহিল, "এইবার তাকে একবার নিমন্ত্রণ করে আন।"

তাহার পর দিনই অতুলানন্দ গদাধরকে আহ্বান করিয়া

কহিল "এইবার ভাই তোমাকে আর ছাড়ব না; বল, কবে আমাদের বাড়ীতে খাবে।"

গদাধর। আপনি যে দিন হুকুম করবেন, সেই দিনই আপনার বাড়ীতে গিয়ে অন্নধ্বংস করে আসব।

অতুল। তা হলে পর্শু রবিবার আছে, পর্শুই খাবে।

গদাধর। পর্শু? এত তাড়াতাড়ি কেন? এখনও গঙ্গার ইলিশমাছ ওঠে নি। ইলিশ মাছ উঠুক, তখন একদিন খেলেই হবে।

অতুলানন্দ। না না ভাই, অত দেরী করলে হবে না। আমার স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা যে, তুমি একদিন আমাদের বাড়ীতে খাও।

গদাধর। বেশ ত। কবে যাব, তা আমি আপনাকে পরে বলব। আপনার বাড়ীতে খেতে হলে দেহটি ভাল থাকা চাই ত! বাড়ী থেকে এসে আপনাদের কলকাতার লোনা জলে আমার শরীরটা খারাপ হয়েছে। একটু সারলেই খেতে যাব।

গদাধরকে নিমন্ত্রণ করিতে না পারায় সে দিন সে স্ত্রীর নিকট যেরূপ লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তাহা অতুলানন্দের মনে পড়িল। ভাবিল, যে কোনও উপায়েই হউক, তাহাকে তাহাদের বাটীতে আহারে প্রবৃত্ত করিতেই হইবে। বলিল, "ভাই, আগামী রবিবারে তোমায় খেতেই হবে; না হয় হাল্‌কা রকম মাগুর মাছের ঝোল টোল রান্না করা যাবে।"

এ নিমন্ত্রণ গদাধর কি কৌশলে প্রত্যাখ্যান করিবে? যে সন্দেহ তাহার মনের মধ্যে উদিত হইয়াছিল, তাহা সত্য না হইলেও হইতে পারে; তাহা সত্য হইলেও, অতুলানন্দের নিকট তাহা কহিবার নহে। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, কি ভাবিয়া গদাধর কহিল, "যাব, রবিবারেই আপনাদের বাড়ীতে খাব; কিন্তু শুধু মাগুর মাছের ঝোল খাব না।"

বিংশ পরিচ্ছেদ

চারুশশীর বকোয়ালীবিদ্যা।

চারুশশী মনে করিয়াছিল যে, শনিবারের রাত্রি আর অবসান হইবে না; তথাপি তাহা অবসিত হইয়াছিল। এবং সেই বরষার দিনেও অরুণালোকিত সুন্দর প্রভাত অতুলানন্দ বাবুর গৃহপ্রাঙ্গনে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। সে দিন অপর লোকের বাটীতেও প্রভাত উদিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা তাহাতে চারুশশীর ন্যায় শোভা বা সৌন্দর্য্য কিছুই দেখে নাই। তাহাদের দুরদৃষ্ট!

বহুবিধ রন্ধনসামগ্রী পূর্ব্বরাত্রে সংগৃহীত হইয়াছিল। প্রভাতে উঠিয়া চারুশশী পরম উৎসাহে রন্ধন আরম্ভ করিয়া দিল।

কোন সময়ে অতুলানন্দ এক মুসলমান জমীদারের বাটীতে কিছু দিনের জন্য কারকুনের পদে নিযুক্ত ছিলেন। সেই সময়ে, কখন কখনও জমীদার সাহেবের এক বাঁদী অতুলানন্দের বাটীতে আসিয়া, প্রাঙ্গনে, দুই আঁটি বিচালীর উপর বসিত। চারুশশী তফাতে দাঁড়াইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "আজ তোমাদের কি রান্না হয়েছিল গো?" সে পোলাও, কোপ্তা, কোর্ম্মা ইত্যাদি নবাবী রান্নার গল্প করিত। শুনিয়া চারুশশীর ইচ্ছা হইল যে, সে এই নবাবী রান্নাগুলা বাঁদীর নিকট হইতে শিখিয়া লইবে। এখন কথাটা

এই যে, বাঁদি যে সকল রন্ধনের গল্প করিত, তাহার অনেক গুলির আস্বাদই সে জীবনে কখন উপভোগ করিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই; এবং তাহার একটি দ্রব্যও রন্ধন করিবার কৌশল সে অবগত ছিল না। তথাপি সে স্ত্রীলোক হইয়া কিরূপে বলিবে যে, রন্ধনকার্য্যে সে অসমর্থা? অতএব যখন চারুশশী বাদশাহী পাকপ্রণালী শিক্ষার্থিনী হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল, সে তখন সেই দুই আঁটি বিচালির আসনে বসিয়া থাকিয়া, চারুশশীকে বকোওয়ালী বিদ্যায় দীক্ষিতা করিল। এইরূপে নবাবী রান্নায় জ্ঞানলাভ করিয়া, চারুশশী পল্লান্ন সংযুক্ত ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া ভর্ত্তাকে খাইতে দিল। খাইয়া, অতুলানন্দ কহিল, "বাঃ।" তাহার পর অতুলানন্দের দুই জন বন্ধু আসিয়া সেই প্রকার ব্যঞ্জন খাইয়া কহিল "বাঃ।" ইহার পর চারুশশী বুঝিল যে, এই মর্ত্তধামে পাককার্য্যে সে অদ্বিতীয়া।

আজ সে তাহার সেই বকোওয়ালী বিদ্যা সযত্নে জাহির করিল। চিংড়িমাছের বড়া ভাজায় কিঞ্চিৎ পেঁয়াজ সংযুক্ত করিয়া নবাবী কোপ্তা প্রস্তুত করিল। রশুন ফোড়ন দিয়া মাংসের ডাল্‌না রাঁধিয়া, কোর্ম্মা প্রস্তুত করিল। মাছের কালিয়াতে অখণ্ড পাটনাই পেঁয়াজ দিয়া, দোপেঁয়াজা পাক করিল। মৎস্যের ঝালে কিছু দুগ্ধ ও ভর্জ্জিত পলাণ্ডু নিক্ষেপ করিয়া দমপোক্তা প্রস্তুত করিল। এইরূপে পেঁয়াজ রশুনের সৌরভে রন্ধনশালা আমোদিত হইয়া উঠিল। এবং চারুশশী একান্তমনে আশা করিল যে, এই নবাবী রন্ধন আহার করিয়া গদাধর তাহার চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইবে।

রন্ধনাদি সমাধান্তে, বেশ পরিবর্ত্তন জন্য চারুশশী দ্বিতলে আরোহণ করিল। তথায় এক প্রকার প্রলেপের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ উত্তম রূপে মার্জ্জিত করিয়া, সুগন্ধি সাবানের দ্বারা তাহা সযত্নে বিধৌত করিল। তাহার পর কেশ সংস্কার করিয়া, একখানি কুঞ্চিতপ্রান্ত শাটী পরিয়া, এবং কিছু কিছু অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, সে নিম্নতলে নামিয়া আসিল। তখন বেলা এগারটা। কিন্তু তখনও সাত রাজার ধন এক মাণিক স্বরূপ অতিথিটি সঙ্গে লইয়া, অতুলানন্দ গৃহে সমাগত হন নাই। চারুশশী পরিষ্কৃত স্থানে আসন বিস্তৃত করিবার জন্য ঝিকে আজ্ঞা দিয়া, নিজে আহারীয় দ্রব্য সজ্জিত করিবার জন্য রন্ধনশালায় গেল।

অল্পকাল মধ্যে অতুলানন্দ বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া কহিল, "ওগো, গদাধর এসেছে, আমাদের খেতে দাও।"

চারুশশীর প্রত্যেক অঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে সে আপন উদ্বেগ দমন করিয়া কহিল, "বাইরে কেন? ঠাকুর-পোকে ভিতরে ডেকে নিয়ে এস; আমি ত তার সঙ্গে কথা কয়ে থাকি।"

কতদিন পরে, গদাধর আসিয়া চারুশশীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। অমানুষিক বলের আধার সেই দীর্ঘ বিশাল কৃষ্ণ দেহ, চারুশশীর চক্ষে বিদ্যুদ্‌গর্ভ বৈশাখী মেঘের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। কে জানে এ কালো মেঘ, এ প্রেমচাতকিনীকে কি আনিয়া দিবে? তাহার উল্লাস-স্ফীত উন্নত উরস কি এ মেঘের কঠিন-জ্বালাময় কুলিশ প্রহারে ভগ্ন হইয়া যাইবে? চাতকিনীর হৃদয়ের সমস্ত আশা

কি একটা প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া উড়িয়া যাইবে? অথবা তাহার প্রেমতপ্ত যৌবনদীপ্ত পরিমার্জ্জিত দেহতরু প্রেমের শীতল রজতধারায় স্নাত হইয়া শীতলতা প্রাপ্ত হইবে? মেঘ বজ্র হানে, প্রচণ্ড ঝড় আনে, কখন আবার শীতল বারি দানে পৃথিবীকে শীতল করিয়া দেয়। গদাধর-মেঘ চারুশশী-চাতকিনীকে কি দিবে? বজ্র, বাত্যা, না স্নিগ্ধ বারিধারা? চারুশশীর হৃৎপিণ্ড, ক্লক ঘড়ির পেণ্ডুলামের ন্যায়, আশা ও নিরাশার মধ্যে সশব্দে দুলিতে লাগিল।

গদাধরকে দেখিয়া, হাতের চুড়ি বাজাইয়া, চারুশশী বক্ষের বস্ত্র সযত্নে বক্ষের উপর বিন্যস্ত করিল, এবং অপাঙ্গভঙ্গিমায় আপন লাবণ্য-সরস বরদেহ বিলোকন করিয়া কহিল, "ঠাকুরপো! তুমি দেশ থেকে কবে এলে?"

গদাধর। প্রায় পনের দিন হল।

চারু। এতদিন এসেছ, একবার কি আমাদের বাড়ীতে আসতে নেই? তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি যে, তুমি একবারও আমাকে দেখতে এলে না?

গদাধর। কৈ, আপনি ত আমাকে ডেকে পাঠান নি। এই দেখুন, আপনি ডেকেছেন, আর আমি এসেছি। আজ আমার জন্যে আপনি কি রেঁধেছেন বলুন দেখি।

চারু। কত ভাল ভাল সামগ্রী রেঁধেছি; যখন খাবে তখন বুঝতে পারবে। এমন রান্না তুমি কখনও আগে খাওনি।

গদাধর। যা কখন খাই নি, তা হঠাৎ খেতে কি ভাল লাগবে? আচ্ছা, দিন খেয়ে দেখি। অতুল বাবু কোথায় গেলেন?

চারু। ও বুঝি উপরে কাপড় ছাড়তে গেছে। এখনি আসবে। চল, তোমাদের খাবার দিয়ে আসি।

গদাধর ও অতুলানন্দ আহারে বসিল। চারুশশী আপন ললিত বাহুযুগলে লাবণ্যের তরঙ্গ তুলিয়া, নয়নকোণে মধুর কটাক্ষ পূরিয়া, সরস অধরে সুধা মাখিয়া, পলাণ্ডু-সুবাসিত আহারীয় সামগ্রীসকল পরিবেষণ করিল। অসুরদিগকে ছলনা করিবার জন্য ভগবান্ বিষ্ণু যে অপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেবতা-দিগকে সুধা বিভাগ করিয়াছিলেন, সে অপূর্ব্বমোহিনী মূর্ত্তি অপেক্ষা অপূর্ব্ব-মূর্ত্তিতে চারুশশী গদাধর-দেবতা ও অতুলানন্দ-অসুরকে সুধাসম নবাবী আহার বিতরণ করিল।

আহার করিতে করিতে গদাধর কহিল, "অতুল বাবু, আপনার এ কচুরীগুলি বড় চমৎকার হয়েছে; আমাকে আরও খান কতক দেবার জন্যে বলুন।"

কচুরী সম্বন্ধে এ সুখ্যাতিটা চারুশশীকে স্পর্শ করিল না। কচুরীগুলা, বাড়ীর বুড়া চাকর বৌবাজারের গণেশ হালুই-এর দোকান হইতে লইয়া আসিয়াছিল। চারুশশী কয়েকখানা কচুরী আনিয়া, গদাধরের পাতে দিয়া কহিল, "ঠাকুরপো! এই কচুরী, দোপেঁয়াজার ঝোলে ভিজিয়ে খাও দেখি, বড় ভাল লাগবে।

গদাধর। থাক্ থাক্। শুধু কচুরীই আমার বেশ লাগচে। আপনি অতি চমৎকার কচুরী ভেজেছেন।

অতুল। ওহে ভাই! একখানা কচুরী দোঁপেয়াজার একটা নরম পেঁয়াজ দিয়ে খাও, মজা পাবে।

গদাধর। পেঁয়াজ খাওয়া এখনও আমার অভ্যাস হয় নি।

অতুল। বল কি ? তুমি পেঁয়াজ খাও না ?

চারুশশী। আমার সমস্ত তরকারী যে পেঁয়াজ দিয়ে রান্না ; তা হলে ঠাকুরপো কি খাবে ?

গদাধর। আমার জন্যে আপনি ব্যস্ত হবেন না ; কচুরী খাব, পরমান্ন খাব, দই খাব, মিষ্টান্ন খাব, তাতেই আমার যথেষ্ট হবে। আগে অতুল বাবুকে আমার বলা উচিত ছিল যে, আমি পেঁয়াজ খাই না। আমারই দোষে আপনারা বিব্রত হলেন। কিন্তু আমি সত্যি বলছি, আমার কিছুমাত্র কষ্ট হবে না।

গদাধর ব্যঞ্জন খাইল না বলিয়া কি চারুশশীর কষ্ট হইয়াছিল ? না, তাহা হয় নাই। সে ত আহার করিবার জন্য গদাধরকে আহ্বান করে নাই। আহারে তাহাকে নিমন্ত্রণ করা ছলমাত্র। এই ছলে তাহাকে গৃহে আনিয়া, সে ইচ্ছা করিয়াছিল যে, সুযোগ-মত তাহার কদর্য্য বাসনা পূর্ণ করিবে। গদাধরকে সু-আহারে বশীভূত করিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা যখন ঘটিল না, তখন চারুশশী অন্য উপায় অবলম্বন করিবে। নূতন ফাঁদ পাতিয়া, তাহার প্রাণ-পক্ষীকে ধরিয়া হৃদয়-পিঞ্জরে পূরিবে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

চারুশশীর মনস্তাপ।

আহারাদির পর, গদাধরকে তাহার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, অতুলানন্দ বিশ্রাম লাভ জন্য দ্বিতলে আপন শয্যা-গৃহে যাইয়া শয়ন করিল। গদাধর বহির্ব্বাটীর কুঠারিতে যাইয়া বসিল।

চারুশশী,—আমাদের বলিতে লজ্জা হয়,—গদাধরের এবং স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট সামগ্রী একত্র করিয়া খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে, সে ঝিকে ডাকিয়া বুড়া চাকরের অনুসন্ধান করিল।

ঝি কহিল, "সে গঙ্গাস্নানে গিয়েছে।"

চারুশশী কহিল, "ও মা! আমাকে বোলে গেল না? ঘরে যে এক চটাক গঙ্গাজল নেই; এক কলসী গঙ্গাজল আনতে দিতাম। তুই সকাল বেলা থেকে খেটে মরছিস্; তোকে আর কোন লজ্জায় গঙ্গাজল আনতে পাঠাই; কিন্তু গঙ্গাজল না হলেও নয়; একটুও নেই; ঘরে একটু গঙ্গাজল না থাকলে বাছা, আচার-বিচার হয় না।"

ব্রাহ্মণের কন্যা, পলাণ্ডু ভক্ষণ করিতে করিতে যে আচার-বিচারের কথা কহিল, ঝি তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিল কিনা, তাহার সংবাদ আমরা রাখি না। কিন্তু সে

পিতলের কলসীটী কাঁখে লইয়া, গামছাটি স্কন্ধে ঝুলাইয়া বলিল, "তা হলে আমি জল আনতে চল্লাম, তুমি এসে সদর দরজা বন্ধ কর।"

চারুশশীর আহার সমাপ্ত হইয়াছিল। সে ঝির পশ্চাৎ যাইয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া আসিল। তাহার পর উপরে উঠিয়া দেখিল যে, তাহার স্বামী নিদ্রাভিভূত হইয়া রাগরাগিণীসংবলিত নাসিকা-ধ্বনি করিতেছে। সে কম্পিতহস্তে বাহির হইতে স্বামীর কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিল। এ কম্পন কেন? যদি সুযোগ ঘটিয়াছে, তবে তাহা কি চারুশশী হারাইবে? কিসের ভয়? কেহ ত দেখিবে না। বাটীতে কেহ নাই। স্বামীও কক্ষমধ্যে রুদ্ধ হইয়া মৃতবৎ নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছে। তবে কাহাকে ভয়? তবে এ কম্পন কেন? স্বামীর কক্ষ-দ্বার বন্ধ করিতে তাহার বাহুদ্বয় কেন প্রকম্পিত হইয়া উঠিল? সোপানসকল অধিরোহণ-কালে তাহার কম্পিত উরুদ্বয় কেন গুরুভারে বিজড়িত হইয়া পড়িল? বহু কষ্টে নিম্নে নামিয়া সে ঊর্দ্ধে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। মধ্যাহ্নে সূর্য্যসংবলিত নীল আকাশ যেন জ্বলন্ত পিঙ্গল-তারাসংবলিত এক বিরাট নির্ণিমেষ লোচনের ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কি ভয়ঙ্কর! তাহার পদনখরপ্রান্ত হইতে কেশাগ্রভাগ পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া উঠিল। দেহমধ্যস্থ শিরা-সকলে শোণিত-স্রোত বন্ধ হইয়া গেল।

তথাপি পাপীয়সী কাঁপিতে কাঁপিতে বহির্ব্বাটীর কক্ষদ্বারে গদাধরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লজ্জাহীনা যুবতী, যৌবনের

যাবতীয় প্রলোভন দেহতটে প্রকটিত করিয়া, প্রমত্ত মনের সমস্ত আকর্ষণ ফণিনীর ফণার ন্যায় বিস্তার করিয়া, অপরিণতচিত্ত যুবক গদাধরের লোচনাগ্রভাগে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

গদাধর প্রমত্তার যৌবনদীপ্ত প্রকম্পিত অবয়ব অবলোকন করিল। বিলাস-লালসাময় ক্ষুদ্র ললাটে স্বেদবিজড়িত চূর্ণকুন্তলের বিন্যাস দেখিল। স্মর-শরাসন তুল্য ভ্রুযুগে শ্লক্ষ্ণ বিভ্রম বিলোকন করিল। তাহার বিহ্বল বিকচ কটাক্ষের সুতীব্র তীব্রতা অনুভব করিল। তাহার রুচির কপোলে যৌবনের উল্লাস-রাগ অবলোকন করিল। সে বিকশিত রক্তাধরে সরস চুম্বন-লালসা পরিস্ফুট দেখিল। দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য গদাধর আত্মহারা হইয়া গেল। একবার তাহার মনে হইল যে, চারুশশীর সুগোল বাহু দু'টিতে লাবণ্যের যে তরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহাতে ঝম্প প্রদান করিয়া কৃতার্থ হয়। কিন্তু যে সতর্ক প্রহরী চিরদিন দিবারাত্র অনিদ্র থাকিয়া আমাদিগের হৃদয়মধ্যে রক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তিনি যথাসময়ে আত্মহারা গদাধরকে সুপথ দেখাইয়া দিলেন। আপনার ক্ষণিক চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্য লজ্জিত হইয়া গদাধর আপনাকে সত্বর সংযত করিল। হৃদয়কে সম্যক্ শাসিত করিয়া সে চারুশশীর সহিত কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "অতুল বাবু কোথায় ?"

চারুশশী। সে উপরে আছে ;—ঘুমুচ্চে।

গদাধর। তাঁকে ডেকে দিন, আমার যাবার সময় হল।

চারুশশী। এখনই কেন যাবে ? একটু থাকলে কি তোমার ক্ষতি হবে ?

গদাধর। এখানে যদি কিছু আবশ্যক থাকত, তা হলে থাকতাম। অকারণ কেন চুপ করে বসে থাকব? তার চেয়ে বাড়ী গিয়ে পড়াশুনো করলে ভাল হয়।

চারুশশী। পড়াশুনো ত চিরদিন করছ, একদিন তা বন্ধ রাখলে ক্ষতি কি? আর, এখানে তুমি চুপ করে বসে থাকবে কেন? কথা কইতে জানলে কি চুপ করে' থাকতে হয়? আমি এই তোমার কাছে বসছি; তুমি বসে বসে আমার সঙ্গে গল্প কর।

গদাধর। না না, আমি যাই।

চারুশশী। তোমাকে যদি ধরে' রাখি, যদি যেতে না দিই, তা হলে তুমি কি করবে? আমার কথা শোন, যেও না। একটু বস। একটু গল্প কর। তোমার কথা শুনতে আমি ভালবাসি; বসে' একটু কথা কও। তাতে তোমার বা তোমার পড়াশুনোর কিছুই অনিষ্ট হবে না। তবু উঠ্‌ছ? ছি! ছি! তুমি কি নিষ্ঠুর! তোমার মনে একটুও দয়া নেই।

গদাধর। কেন আপনি আমাকে এরকম কথা বল্‌ছেন?

চারুশশী। কেন বল্‌ছি তা কি তুমি জান না? কেন? তোমাকে ত আমি চিঠি লিখেছিলাম। চিঠিতে ত আমি সকল কথা জানিয়েছিলাম।

গদাধর। চিঠি? আপনি কি আমাকে চিঠি লিখেছিলেন?

চারুশশী। সে চিঠির তুমি উত্তর দাও নি কেন? আমি স্ত্রীলোক হয়ে লজ্জাত্যাগ করে', তোমাকে চিঠি লিখলাম; আর, তুমি পাষাণ, তার উত্তর দিলে না?

গদাধর। লজ্জা আপনার উৎকৃষ্ট ভূষণ, এ উৎকৃষ্ট ভূষণ কেন আপনি ত্যাগ করেছিলেন? আপনার নাম কি চারু?

চারুশশী। হ্যাঁ, আমার নাম চারুশশী। আগে কি তুমি আমার নাম জানতে না?

গদাধর। না, আমি আপনার নাম আগে কখনও শুনি নি। আমি আগে বুঝতে পারি নি যে, সে চিঠিখানা আপনি লিখেছিলেন।

চারুশশী। বুঝতে পারলে কি সে চিঠির উত্তর দিতে?

গদাধর। না, আমি কখনই সে চিঠির উত্তর দিতাম না। কেন আপনি সে রকম চিঠি লিখেছিলেন?

চারুশশী। কেন লিখেছিলাম? শুনবে, কেন লিখেছিলাম? তোমাকে ভালবাসি বলে' লিখেছিলাম। তোমাকে দেখবার জন্যে মন ভারি কাতর হয়েছিল বলে লিখেছিলাম। না লিখে থাকতে পারিনি, তাই লিখেছিলাম।

গদাধর। ছি ছি!

চারুশশী। হায় হায়! কেন তুমি আমাকে উপেক্ষা করছ? এ দেহমধ্যে যে মধু সঞ্চিত করে' রেখেছি, তা পান করে নাও। এই যে যৌবন তোমার পায়ের তলায় ডালি দিতে এসেছি, তা পরম যত্নের সামগ্রী, তা ফেলে দিও না। কেন? আমার কি রূপ নেই? এ রূপের কি মাধুরী নেই? কেন তুমি আমাকে নেবে না? এত সাধনাতেও কেন তোমার মনে দয়া হবে না?

গদাধর। ছি ছি! এ ত ভালবাসা নয়। আপনি যদি আমাকে ভালবাসতেন, তা হলে কি আমাকে এই ঘৃণ্য নরকের পথ দেখিয়ে দিতেন? ভঙ্গুর জড়দেহের রূপ, অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ; আমাকে ভালবেসে এর চেয়ে কোনও ভাল জিনিষ আমাকে দেবার সামর্থ্য কি আপনার নেই?

চারুশশী। কি চাই বল? আমার যা আছে, সব দেব। তুমি কেবলমাত্র একবার আমার দিকে মুখ তুলে চাও; কেবলমাত্র একবার আমাকে তোমার বুকে স্থান দিয়ে বল যে আমাকে তুমি ভালবাস।

গদাধর। আপনি ও সব কথা আর বলবেন না। যা অকথ্য, তাহা বলে' আপনার মুখ কলঙ্কিত করবেন না। ভগবানের আশীর্ব্বাদে যে বাক্‌শক্তি আমরা পেয়েছি, তাঁরই আশীর্ব্বাদে তা যেন চিরদিন পবিত্র থাকে। যে মুখ ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করে, সেই মুখ কি রকম করে' হৃদয়ের কলঙ্কিত বাসনা ব্যক্ত করে, তা কি রকম করে' পাপ উদ্গীরণ করে?

চারুশশী। ঠাকুরপো! তুমি আমাকে কলঙ্কের ভয় দেখিও না। তোমার জন্যে আমি কলঙ্কের ডালি মাথায় করব। পৃথিবীর লোক আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে, "দেখ, এই কলঙ্কিনী কুলত্যাগ করেছে।" আমি দুই হাতে তোমার গলা জড়িয়ে ধরে' বলব, "দেখ, কলঙ্কিনী আমি কুলত্যাগ করে কি রত্ন লাভ করেছি।" আমি সত্যি বলছি, তোমার জন্যে আমি সহস্রবার কলঙ্কের সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত আছি। আমি

তোমার পায়ে ধরে' মিনতি করছি, তুমি একবার আমাকে বুকে নাও। একবার আমার কাণে মুখ রেখে বল যে তুমি আমাকে ভালবাস।

গদাধর। আপনার কি নরকেও ভয় নেই?

চারুশশী। নরক? তুমি নরকের কথা বলছ? জানি না, নরকে কি এমন যন্ত্রণা আছে, যা তোমার বক্ষঃস্পর্শে উপশম হবার নয়। নরক? তুমি নরকের কথা বলছ? তুমি একদিন আমাকে গ্রহণ কর, তার পর, আমি চিরদিন অম্লান বদনে তোমার নরকের সমস্ত জ্বালা সহ্য করব।

গদাধর! আমি যাই।

চারুশশী। কোথায় যাবে? আমি যেতে দেব না। এই আমি তোমার পথ আগ্‌লে দাঁড়ালাম। কি করে' যাবে?

গদাধর। না না, আপনি পথ ছেড়ে দিন। আপনি জানেন না যে, কি ভয়ানক অধর্ম্মাচরণে আপনি প্রবৃত্ত হয়েছেন। একদিন এর জন্যে আপনার অনুতাপ আসবে। আমি মিনতি করছি, আপনি আপনার মনকে সংযত করুন। যে স্বামী আপনার প্রতি অনুরক্ত, যিনি সুরূপ, তাঁর প্রতি ভক্তিমতী হোন। তাতে আপনার মঙ্গল হবে।

চারুশশী। আমি মঙ্গল চাই না—তোমাকে চাই। বল, তুমি আমাকে ভালবাসবে?

গদাধর। হায়! কে আমি? কি আমি, যে আমার জন্যে আপনি এমন অধর্ম্মের আশ্রয় নিচ্চেন? কে আমি যে আমার

জন্যে আপনি কলঙ্কের ডালি মাথায় করবেন, নরকের বিকট যন্ত্রণা ভোগ করবেন? কে আমি যে আমার জন্যে আপনি স্বামীর পুণ্যাশ্রয়, পবিত্র স্নেহ, চিরদিনের জন্যে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছেন? আমার এই কদর্য্য বিকট দেহের দিকে চেয়ে দেখুন, এতে কি আছে যে এর জন্যে আপনি সতীত্বের স্বর্গ থেকে নেমে, এই পাপ দুর্গন্ধময় পঙ্কিল নরকে ঝাঁপ দেবার জন্যে অভিলাষী হয়েছেন? আমার এই দীন দারিদ্র্যের মধ্যে আপনি কি দেখলেন যে সংসারের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়ে, লোকনিন্দার বোঝা মাথায় নিতে প্রস্তুত হয়েছেন? ছি ছি! এখনও সময় আছে। আমি বলছি, আপনি ফিরে যান, ফিরে যান।

চারুশশী। আমি ফিরে যাব না, আমি তোমাকে চাই।

গদাধর। আমাকে চান? তবে এদিকে আসুন।

দ্বারাবরোধ ছাড়িয়া, আত্মহারা চারুশশী গদাধরের দিকে অগ্রসর হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে, মহাবেগে গদাধর দ্বারপথে বাহির হইয়া গেল। পরাভূতা পাপিনী, ক্ষোভে তাপে অশ্রুজলে বিগলিতা হইয়া, করীপদবিদলিতা পদ্মিনীর ন্যায়, কক্ষতলে বিলুণ্ঠিতা রহিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

মানদার মাতা রত্নময়ী।

একুশ বৎসর বয়সে গদাধর যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ-এ পরীক্ষাতে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিল, তখন আমাদের লালাস্রাবময়ী নায়িকা শ্রীমতী মানদা দেবী পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিয়া, শিখিকণ্ঠবর্ণ ক্ষুদ্র পট্টবস্ত্র পরিহিত হইয়া, পুণ্যপুষ্করিণী স্বহস্তে খনন করিয়া, শ্রীমতী স্থুলী দেবীর শিক্ষকতায় ব্রতানুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া দিল। বিল্বপল্লবছায়া-সমাকুল পুণ্যবাপীর সুসংস্কৃত তীরভূমিতে বসিয়া বালিকা মানদা ভক্তিগদ্‌গদ বালকণ্ঠে মুহুর্মুহুঃ কোকিলকুহরণের ন্যায় প্রত্যহ প্রভাতকালে গাহিত,—

পুণ্য পুকুর পুষ্পমালা।
কে পূজে রে দুপর বেলা॥

প্রভাত রৌদ্রে সুকুমার মুখটি রক্তবর্ণ করিয়া, রৌদ্রালোকে কর্ণভূষা দুলাইয়া, নোলক নাড়িয়া গাহিত,—

আমি সতী লীলাবতী।
ভাই বোন পুত্রবতী॥

চন্দনচর্চ্চিত ললাট কুঞ্চিত করিয়া, গ্রীবা উচ্চ করিয়া গাহিত—

হবে পুত্র মরবে না।
পৃথিবীতে ধরবে না॥

কণ্ঠের পুষ্পমালা দোলাইয়া, সদ্য প্রস্ফুটিত রক্তপুষ্পদল তুল্য যুগ্ম করপল্লব উর্দ্ধে তুলিয়া ক্ষুদ্র কোমল ওষ্ঠ কম্পিত করিয়া গাহিত,—

স্বামীর কোলে পুত্র দোলে।
মেথ হরি পদতলে॥

আজ সরস শ্যামল বঙ্গমাতার পরিশুষ্ক কণ্ঠে তৃষ্ণাকাতরতা দেখিয়া আমাদের মনে হয়, বুঝি এই পুণ্য পুকুরের সুধাগান আমাদের দেশে আর প্রভাত-বিহঙ্গ-কাকলীর সহিত বালিকাদিগের মধুর কণ্ঠে ঝঙ্কারিত হয় না। সরোবর-প্রতিষ্ঠার পবিত্র প্রবৃত্তির বীজ, আমাদিগের বিশ্বাস, এই পুণ্যপুকুরের ব্রতের মধ্যে নিহিত আছে। সকল বীজেই যে গাছ হয়, এমত নহে। কিন্তু গাছের আবশ্যক হইলে বীজ বপন করিতেই হইবে। পুণ্যপুকুরের ব্রতধারিণী প্রত্যেক বালিকাই যে উত্তরকালে সরোবর প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, এমত নহে; কিন্তু যে পুণ্যবতী রমণী বার্দ্ধক্যে সরোবর প্রতিষ্ঠার পুণ্য সঞ্চয় করেন, তাঁহার বাল্য ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে যে, বাল্যকালে তিনি পুণ্যপুকুরের ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। সরোবর-প্রতিষ্ঠা করাটা অন্য দেশে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না; উহা বাঙ্গালীরই ধর্ম্ম। পুণ্যপুকুরের ব্রতও বাঙ্গালী বালিকারই ব্রত; উহা আর কোথাও নাই।

নুলীর শিক্ষকতায় মানদা আরও কত ব্রতানুষ্ঠান করিল। নবীন দুর্ব্বাদল দ্বারা গাভীর সেবা শিক্ষা করিয়া, গোকালের ব্রত আরম্ভ করিল। চিত্রচর্চ্চায় দশপুত্তলি অঙ্কিত করিয়া স্বামিভক্তি শিক্ষা করিল। তাহার পর, সতীনকে গালাগালি দিবার মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিবার জন্য আর এক ব্রতের অনুষ্ঠান করিল। সে ব্রতের নাম সাঁজ পূজনীয় ব্রত। জানি না, আমার পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ সে ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছেন কি না। তোমরা কি কেহ একটি পক্ষী অঙ্কিত করিয়া সেই অঙ্কনের উপর হস্তার্পণ করিয়া কহিয়াছ,—

ময়না ময়না ময়না,
সতীন যেন হয় না।

তোমরা কি কেহ পিটালি গুলিয়া, তদ্দ্বারা একটা গাছের মত চিত্র লিখিয়া তিনবার করিয়া বলিয়াছ,—

'অশথ তলায় বসত করি,
সতীন কেটে আল্‌তা পরি।'

ইহা যদি তোমরা না বলিয়া থাক, তাহা হইলে বৃথায় বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। আমার নায়িকা, আমার মানদা, বাঙ্গালী। ঘণ্ট-সুক্ত-ছ্যাছ্‌ড়া-সড়সড়ি-খাগীর, ক্ষীর সর-ননীভুক্তা কন্যা আসল বাঙ্গালী। সে পাঁচ বৎসর বয়সে সাঁজপূজনীয় ব্রত করিয়া, সতীন হইবার পূর্ব্বে সতীনকে প্রাণ ভরিয়া গালি দিয়াছিল। তাহার গালির মন্ত্র হইতে মাছিটিও পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে নাই।

সে মাছির আকৃতির ন্যায় এক ক্ষুদ্র অঙ্কনের উপর, তাহার কঙ্কণ-ধ্বনিত ক্ষুদ্র করতল বিন্যস্ত করিয়া কহিয়াছিল,—

মাছি মাছি মাছি,
সতীন ম'লে বাঁচি।

একবার নয়, তিনবার বলিয়াছিল,—

মাছি মাছি মাছি,
সতীন ম'লে বাঁচি।

ব্রত নিয়মের মাঝে, সীমাহীন আদর সোহাগের মাঝে, মনোমত মহার্হ সাজে সদা সজ্জিত থাকিয়া, সুবর্ণভূষায় ভূষিত হইয়া আদরিণী মানদা বর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। তাহার আব্দারে, বাহানাতে, হাসিতে, কান্নাতে জমীদার বাবুর প্রকাণ্ড বাটী সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত। তাহার আহারে, বিহারে, নিদ্রায়, জাগরণে, বাটীর সমস্ত দাসদাসী বিব্রত হইয়া ফিরিত। সে ইলিস মাছের ডিম খাইতে এত ভালবাসিত যে, তাহার জন্য ইলিস মৎস্যকে বার মাস সসত্ত্বা অবস্থায় থাকিতে হইত। মেছুনি মাগী বার মাস জমীদার বাবুর আজ্ঞাক্রমে প্রত্যহ এক একটি গর্ভবতী ইলিস-যুবতী লইয়া হাজির হইত। তাহার পান জন্য দুগ্ধ সরবরাহ করিতে হইলে, গোপবধূকে আপনার সনাতন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইত; দুগ্ধে এক বিন্দু নীর সংযুক্ত করিবার সৎসাহস তাহার অঞ্চলাবৃত হৃদয় মধ্যে উদিত হইত না।

মানদার মাতার নাম রত্নময়ী। বিবাহের পূর্ব্বে, তাঁহার নাম

ছিল বিন্দুবাসিনী। কিন্তু বিবাহের সময় রত্নেশ্বর বাবুর পিতা কহিলেন যে ও নাম ভাল নয়। তিনি স্থির করিলেন যে, তাঁহার পুত্র রত্নেশ্বরের বধূর নাম রত্নময়ী হওয়া উচিত। তাঁহার পার্শ্বস্থ কয়েক জন ভদ্র ব্যক্তি কহিলেন, "হাঁ, হাঁ, বাবু মহাশয় যথার্থ আজ্ঞা করেছেন; রত্নময়ী নামটি অতি সুমধুর আর ঠিক মানানসই; বধূর রত্নময়ী নাম হওয়াই উচিত।" অতএব বিবাহের পর বিন্দুবাসিনী রত্নময়ী হইয়া গেল।

রত্নময়ীর শ্বশ্রূঠাকুরাণী বিবাহের সময় জীবিত ছিলেন না; এ নিমিত্ত বিবাহের অল্প দিন পর হইতেই তিনি জমীদার বাবুর বিপুল সংসারের কর্ত্রী হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, রত্নময়ী কর্ত্রী হইবার পূর্ব্বে সেই কর্ত্তৃত্ববিহীন বৃহৎ পরিবার মধ্যে যে অতি বৃহৎ বিশৃঙ্খলা বিরাজ করিত, তাঁহার অশিক্ষিত কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়াও, তাহার কিছুমাত্র অপনীত হয় নাই। তথাপি প্রতিবেশিনীগণ কোন প্রকার আবশ্যক দ্রব্য সংগ্রহাভিলাষিণী হইয়া, যখন তাঁহার নিকট সমাগতা হইত, তখন তাহারা অভিলষিত দ্রব্য করতলগত করিয়া কহিত যে, তেমন সুদক্ষ এবং সুচতুর এবং মধুরভাষিণী এবং সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপিণী গৃহিণী তাহারা বিশাল ভুবন মধ্যে কুত্রাপি নয়ন-গোচর করে নাই।

এক্ষণে রত্নময়ী দেবী মানদার মাতা হইয়া এবং প্রৌঢ়ত্ব লাভ করিয়াও আপন গৃহমধ্যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শৃঙ্খলা আনয়ন করিতে সক্ষমা হন নাই। ফলতঃ প্রত্যেক লোকের নিকট হইতে অপরিমিত স্তুতি লাভ করা ব্যতীত গৃহিণীর যে অন্য কোনও

কর্ত্তব্য সাধন থাকিতে পারে, তাহা তিনি পরিজ্ঞাত ছিলেন না; অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া, হীনা স্তাবকী পুরনারীগণের স্তুতিপূর্ণ মুখ-সকল মুখরিত করিয়া, সশব্দ চরণালঙ্কারে গৃহতল ধ্বনিত করিয়া, তিনি দিবাবসান কালে পুরীমধ্যে বিচরণ করিয়া, মনে করিতেন যে, তাঁহার কর্ত্তৃত্বের কর্ত্তব্য সমস্তই প্রতিপালিত হইল। কন্যার জন্য নবীন ভূষা, স্বামীর নিকট প্রার্থনা করিয়া, এবং যথাসময়ে তাহা প্রাপ্ত না হইলে, মরণের দ্বারা জীবিত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া, রত্নময়ী মনে করিতেন যে, একমাত্র আদরিণী কন্যার প্রতি পরম স্নেহময়ী মাতার সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইয়া গেল। স্বামীর আহার কালে তালবৃন্ত-সঞ্চালনে মক্ষিকাকুলকে বিতাড়িত করিয়া, তিনি মনে করিতেন, স্বামিসেবারূপ সুকঠিন ব্রতের প্রত্যেক ক্রিয়াটি সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

রত্নময়ীর চরিত্রচিত্রন জন্য আমরা উপরে যে কয়েক পংক্তি লিখিলাম, তাহা হইতেই তোমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে যে, মানদা কিরূপ মাতার কন্যা। মাতাকে দেখিয়া, তোমরা কন্যার ভবিষ্যৎ জীবন চিত্রিত করিয়া লও।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

গদাধরের পুরস্কার।

বি-এ পরীক্ষা যখন খুব নিকটবর্ত্তী, তখন প্রবেশিকার ফল বাহির হইল। জ্ঞানদা বাবু সংবাদ-পত্র লইতেন বটে, কিন্তু প্রায় তাহা পাঠ করিতেন না। এবার তিনি অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত সংবাদপত্র খুলিয়া বসিলেন। দেখিলেন, গদাধর তাঁহাকে বহুপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছিল, তাহা সত্য হইয়াছে! তাঁহার প্রথম পুত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে। ধন্য গদাধরের যত্ন; তাঁহার কোন পুরুষে যে কায পারে নাই, স্বপ্নেও যাহা তিনি আশা করেন নাই, গদাধর তাহাই সফল করিয়াছে। তিনি গদাধরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কহিলেন, "গদাধর, আজ তুমি আমার মনে যে আহ্লাদ দিয়েছ, তার জন্যে আমার কাছে তুমি কোনও পুরস্কার প্রার্থনা কর।"

গদাধর। আপনার মনে সন্তোষ জন্মেছে, এর চেয়ে আমার আর বেশী কি পুরস্কার আছে? আপনার আহ্লাদ দেখে আমি যথেষ্ট পুরস্কৃত হয়েছি।

জ্ঞানদা বাবু। না হে, তোমার ও সব বাজে কথা আমি শুনব না। আজ তোমার কিছু চাইতেই হবে। যা' চাইবে দেব।

গদাধর। তা হলে, চাইব? কিন্তু বোধ হয়, আপনি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারবেন না।

জ্ঞানদা। নিশ্চিত পারব। প্রতিজ্ঞা করলাম, আজ তুমি যা চাইবে, সাধ্য থাকলে, তা আমি তোমায় দেব। ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরার আংটি, সোনার হার, কি চাও? যদি এ সবই চাও, সবই দেব। যদি নগদ টাকা চাও, তাও দেব।

গদাধর। আপনি আগে প্রতিজ্ঞা করুন যে দেবেন; তার পর আমি চাইব।

জ্ঞানদা। এই ত প্রতিজ্ঞা করলাম, আবার কি প্রতিজ্ঞা করব? আচ্ছা, আমি তিনবার বলছি যে, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব, করব করব।

গদাধর। আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি আজ থেকে, আপনার এই অত্যন্ত আনন্দের দিন থেকে, মদ খাওয়াটা ছেড়ে দিন।

জ্ঞানদা। সর্ব্বনাশ!

গদাধর। সর্ব্বনাশ কেন? আপনি তিনবার প্রতিজ্ঞা করে' কি তা রক্ষা করতে পারবেন না?

জ্ঞানদা। কিন্তু, কেন তোমার এ খেয়াল হল?

গদাধর। আপনার অন্নে আমি প্রতিপালিত। আপনাকে নিন্দাশূন্য আর নীরোগ করতে পারলে আমার জীবন সার্থক হবে। আপনার অনিন্দ্যনীয় চরিত্রে কেন এ কলঙ্কটুকু রাখবেন? এই রোগের বাসা, উন্মাদকর জিনিষের জন্যে কেন আপনার ভঙ্গুর স্বাস্থ্যকে ভগ্ন করবেন? আপনার মুখের দিকে চেয়ে আমার

মনে হয় যে, আপনার দেহ মধ্যে কোন আভ্যন্তরিক রোগ প্রবেশ করেছে। আমার বিনীত প্রার্থনা, আশ্রিতের প্রতি সদয় হয়ে, এ রোগজনক অভ্যাস পরিত্যাগ করুন।

জ্ঞানদা। গদাধর, আমি তোমার কথা শুনব। আমি বেশ বুঝছি যে, তোমার কথা শুনলে আমার ভাল হবে।

গদাধর। আপনার কথা শুনে আমার জীবন সার্থক হল। আমি ধন্য হলাম।

সেই দিন, সন্ধ্যাকালে জ্ঞানদা বাবুর মনোমধ্যে বাসনা এবং সংযম উভয়ে মিলিয়া ভারি লড়াই বাধিয়াছিল। তিনি ভৃত্যকে দুইবার আহ্বান করিলেন; দুই বার তাহাকে কহিলেন যে, তাঁহার কোন আবশ্যক নাই। ভৃত্য জানিত না যে তাহার প্রভুর হৃদয়ে এক ভয়ঙ্কর সমর চলিয়াছিল; সে অকারণ আহ্বান আশ্চর্য্য হইয়া ফিরিয়া গেল। আবার তিনি তাহাকে আহ্বান করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, বাটীতে কয় বোতল হুইস্কি বা ব্রাণ্ডি মজুদ আছে। সে গণনা করিয়া আসিয়া সংবাদ দিল। জ্ঞানদা বাবুর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। প্রলোভনটা বড় উজ্জ্বল বেশে তাহার সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। জ্ঞানদা বাবু আসন ত্যাগ করিয়া অন্য আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। ভৃত্যকে কহিলেন, “তুই চলে যা।” হে বিপন্নের আশ্রয়, হে আশ্রয়হীনের বন্ধু, হে সর্ব্বরক্ষক, জ্ঞানদা বাবু আজ বড় বিপন্ন হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে রক্ষা কর। তুমি রক্ষা না করিলে বুঝি ভাগ্যহীন আবার বাসনাপ্রবাহে ভাসিয়া যাইবে। তুমি একমাত্র

উদ্ধারকর্ত্তা, তুমি তাহাকে উদ্ধার কর। ধন্য তিনি! তাঁহার আমোঘ শক্তি জ্ঞানদা বাবুর মনোমধ্যে সঞ্চারিত হইল। সংযমের নিকট বাসনা পরাজিত হইল।

রাত্রে, অন্তঃপুরমধ্যে শয়ন করিলে পর, গৃহিনী আসিয়া জ্ঞানদা বাবুর গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন। তাঁহার সেবায় তৃপ্তি লাভ করিয়া জ্ঞানদা বাবু গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, অন্য কোন-দিন ত আমায় তুমি এত আদর কর নি।" গৃহিণী কহিলেন, "আমি রোজই প্রাণপণে তোমার সেবা করি; কিন্তু তুমি মদে অচেতন থাক, এজন্যে কিছুই অনুভব করতে পার না। আজ ত তুমি মদ খাও নি।"

জ্ঞানদা বাবু শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, "না, আজ আমি মদ খাই নি। যদি ভগবান্ কৃপা করেন, তাহা হলে জীবনে আর কখন খাব না। দেখ, এই মদটা আমাকে কি একটা বিপুল সুখ থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। ভক্তিমতী স্ত্রীর সেবা পৃথিবীর জিনিষ নয়, আর স্বর্গেও বোধ হয় সুলভ নয়। এত দিন এই সেবার পরম তৃপ্তি-অনুভবে আমি বঞ্চিত ছিলাম। দেখ, গদাধর সহজ ছেলে নয়। দেখেছ ত, সে সেদিন কুস্তিতে রতন সিংকে কত সহজে হারিয়ে দিলে। আর, এখন আমার হাত কিছু অবশ হয়েছে, পাখোয়াজ বাজনায় বুঝি সে আমাকেও হারাবে; কি মিঠে হাত! খোকাকে পড়াবার জন্যে এত যত্ন করলে যে, আমার মত মুর্খ পিতার সন্তান হয়েও সে পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হল। এতে যখন আমি সন্তুষ্ট

হয়ে তাকে পুরস্কৃত করবার অভিলাষ প্রকাশ করলাম, সে ঘড়ি, চেন, আংটি, টাকা কড়ি কিছুই চাইলে না। গরীব গদাধর অক্লেশে, অম্লান বদনে সমস্ত ত্যাগ করে' বল্লে, আমার প্রার্থনা যে, আজ থেকে আপনি মদ খাওয়া ত্যাগ করুন, আমার কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।—সে যখন এই কথাটা বল্লে, তখন ত তার মুখখানি তুমি দেখ নি। তাহার চোখ দেখে আমার ভয় হল। তাহার প্রার্থনাটা যেন একটা বিচারপতির আদেশ বলে' মনে হল। আমার সে আদেশ অমান্য করবার সাধ্য রইল না। তুমি কতবার আমাকে বারণ করেছ, কতবার আমার পায়ে ধরে' কেঁদেছ, তবু আমি এই কু-অভ্যাসটা ত্যাগ করতে পারি নি। কিন্তু আজ গদাধরের মুখ থেকে কথা বার হবামাত্র, আমি বলে ফেল্লাম, গদাধর, আমি তোমার কথা শুনব।—তুমি হয়ত জান না; কিন্তু পৃথিবীতে এক একটা এমন মানুষ আছে যে, তাদের কথা অমান্য করা চলে না; তা পালন করতেই হয়। গদাধর সেই জাতীয় মানুষ। তাকে তুমি সহজ লোক মনে কোর না।"

মৌনাবলম্বিনী হইয়া, স্বামীর মুখের দিকে বিশাল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জমীদার-পত্নী সমস্ত শ্রবণ করিলেন। তাঁহার বক্ষ মধ্যে স্নেহ-সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল। সেই দিন হইতে তাহার চক্ষে গদাধর পুত্রাধিক প্রিয় হইল।

পর দিন প্রত্যূষে অতুলানন্দ গদাধরকে আসিয়া কহিলেন,—

"ওহে! তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। কর্ত্রী ঠাকুরাণী আদেশ করে' পাঠিয়েছেন যে, পার্ক ষ্ট্রীটের ধারে, গত বৎসর পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে যে তিন বিঘা এগার কাঠা জমি তাঁর নামে খরিদ করা হয়েছিল, তা সমস্তই তোমাকে দিতে হবে। আমার প্রতি হুকুম হয়েছে যে আজকের মধ্যেই উকিলের কাছে গিয়ে দানপত্রের লেখাপড়া করতে হবে। কর্ত্রী ঠাকুরাণী আপাততঃ তোমায় এ কথা বলতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু আমি ত বলে ফেল্লাম।"

শুনিয়া, গদাধর তাহার পিতাকে পত্র লিখিল,—

"বাবা,

সে দিন আপনার পত্র পাইয়াছিলাম। কিন্তু এবার তাহার উত্তর লিখিতে একটু দেরী হইয়া গেল। আমি একটা বিষয়ে আপনার উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি। জ্ঞানদা বাবুর পুত্র প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, আমারই যত্নে সে পরীক্ষাতে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ইহা মনে করিয়া, তাঁহারা আমাকে একটা পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যের জমী দান করিতেছেন। আমি ইহা লইব কি? তাঁহারা আমাকে বেতন এবং আশ্রয় দুই দিতেছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কি এ পুরস্কার লওয়া সঙ্গত? আমরা দরিদ্র; কলিকাতার ভিতর এই মূল্যবান্ জমী লইয়া কি করিব? কি করা কর্ত্তব্য আপনি শীঘ্র উপদেশ দিবেন। আমি আপনার আশীর্ব্বাদ পত্রের আশায় রহি-

লাম। আর চার দিন পরে আমাদের বি-এ পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। পরীক্ষা শেষ হইলেই আমি বাটী যাইব। শ্রীচরণে নিবেদন ইতি।

সেবক গদাই।"

এ পত্র সুখসংবাদ লইয়া যখন মধুসূদনের নিকট পৌঁছিল, তখন তিনি সাংঘাতিক রোগে শয্যাগত। পত্রের উত্তর লিখিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না।

উমাকালী চক্রবর্ত্তী আসিয়া কহিল, "ভায়া, ডাক্তার বলছেন, তোমার রোগটা শক্ত। গদাধরকে সংবাদ দেবার জন্য আমরা ইচ্ছা করেছি। তুমি কি বল?"

মধুসূদন ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "না, না, আমার পীড়া কঠিন নয়। তোমরা গদাধরকে পত্র লিখ না। আমার পীড়ার জন্যে চিন্তিত হলে, সে আর পরীক্ষা দিতে পারবে না। আর দু' দিন পরেই তাহার পরীক্ষা আরম্ভ হবে। এই দেখ সে আমায় পত্র লিখেছে।"—এই বলিয়া, মধুসূদন গদাধরের পত্র উমাকালীর হস্তে প্রদান করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

মধুসূদনের মৃত্যু।

পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার উত্তরের প্রতীক্ষায় গদাধর উদ্বিগ্ন চিত্তে দিনের পর দিন অতিবাহিত করিল। কিন্তু সে প্রতীক্ষিত পত্র আর আসিল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অতি ভীষণ আতঙ্ক আসিয়া আশ্রয় লইল। সে অতি কষ্টে মনকে শান্ত করিয়া চারি দিন পরীক্ষা দিল।

পরীক্ষার পঞ্চম বা শেষ দিনের প্রত্যূষে চিন্তাভারে ম্রিয়মাণ হইয়া, সে ডাকহরকরার প্রত্যাশায় দ্বারের নিকট দণ্ডায়মান ছিল। ভাবিতেছিল, পরীক্ষা না দিয়া, ইতিপূর্ব্বেই তাহার বাড়ী যাওয়া উচিত ছিল। পিতা হয়ত কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়াছেন। হয়ত তাঁহার হাত এমন অবশ হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে পত্র লিখিবার সামর্থ্যও তাঁহার নাই। চক্রবর্ত্তী কাকা কি করিলেন? তাঁহাকেও ত পত্র লিখিয়াছি; তিনি কেন উত্তর দিলেন না? আর সে থাকিতে পারে না। মনের এই উদ্বেগ লইয়া কলিকাতায় আর এক দণ্ডকাল অবস্থিতি করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পরীক্ষা থাক্, সে আজই বাড়ী যাইবে।

জ্ঞানদা বাবুর অনুমতি লইবার জন্য সে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। রাস্তায় প্রান্তে ডাক-হরকরাকে দেখিয়া, সে স্থির

হইল। হরকরা আসিয়া তাহার হাতে একখানি পত্র দিল। পত্র তাহারই, হস্তাক্ষরও পরিচিত।

পত্র অম্বিকা দেবীর লিখিত। পত্রমধ্যে নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি লেখা ছিল।—

"গদাধর,

তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করিও। আজ বাবার সহিত আমি তোমাদের বাটীতে গিয়াছিলাম। তোমার পিতা পীড়িত। আগামী কল্য তোমার পরীক্ষা শেষ হইবে। পরীক্ষা শেষ হইবামাত্র তুমি বাটী আসিও। বাবা তোমাকে অকারণ উদ্বিগ্ন হইতে নিষেধ করিতেছেন। ভরসা করি তুমি ভাল আছ। ইতি।

প্রণতা অম্বিকা।"

পত্র পাঠ করিয়া, জ্ঞানদা বাবুর অনুমতি এবং সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ করিয়া, হাটখোলার ঘাটে আসিতে কে জানে গদাধরের কয় মিনিট সময় লাগিয়াছিল! মাতা—তীরে ভূমির নিবিড় ক্রোড়ে এবং ভাগীরথীর শুভ্র কোমল তরঙ্গ শয্যায় শুইয়া, এবং আপনাদের মুখ হইতে অতি কোমল ও অতি শুভ্র কুজ্ঝটিকায় আস্তরণটি অপসারিত করিয়া নৌকাসকল 'মাতৃস্তন পানরত' শিশুগুলির মত তটলগ্ন হইয়া ছিল। গদাধর একখানি ক্ষুদ্র তরণী বাছিয়া লইল। মাঝিকে কহিল, "ছেড়ে দাও, নাড়িচা যেতে হবে।"

মাঝি গদাধরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, এবং বাক্যব্যয়

না করিয়া দুইজন দাঁড়ি লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা জোয়ারের টান মুখে লইয়া নাড়িচার দিকে ছুটিল।

কিয়দ্দূর গমনের পর, গদাধর মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মাঝি, তোমার কি আর একখানা দাঁড় আছে? আমাকে দাও, আমিও টানব।" মাঝি নৌকার পার্শ্বে যেখানে আর একখানা দাঁড় ছিল, তাহা দেখাইয়া দিল। গদাধর ক্ষেপণী গ্রহণ করিয়া, তাহা স্রোতোমধ্যে নিমজ্জিত করিয়া আকর্ষণ করিল। তরণী উন্মত্তাবেগে নাড়িচা অভিমুখে ছুটিল।

বেলা দশটার সময় বাটী পৌছিয়া গদাধর মৃত্যুশয্যায় শয়ান পিতাকে দেখিল। তাহার মহাবলশালী বিপুল দেহ সহসা শক্তিহীন হইয়া গেল। সে পিতার চরণতল তপ্ত অশ্রুজলে বিধৌত করিয়া শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। ডাকিল, 'বাবা।' সে কণ্ঠস্বরে ভীত হইয়া, বুঝি যমরাজও আপনার নিদারুণ কর্ত্তব্য ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সে সুধাপূর্ণ আহ্বান মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রের ন্যায় মধুসূদনের কর্ণবিবরে প্রবেশ করিল। তিনি জ্ঞানলাভ করিয়া চকিতনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দ্বারদেশে রোরুদ্যমানা পত্নীকে দেখিয়া কহিলেন, "তুমি কেঁদ না; তোমার চোখে জল দেখলে গদাই আমার অস্থির হয়ে পড়বে।"

উমাকালী চক্রবর্ত্তী দাওয়ায় বসিয়া কহিল, "আহা হা, হরি হে।"

গদাধর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চক্রবর্ত্তী

কাকা, ডাক্তার কখন্ আসবেন ? নান্দীগ্রামের গোবিন্দ ডাক্তারকে কি আনা হয়েছিল ?”

উমা। হ্যাঁ, তাঁকেও আনা হয়েছিল। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি। কালীদহের কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মশায় আর তাঁর সেই মেয়েটি, বাবাজি, অদ্ভুত লোক। তাঁরা নিজ ব্যয়ে দেশের যত ডাক্তারকে জড় করেছিলেন। আর সেই মেয়েটি নিজে রাত দিন বসে’ সেবাশুশ্রূষা করছেন। ধন্য তাঁরা ! কিন্তু যার আয়ু শেষ হয়েছে, মানুষে তার কি করবে ? তুমি কেঁদ না, বাবাজি। তোমার কান্না দেখলে মধু ভায়া অস্থির হয়ে পড়বে। আহাহা, কর কি, তুমি যে আমাকে শুদ্ধ কাঁদিয়ে দিলে !

কথাটা ঠিক সত্য নহে। উমাকালী পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, কথা কহিতে কহিতে কতবার অশ্রু নয়ন-কোণ অতিক্রম করিয়াছিল। এক্ষণে বলিষ্ঠ, যুবক, পুত্র-স্থানীয়, অশ্রুপ্লাবিত গদাধরকে শোকাবেগে পিতৃপদতলে বিলুণ্ঠিত দেখিয়া তাঁহার বাক্য কণ্ঠমধ্যে রুদ্ধ হইয়া গেল। নয়নজল তাঁহার গণ্ড প্লাবিত করিয়া দিল !

পূর্ব্ব রাত্র হইতে অম্বিকা গদাধরের বাড়ীতে অবস্থিতি করিয়া, মধুসূদনের শুশ্রূষা করিতেছিল। আজ বেলা এক প্রহরের পর উমাকালী আসিয়া, তাহাকে স্নান আহার জন্য আপন বাটীতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। এক্ষণে সে স্নান আহার সমাপন করিয়া, উন্মুক্ত নিবিড় কেশ পৃষ্ঠদেশে লম্বিত করিয়া, স্বর্গ হইতে অবতীর্ণা

দেবীর ন্যায়, রোগীর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, গদাধর তাহার পত্রপ্রাপ্তিমাত্র বাটী আসিয়াছে। বুঝিল, সে শেষ দিনের পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে নাই; পিতাকে দেখিবার জন্য পত্র-প্রাপ্তিমাত্র ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহার পিতৃভক্তি বিদ্যা-গৌরবকে পদদলিত করিয়াছে। সে মনে মনে বলিল, "দেবতা, তোমার পূজার আসন, আমার হৃদয় মধ্যে আরও উচ্চে উঠিল।"

মধুসূদনকে সম্বোধন করিয়া অম্বিকা কহিল, "বাবা আপনার ওষুধ খওয়ার সময় হয়েছে, ওষুধ খা'ন।"

মধুসূদন অম্বিকার মুখের দিকে আপনার ক্ষীণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "মা, ওষুধ আর নয়। আমার ওষুধ ঐ দেখ।" এই বলিয়া, দুইটি ক্ষীণ হস্ত উত্তোলন করিয়া, মধু-সূদন গদাধরকে দেখাইয়া দিলেন।

পিতার কথা শুনিয়া, গদাধর শোকাবেগে নিতান্ত অধীর হইয়া পড়িল। তাহার কপোল প্লাবিত করিয়া অজস্র অশ্রুধারা বহিল। গদাধর কাতর কণ্ঠে ডাকিল, "বাবা।"

মধুসূদন কহিলেন, "বাবা আমার! গদাই আমার! আর আমাকে ডেক না। আমার পৃথিবীর কায ফুরিয়েছে। আর আমার পৃথিবীতে থাকবার অধিকার নেই! তোমার ডাক শুনলে আমার স্বর্গে যাওয়াও কঠিন হবে। তোমাকে শেষ আশীর্ব্বাদ করবার জন্যে এ প্রাণ রেখেছিলাম। এখন তুমি এসেছ। পুত্রের কর্ত্তব্য প্রতিপালন কর। তোমার অঞ্জলি পূরে

গঙ্গার জল আমার মুখে ঢেলে দাও। কাণে, ভগবানের পবিত্র নাম কীর্ত্তন কর। অধীর হয়ো না। কঠিন এ কর্ত্তব্য, তথাপি এ তোমাকে পালন করতে হবে। বাবা, যত দিন পৃথিবীতে থাকবে, কর্ত্তব্য যতই কঠিন হোক, তা থেকে যেন কখনও তোমাকে পরাঙ্মুখ হতে না হয়। আমি আমার আসন্ন কালে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি যেন কর্ম্মবীর হয়ে পৃথিবীর উপকারের জন্যে আপনার জীবন উৎসর্গ করতে পার।"

উমাকালী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "বাবা, দাও, তোমার বাবার মুখে আর একটু গঙ্গাজল দাও। মধু ভাই, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি তোমার গদাইয়ের হাতে গঙ্গাজল পান করে' তোমার মত মরতে পারি। মধু, ভাই আমার, তুমি গদাধরকে আর একটি আশীর্ব্বাদ কর। তোমার মুখের বাণী মিথ্যা হবে না। সে যেন জন্মজন্মান্তরে তোমার মত পিতা লাভ করতে পারে।"

মধুসূদন কহিলেন, "গদাই আমার বংশের তিলক। ও আমার বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। জানি না, কোনও জন্মে আমি এমন পুত্র লাভ করতে পারব কি না। দীনবন্ধু, অসহায়ের সহায়, তুমি আমার বাছাকে রক্ষা কোর, সংসারে তাহাকে সুপথ দেখিয়ে দিও।"

অম্বিকা মধুসূদনের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার ললাটে আপন শীতল হস্ত বিন্যস্ত করিল। ধীরে ধীরে তাঁহার শিথিল হস্ত তুলিয়া

আপন ক্রোড়ের উপর রাখিল। তাঁহার নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিয়া দেখিল। তাহার পর, আপনার অশ্রুভারাক্রান্ত বিশাল চক্ষু তুলিয়া উমাকালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

উমাকালী কহিলেন, "বুঝেছি।" এবং উঠিয়া, ত্বরিত পদে গ্রামের কয়েকটি লোককে ডাকিয়া আনিলেন। বেলা তিনটার সময় মধুসূদনকে তীরস্থ করা হইল। গদাধরের হাহাকার ধ্বনিতে গ্রামের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল; আকাশের উদার বক্ষ কম্পিত হইয়া উঠিল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

গদাধরের বিবাহের সম্বন্ধ।

ইংরাজি ভাষায় একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে, বিপদ্ কখনও একাকী আসে না। এ কথাটা যে অত্যন্ত সত্য তাহা বাস্তব জীবনে আমরা কতবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

পিতৃবিয়োগের অসহ্য ব্যথায় গদাধর যখন আহার নিদ্রা ভুলিয়া ধূলিতে বিলুণ্ঠিত ছিল, বিধাতা তখন সেই কাতরের মস্তকে আর একটা নিদারুণ বজ্রাঘাত করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। যেন তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহিলেন, এই অসীম নির্দ্দয়তার পরও মানুষ তাঁহাকে করুণাময় বলে কি না। স্বামীর মৃত্যুর সাত দিন পরে, গদাধরের মাতা বিসূচিকা রোগে পরলোকগত স্বামীর পদানুসরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু দেখিয়া পল্লিবাসিনীগণ কহিল, "আহা! এমন পুণ্যবতী আর দেখিনি; দশ দিনও স্বামীর বিচ্ছেদ সহ্য করলে না।"

শ্রাদ্ধাদি সমাপ্ত হইবার পর, একদিন অম্বিকা, পিতার সহিত গদাধরের নিকট আসিয়া কহিল, "চল গদাধর, কিছুদিন তুমি কালীদহে গিয়ে আমাদের বাড়ীতে থাকবে।"

গদাধর কহিল, "না, অম্বিকা, এখন তুমি এ অনুরোধ কোর না—এখন আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। এ

বাড়ী এখন আমার পবিত্র তীর্থস্থান হয়েছে। এ তীর্থ ছেড়ে এখন কোথাও যাব না।”

অম্বিকা আর সে কথা উত্থাপন করিল না। অন্যান্য প্রস্তাবে কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া, গদাধরের হৃদয়ের বেদনাভার আপনার হৃদয় মধ্যে বহন করিয়া সে পিতার সহিত কালীদহে ফিরিয়া গেল।

গদাধর নাড়িচা গ্রামে দুই মাস থাকিবার পর একদিন জানিতে পারিল যে, বি-এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। বলা বাহুল্য, উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে গদাধরের নাম ছিল না। আমরা পরে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছিলাম যে, যে সকল বিষয়ে গদাধর পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার প্রত্যকটিতে সে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু পঞ্চম দিনে সে মৃত্যুশয্যায় শয়ান পিতাকে দেখিবার জন্য, পরীক্ষা দিতে পারে নাই। কাযেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে সে অনুপযুক্ত।

তা, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়াতে গদাধরের কোনও প্রকার ক্ষতি ছিল না। সে মনে করিয়াছিল যে, সংসারে তাহার সকল কায ফুরাইয়া গিয়াছে। বিদ্যাগৌরব লাভে তাহার আর আস্থা ছিল না।

কিন্তু অম্বিকা ছাড়িবার পাত্রী নহে। সে ধীরে ধীরে গদাধরের শোকক্ষতের উপর আপনার অপরিসীম স্নেহের স্নিগ্ধ প্রলেপ অনুলেপন করিতেছিল। আপনার মধুর আকর্ষণে তাহাকে ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত কর্ত্তব্যের পথে টানিয়া আনিতেছিল। আপনার

প্রাণ ঢালিয়া, গদাধরের প্রাণে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত করিতেছিল। তাহার কাতরতা আপনি গ্রহণ করিয়া, তাহার হৃদয়ভার লঘু করিয়া দিতেছিল। মহিমময়ী আপন মহিমাপ্রভায় গদাধরের অন্ধকার হৃদয় প্রভাসিত করিয়া তুলিতেছিল।

পিতৃমাতৃবিয়োগের তিন মাস পরে গদাধর, উমাকালী চক্রবর্ত্তী এবং কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে, এবং জ্ঞানদা বাবুর নিকট হইতে পুনঃ পুনঃ পত্র প্রাপ্ত হইয়া, কালীদহ গ্রামে দুই তিন দিন অবস্থিতি করিয়া, কলিকাতা রওনা হইল।

ছাদে দাঁড়াইয়া অম্বিকা দেখিল, গদাধরের নৌকা গদাধরকে সগৌরবে ক্রোড়ে করিয়া দক্ষিণাভিমুখে চলিয়াছে। তাহার মনে হইল, যেন তাহার প্রাণটা তাহার দেহ ছাড়িয়া গঙ্গার স্রোতে ভাসিতেছে। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ অম্বিকা সেই তরণীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর, সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া ছাদ হইতে নামিয়া আসিল।

গদাধর কলিকাতায় ফিরিয়া আবার পাঠে মনোনিবেশ করিল। সে চব্বিশ বৎসর বয়সে বি-এ পরীক্ষাতে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিল। পঁচিশ বৎসর বয়সে সে ইংরাজি ভাষায় এম-এ পরীক্ষা দিল। সেই বৎসর সি, ম্যানফিল্ড নামক একজন ইংরাজ প্রফেসর ইংরাজিতে এম-এ পরীক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু গদাধর তাঁহাকে পরাজিত করিয়া, প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। ইহাতে বাঙ্গালী-সমাজ মধ্যে একটা সুখ্যাতি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। সকলেই বলিল, "এমন ছেলে দেখা যায় না।"

ছাব্বিশ বৎসর বয়সে সে 'প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ' বৃত্তি গ্রহণ করিল। জ্ঞানদা বাবু গদাধরকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই বৃত্তির টাকা, আর আমার কাছে কর্জ্জ স্বরূপ ষোল হাজার টাকা নিয়ে, পার্ক ষ্ট্রীটে তোমার যে জমী আছে, তার উপর একটি বাড়ী তৈরি আরম্ভ করে' দাও।"

গদাধর ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিতে যাইলে, তিনি কহিলেন, "এ কথা তোমায় শুনতেই হবে; আমি তোমার কোন আপত্তি শুনব না। আমরা এতদিন তোমাকে যত্ন করে আদর করে মানুষ করলাম, আর তুমি আমাদের একটা তুচ্ছ অনুরোধ রক্ষা করবে না?"

সুতরাং পার্ক ষ্ট্রীটে গদাধরের জন্য গৃহনির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। আপাততঃ একতলা গৃহই প্রস্তুত হইল।

সাতাইশ বৎসর বয়সে, গদাধর বি-এল পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া, আলিপুরের আদালতে ওকালতি আরম্ভ করিয়া দিল। এবং জ্ঞানদা বাবুর নিকট বিদায় লইয়া, সে আপন বাটীতে আসিয়া বাস করিল। গৃহপ্রবেশের দিন জ্ঞানদা বাবুর স্ত্রী স্বয়ং নূতন বাটীতে উপস্থিত হইয়া উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন।

যখন ওকালতিতে গদাধরের একটু পসার হইল, যখন রূপচাঁদের চাকচিক্যে, লোকের নয়নে তাহার কৃষ্ণাবয়ব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখন তাহার প্রতি কন্যাভারাক্রান্ত পিতৃমাতৃগণের আকুল দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হইল। কন্যার অভিভাবকগণ ঘন ঘন

গদাধরের বাটীতে পদধূলি প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলকেই গদাধর অতি গম্ভীর মুখে এক উত্তর দিল, "মশায়, আপনার মেয়ের জন্যে অন্য পাত্র অনুসন্ধান করুন; আমার মত কালো পাত্রকে কোন মেয়েই পছন্দ করবে না; বিশেষতঃ অন্য এক পাত্রীর সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ পূর্ব্বেই স্থির হয়ে গিয়েছে।"

গদাধর কন্যাভারগ্রস্ত পিতৃগণকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য মিথ্যা কথা কহে নাই। সে ইতিপূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে, যদি অম্বিকার অমত না থাকে, তাহা হইলে, বিধিলিপিকে মিথ্যা করিয়া, সে তাহাকেই বিবাহ করিবে। সে এখনও এ বিষয় কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের নিকট বলিতে সাহস করে নাই। কিন্তু সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে, যদি বিবাহ করিতেই হয়, তাহা হইলে অম্বিকাকেই সে বিবাহ করিবে। হায়! মানুষে যাহা স্থির করে, বিধাতা কি তাহা সফল করিয়া দেন? ইচ্ছা করিবার সামর্থ্য মাত্র তিনি মানুষকে প্রদান করিয়াছেন, তাহা ফলবতী করিবার শক্তিকে, ইচ্ছাময় আপন ইচ্ছাধীন করিয়া রাখিয়াছেন। গদাধর ত জানিত না যে, তাহার বাসনা পূর্ণ হইবার নহে।

একদিন জ্ঞানদাবাবু গদাধরের বাটীতে বেড়াইতে আসিলেন। নানারূপ কথাবার্ত্তার পর তিনি গদাধরকে কহিলেন, "দেখ, তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলতে আমি ভুলে যাচ্ছিলাম।"

গদাধর। কি কথা?

জ্ঞানদা। তোমাদের গ্রামে একজন উমাকালী চক্রবর্ত্তী আছেন?

গদাধর। হ্যাঁ, তাঁকে আমি, 'চক্রবর্ত্তী কাকা' বলি। তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন।

জ্ঞানদা। তাঁর কাছ থেকে এক চিঠি নিয়ে একজন ঘটক আমার কাছে এসেছিল।

গদাধর। ঘটক?

জ্ঞানদা। তোমাদের গ্রামের কাছে কালীদহ বলে এক গ্রাম আছে?

গদাধর। আছে। আপনাকে বুঝি আগে বলিনি?

জ্ঞানদা। সেই গ্রামের একজন প্রধান লোকের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে, ঘটক ঠাকুরটি এসেছিলেন। আমি তাঁকে কাল আসতে বলেছি। কেমন? এ বিবাহে তোমার মত আছে ত? শুনলাম মেয়েটি খুব সুন্দরী, আর বয়স্থা।

গদাধর। মেয়ের বাপের নামটি কি?

জ্ঞানদা। নামটি ঠিক স্মরণ হচ্চে না। কি চট্টোপাধ্যায়।

গদাধর চিন্তিত হইল। চট্টোপাধ্যায়ের বয়স্থা সুন্দরী কন্যা? কে এ? জিজ্ঞাসা করিল, "চক্রবর্ত্তী কাকা এ বিবাহ সম্বন্ধে কি লিখেছেন?"

জ্ঞানদা। তিনি লিখেছেন যে, এ বিবাহে গদাধরের ভাল হবে। এতে, তোমার যাতে অমত না হয়, তা করবার জন্যে

আমাকে অনুরোধ করেছেন। তোমার অমত হবার ত আমি কোনও কারণ দেখি না। কেমন? রাজি ত?

গদাধর আবার চিন্তিত হইল। ভাবিল, "চক্রবর্ত্তী কাকা যখন এ রকম লিখেছেন, তখন নিশ্চিত তিনি মেয়ের বাপের কাছে পরিচিত। কিন্তু আমি জানি, তিনি কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মশায় ছাড়া, কালীদহ গ্রামের অন্য কোনও লোকের সঙ্গে পরিচিত নন। আর আমাকেও ত কালীদহের অন্য কোনও ব্যক্তি জানে না; না জেনে, না দেখে কেউ কি আপন মেয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়ে দেয়? আবার শুনলাম, কালীদহ গ্রামের তিনি প্রধান ব্যক্তি। আমি ত জানি যে, গ্রামের মধ্যে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মশায়ই সর্ব্বপ্রধান। তবে, এ মেয়ের বাপ, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মশায়! এ মেয়ে অম্বিকা! ধন্য আমি; আমি অম্বিকাকে সহধর্ম্মিণী পাব! ভগবান্, তোমার জয় হোক। কিন্তু, অম্বিকা ত আমাকে চিঠি লেখে, সে এ কথা আমাকে জানালে না কেন? লজ্জায় আপনার বিবাহের কথা কেমন করে জানাবে? ছি ছি! বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে কি আপনার বিবাহের কথা আপনার ভাবী স্বামীর কাছে প্রকাশ করতে পারে? তা, সে না জানাক্, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মশায় কেন আমাকে এ কথা লিখলেন না? বোধ হয় সেটা সামাজিক প্রথা নয়। ঘটক দিয়ে বিবাহের প্রস্তাব পাঠানই বোধ হয় সামাজিক প্রথা। তিনি বিজ্ঞ হয়ে কি করে' সামাজিক প্রথা লঙ্ঘন করবেন?"

গদাধরের মনোমধ্যে যখন উল্লিখিত চিন্তার ধারা প্রবাহিত

হইতেছিল, তখন জ্ঞানদাবাবু, তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, রাজি ত?"

গদাধর প্রফুল্ল মুখে কহিল, "হ্যাঁ, এ বিবাহে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।"

জ্ঞানদাবাবু কহিলেন, "নিশ্চয়?"

গদাধর কহিল, "নিশ্চয়।"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

মানদার বর।

মানদার বয়ঃক্রম ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল। সে বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আপনাকে একটি সুন্দরী তরুণী করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার ভাব দেখিয়া, তাহার পিতা-মাতারও মনে হইয়াছিল যে, না, এ মেয়েকে আর আইবুড় রাখা চলে না। তাঁহারা একটি কুলীন-চূড়ামণি জামাতার অন্বেষণে ঘটকগণকে দিকে দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

রত্নেশ্বরবাবুর জাজিম-তাকিয়া গড়গড়া-গুড়্‌গুড়িসমন্বিত, অম্বরি তামাকুর ধূম-সুবাসিত হুকাবৈঠকান্বিত বৈঠকখানা ঘরে একজন অর্দ্ধপক্ককেশ বিশৃঙ্খলবেশ কুলাচার্য্য সমাগত হইয়া রত্নেশ্বরবাবুকে অভিবাদন করিলেন। রত্নেশ্বরবাবু কহিলেন, "কি ঘটক ঠাকুর, তোমার খবর কি?"

ঘটক। খবর ভাল।

রত্নেশ্বর। কোনও খানে, কোনও সৎপাত্রের অনুসন্ধান পেলে কি?

ঘটক। আজ্ঞে, একটি উত্তম সুপাত্র পাওয়া গিয়েছে।

রত্নেশ্বর। কোথায়?

ঘটক। এই গ্রামের দক্ষিণে নাড়িচা বলে’ এক পল্লীগ্রাম আছে।

রত্নেশ্বর। হ্যাঁ, নাড়িচা; গত বৎসর ‘রেভিনিউ সেলে’, আমি এই মহালটা কিনেছি।

ঘটক। তা হলে, নাড়িচা আপনারই সম্পত্তি; আমি পূর্ব্বে তা অবগত ছিলাম না।

রত্নেশ্বর। হ্যাঁ, নাড়িচা আপাততঃ আমারই সম্পত্তি বটে।

ঘটক। এই নাড়িচা গ্রামে, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বলে’ এক ব্যক্তি বাস করতেন।

রত্নেশ্বর। কুলীন?

ঘটক। আজ্ঞে হা, শ্রেষ্ঠ কুলীন; আপনাদেরই পাল্‌টি ঘর। যজ্ঞেশ্বর পণ্ডিতের সন্তান।

রত্নেশ্বর। ক’ পুরুষে? আমরা চার পুরুষে। এর সমান বা এর চেয়ে উচ্চ হওয়া চাই। আমি নেমে কন্যাদান করব না। আমাদের বংশে এ রকম কার্য্য কেউই করেন নি।

ঘটক। আজ্ঞে না, আপনাকে তা করতে হবে না। পাত্র স্বকৃতভঙ্গের পুত্র। ঐ গ্রামেরই বিরূপাক্ষ গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করে’, পাত্রের পিতা মধুসূদন মুখোপাধ্যায় কুলভঙ্গ করেছিলেন।

রত্নেশ্বর। এ রকম জামাই পাওয়া গৌরবের কথা বটে। দেখ ঘটক ঠাকুর, এ পাত্রটি হাত ছাড়া করা হবে না। পাত্র দেখতে কেমন?

ঘটক। দেখুন, আমার ইচ্ছা যে আপনি পাত্রটিকে একবার নিজ চক্ষে দেখে আসেন।

রত্নেশ্বর। তুমি এটা পাগলের মত কথা বল্লে। কালীদহের জমীদার, পাত্রের দ্বারস্থ হতে পারে না। এটা আমাদের কুলপ্রথা নয়।

ঘটক। আজ্ঞে, আমাকে ক্ষমা করবেন; আমি না জেনে ওরকম কথা বলেছি। তা, আমি আপনার কাছে সত্য কথা বলব। পাত্রটি দেখতে দিব্য; হৃষ্টপুষ্ট; তবে শ্যামবর্ণ।

রত্নেশ্বর। তা' শ্যামবর্ণ হোক। শ্যামবর্ণে কিছু ক্ষতি নেই। আমার পিসে মশায়ও শ্যামবর্ণ ছিলেন; কিন্তু তাঁর মত সুপুরুষ ত আমরা দেখি নি। পাত্রের বয়স কত?

ঘটক। আমি তার কোষ্ঠী দেখেছি। আগামী বৈশাখ মাসে তার ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হবে।

রত্নেশ্বর। বয়সটা একটু বেশী। তা' হোক্। আমার মেয়েও ডাগর হয়েছে। পাত্রটি কি করে?

ঘটক। পাত্রটি এম্-এ, বি-এল;—আলিপুর জজ আদালতের উকিল। এই অল্প বয়সেই বিলক্ষণ পসার প্রতিপত্তি হয়েছে।

রত্নেশ্বর। বেশ। কিন্তু বিবাহের পর আমি আর তাকে ওকালতি করতে দেব না; এখানে এনে আমার সমস্ত জমীদারীর ম্যানেজার করে' দেব।

ঘটক। সে আপনি যা অভিপ্রায় করবেন, তাই হবে।

পাত্রের অপর অভিভাবক কেউ নেই ; গ্রামে ঘর বাড়ীও তেমন নেই। সে এখানেই থাকবে। আপনিই তার অভিভাবক হবেন, আর আপনি যা অনুমতি করবেন, সে তাই করবে।

রত্নেশ্বর। তোমার কাছে যা শুনলাম, তাতে পাত্রটিকে সকল বিষয়েই মনোমত ধলে বোধ হচ্চে। তবু, এ বিষয়ে আমি একবার ওপাড়ার কৃষ্ণ দাদার সঙ্গে পরামর্শ করি। তুমি কি তাঁকে চেন? তিনি আমাদের সগোত্র, আর দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় ; তাঁর মত বিচক্ষণ লোক দশ খানা গ্রামে খুঁজে পাওয়া যায় না।

ঘটক। আপনি কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মশায়ের কথা বলছেন ত? আমি তাঁর নাম শুনেছি।

রত্নেশ্বর। আমি তাঁকে ডাকবার জন্যে লোক পাঠাচ্চি। তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে' তোমাকে একবারে পাকা কথা দেব।

ঘটক ঠাকুর বাহিরে আসিয়া, গুড়ুক সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। অত বড় একটা মান্য জমীদারের সম্মুখে তামাকু সেবন করা ধৃষ্টতা হইবে মনে করিয়া, তিনি বাহিরে আসিয়াছিলেন। তামাক খাইতে খাইতে, ঘটক বিদায়ের চিত্রটা তিনি মনোমধ্যে অত্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া লইতেছিলেন। তামাকু খাইয়া, মস্তিষ্কটাকে কিঞ্চিৎ সজীব করিয়া, ঘটকঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে আবার প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় তথায় সমাগত হইয়াছেন। তাঁহার মুখ দেখিয়া ঘটক ঠাকুরের মনের মধ্যে একটু ভয় হইল। মনে হইল, তাঁহার এত কষ্টের যোগাড়টা

বুড়ো বুঝি, একটি কথার বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া দিবে। অতএব তাঁহার মন ভিজাইবার উদ্দেশ্যে তিনি কহিলেন, "আহা মশায়কে দেখে আমার চক্ষু সার্থক হল। পূর্ব্বে লোকমুখে মশায়ের জগদ্-ব্যাপী নাম শুনেছিলাম।"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় হাত নাড়িয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্।" ঘটকের বচন-বিন্যাস আরম্ভেই সমাপ্ত হইয়া গেল। সে "থাক্-থাকে"র পর অতি বড় বাগ্মীও নির্ব্বাক্ হইয়া যাইত।

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ঘটক ?"

ঘটক। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই ঘটক।

কৃষ্ণ। যে পাত্র তুমি স্থির করেছ, তার নাম কি ?

ঘটক। গদাধর।

কৃষ্ণ। গদাধর মুখোপাধ্যায় ?

ঘটক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কৃষ্ণ। মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র ?

ঘটক। আজ্ঞে।

কৃষ্ণ। নাড়িচায় বাড়ী ?

ঘটক। আজ্ঞে। দেখছি, আপনি সকলই জানেন।

কৃষ্ণ। হ্যাঁ, গদাধর আমার সম্পূর্ণ পরিচিত। রত্নেশ্বরবাবু, তুমি এর চেয়ে সুপাত্র সমস্ত বাঙ্গালা দেশে আর পাবে না। তুমি এ সম্বন্ধে আমার পরামর্শ নেবার জন্যে আমাকে ডেকেছিলে; আমার সৎ পরামর্শ গ্রহণ কর, এই পাত্রের সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহ দাও, সে চিরসুখিনী হবে।

ঘটক ঠাকুর হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। বুঝিলেন যে, ঘটক-বিদায় সম্বন্ধে আর কোনও গোলযোগ রহিল না।

রত্নেশ্বরবাবু কহিলেন, "শোন ঠাকুর, আমি পূর্ব্বেই স্থির করেছিলাম যে, এই শ্রেষ্ঠ কুলীন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেব। এখন কৃষ্ণ দাদাও বলছেন যে, এমন সুপাত্র আর নেই। কুলে শীলে বিদ্যায় এ পাত্র উৎকৃষ্ট হয়েছে। আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন আগামী বৈশাখ মাসেই বিবাহ দেওয়া স্থির রইল।

অন্দর মহলে সংবাদ গেল যে, শ্রীমতী মানদা দেবীর ফুল ফুটিয়াছে, বর মিলিয়াছে; বর এম-এ পাশ-করা এবং তাহার চেহারাটা ঠিক রাজপুত্রের মত। বুড়া মুলী, মানদার গাল টিপিয়া কহিল, "ওলো, আমাদের যেন ভুলিস নে। রাঙ্গা বর পেয়ে, যেন বলিস্ নে, ও মাগী কোথাকার ?"

মানদা হাসিতে ঠোঁট ফুলাইয়া, নয়নের তারা ঘুরাইয়া, মাটীতে অঞ্চল লুটাইয়া, ছুটিয়া পলাইয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "যাঃ।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ঘটকের বিপদ।

বিবাহের ছয় দিন পূর্ব্বে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় গদাধরকে পত্র লিখিলেন—"আমরা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য যাইব। আমরা চার পাঁচ জন মাত্র যাইব; তুমি আহারাদির কিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত রাখিও।"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের পত্রখানি স্বয়ং ঘটক ঠাকুর গদাধরের নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন। পত্র পাঠ করিয়া গদাধর যখন আনন্দে অধীর হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বরকে আরও একটু আনন্দিত করিয়া বরপক্ষের ঘটকবিদায়ের পরিমাণটা বৃদ্ধি করিবার মানসে, ঘটক ঠাকুর কহিলেন, "যদিচ চিঠিতে সে কথা লেখা নেই, কিন্তু আমি যতদূর জানি, তাতে বোধ হয়, গৃহিণীর অনুরোধে, স্বয়ং রত্নেশ্বর বাবু, আপনাকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন।"

গদা। রত্নেশ্বর বাবু কে?

ঘটক। হাঃ হাঃ হাঃ;—এ যে আপনি হাস্যরসের অবতারণা করলেন, দেখছি। সাতখণ্ড রামায়ণের পর, সীতা কার বনিতা?

গদা। আমি রত্নেশ্বরবাবুর নাম ইতিপূর্ব্বে কখন শুনেছি বলে মনে হয় না।

ঘটক। ক্রমে শুনবেন ; ক্রমে ঐ নাম জপমালা হয়ে দাঁড়াবে। শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনং।

গদা। কে এ রত্নেশ্বরবাবু ?

ঘটক। যে পরমা সুন্দরীকে আপনি পত্নীরূপে লাভ করবেন, রত্নেশ্বর বাবু তাঁরই জনক। রত্নেশ্বর বাবু লক্ষপতি, কালীদহ গ্রামের জমীদার। আপনি কন্যার পিতার নাম পূর্ব্বেই জানতে পারেন নি এ বড়ই আশ্চর্য্যের কথা। সম্বন্ধ স্থিরের সময়, আমি ত সকল কথাই জ্ঞানদাবাবুকে বলে' গিয়েছিলাম।

গদাধর। আপনি যে মেয়ের সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির করছেন, তার নাম কি ?

ঘটক। তার নাম, শ্রীমতী মানদাসুন্দরী দেবী।

গদাধর। সর্ব্বনাশ!

ঘটক। সর্ব্বনাশ কিসে ? এ নামটি ত দিব্য মনোহর নাম, আর এ যদি আপনার পছন্দ না হয়, নামটা পাল্টে…।

গদাধর। আপনি কোন রকম এ বিবাহ রহিত করতে পারেন ?

ঘটক। আপনি এ কি কথা বলছেন ?

গদাধর। আমি যা জিজ্ঞাসা করছি, তার উত্তর দিন। বাজে কথা শোনবার এখন আমার অবসর নেই।

ঘটক। এ বিবাহ কোন ক্রমে রহিত হতে পারে না। রত্নেশ্বর বাবু এ কথা শুনলে পৃথিবী তোলপাড় করবেন।

গদাধর। আপনি তাঁকে বুঝিয়ে বলবেন যে, একটা ভ্রমে

পড়ে আমি এ বিবাহে সম্মত হয়েছিলাম, এ বিবাহে তাঁর কন্যা সুখী হবে না। আমি আপনাকে বিলক্ষণ পুরস্কার দেবো, আপনি এ বিবাহ স্থগিত করে' দিন।

ঘটক ঠাকুর একটু মুস্কিলে পড়িলেন। রত্নেশ্বরবাবুর নিকট হইতে তিনি যে ঘটক বিদায় পাইয়াছিলেন, এখনও তাহা তিনি পরিপাক করিতে পারেন নাই। সম্মুখে আবার নূতন পুরস্কার উপস্থিত। আবার এ নূতন পুরস্কারটি 'বিলক্ষণ' বিশেষণযুক্ত—তিনি কি করিবেন? হস্তগত পুরস্কারটা ত্যাগ করা তাঁহাদের কুলপ্রথা নহে। কিন্তু এ বিলক্ষণ পুরস্কারটা হজম করাও সহজ নহে। রত্নেশ্বরবাবু যখন রোষকষায়িতলোচনে তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন, তখন তিনি হরকোপানলদগ্ধ মদনের মত পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবেন। হায় হায়! তিনি এ দুর্ব্বিপাক হইতে কিরূপে মুক্তি লাভ করিবেন? কিন্তু তাঁহার চিন্তা করিবারও আর অবসর হইল না। গদাধর বাক্স হইতে পাঁচ খণ্ড এক শ' টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, "আপাততঃ আমি আপনাকে এই পাঁচ শ' টাকা দিচ্চি, নিন।"

ঘটক। অ্যাঁ, পাঁচ শ-অ-টাকা?

গদাধর। হ্যাঁ, আপাততঃ পাঁচ শ' টাকা দিলাম; কিন্তু আপনি যদি এ বিবাহ স্থগিত করতে পারেন, তা হলে আরও পাঁচ শ' টাকা দেবো।

ঘটক। হাজার টাকা পেলে, চন্দ্র সূর্য্যের গতি আমি রহিত করে দিতে পারি; পূর্ব্বের সূর্য্যকে পশ্চিমে ওঠাতে পারি।

গদাধর। সে সব কিছু করতে হবে না। কেবলমাত্র এই বিবাহটা বন্ধ করে' দিন। এ বিবাহে কারও মঙ্গল হবে না; তা' না হলে, আমি কথা দেবার পর এ বিবাহ ভঙ্গ করতে চেষ্টা করতাম না।

ঘটক। নাঃ, জগতের মঙ্গলের জন্যে এ বিবাহ ভঙ্গ হওয়াই উচিত। আমি আজই এর উদ্যোগ করব।

গদাধর। বেশ। তা হলে, আপনি এখন যেতে পারেন।

ঘটক। দেখুন!

গদাধর। কি?

ঘটক। এই নোটগুলো বাজারে ভাঙ্গাতে গেলে, লোকে ত বলবে না যে, এগুলো জাল নোট?

সেই মহাবিপদের সময়ও গদাধরের মুখে হাসি আসিল কহিল, "তা, লোকে কি বলবে, তা আমি কি করে' বলব?"

ঘটক। দেখুন, জাল নোট বা চোরাই নোট ভাঙ্গাতে আমার বড় ভয় হয়। তার চেয়ে, আমাকে আপনি নগদ টাকা দিন।

গদাধর ভৃত্যকে ডাকিয়া বাজার হইতে নোটের পরিবর্ত্তে টাকা আনাইয়া ঘটককে গণিয়া দিল। ঘটক ঠাকুর আপনার কচ্ছ উন্মোচন করিয়া, তাহাতে টাকাগুলি উত্তম রূপে বাঁধিয়া ফেলিলেন। এবং পশ্চাদ্দেশে মুদ্রার গুরুভার দোলাইয়া, জ্ঞানদা-বাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহাকে দেখিয়া, জ্ঞানদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঘটক ঠাকুর! তোমার খবর কি?"

ঘটক। খবর ভাল নয়।

জ্ঞানদাবাবু। ব্যাপার কি?

ঘটক। আপনাদের গদাধর বাবুর রাক্ষস গণ।

জ্ঞানদা। কে বল্লে?

ঘটক। কে বল্লে কি? আমি স্বচক্ষে কোষ্ঠী দেখেছি; তাতে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে যে, গদাধর বাবুর রাক্ষস গণ।

জ্ঞানদা। তাতে ক্ষতি কি?

ঘটক। বর পক্ষের ক্ষতি নেই বটে, কিন্তু কন্যা পক্ষের ক্ষতি অতি ভয়ঙ্কর! কন্যা যদি নর গণ হয়, আর বর যদি রাক্ষস গণ হয়, তা হলে রাক্ষস বর, নর কন্যাকে খেয়ে ফেলে।

জ্ঞানদা। তা হলে, এখন কি করা কর্ত্তব্য?

ঘটক। এ বিবাহ রহিত করাই উচিত।

জ্ঞানদা। গদাধর কি এতে সম্মত হবে?

ঘটক। তাঁকে এখনই একটা চিঠি লিখে, তাঁর মনোগত ভাব জানতে পারলে ভাল হয়।

জ্ঞানদাবাবু পত্র লিখিয়া গদাধরের নিকট ভৃত্য পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্য চলিয়া গেলে, তিনি ঘটকঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কোমরে একটা উঁচু জিনিষ কি দেখছি?"

ঠাকুর প্রমাদ গণিলেন। মনে মনে মধুসূদনকে ডাকিয়া, মুখটা একটু বিকৃত করিয়া কহিলেন, "ওটা মশায় একটা বিস্ফোটক; কয়েক দিন হতে বড়ই কষ্ট পাচ্চি।"

"কই, দেখি?"

সর্ব্বনাশ! তিনি কিরূপে সেই বিলক্ষণ পুরস্কারের গুরু পুটলিটি জ্ঞানদাবাবুকে দেখাইবেন? তিনি কহিলেন, "এ ঘৃণ্য বস্তুটা মশাইকে দেখাবার নয়। আমি এখন বাইরে যাই।" এই বলিয়া কচ্ছদেশে টাকার পুটলি দোলাইয়া তিনি দ্রুতগতি গৃহের বাহিরে আসিলেন।

প্রায় অর্দ্ধপ্রহর পরে ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া গদাধরের পত্র জ্ঞানদাবাবুর হাতে দিল। সে পত্রে এইরূপ লিখিত ছিল;—

"মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি একটা ভ্রমবশতঃ এ বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলাম। এক্ষণে বেশ বুঝিতেছি, এ বিবাহ ঘটিলে বিশেষ অমঙ্গল উপস্থিত হইবে। মহাশয় পত্রের সহিত ঘটককে অদ্যই কালীদহ গ্রামে পাঠাইয়া যদি এ বিবাহ স্থগিত করিতে পারেন, তাহা হইলে, উভয় পক্ষেরই বিশেষ মঙ্গল হয়। আমার ভরসা হয়, আপনি পত্র লিখিলে এ বিষয়ে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব। আমার প্রতি দয়া করিয়া আপনি অদ্যই পত্রখানি পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন; নতুবা, আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য তাঁহারা আগামী কল্যই আসিয়া পড়িবেন।"

গদাধরের অভিপ্রায়মত একখানি পত্র লিখিয়া, দ্রুতগামী নৌকার জন্য অতিরিক্ত পাথেয় দিয়া, তিনি ঘটকঠাকুরকে বিদায় করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সে পত্র কখনই কালীদহ গ্রামে পৌঁছিল না।

পথে, তাঁহার সেই দোদুল্যমান, দুম্বা-নামক মেষের পুচ্ছের

ন্যায়, কচ্ছের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, এক বুদ্ধিমান্ পাহারাওয়ালা তাঁহার ক্ষীণ মণিবন্ধ বিশেষরূপে কবলিত করিয়া ফেলিল। তাহার মধুচক্রের মত, শ্মশ্রুসমন্বিত মুখ নাড়িয়া, এবং সমীর-সেবিত কোকনদের মত তাহার লাল পাগ্ড়িটি দোলাইয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "এ বামুন! তোর কাছায় কি?"

ঘটক অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, "কৈ? কিছুই ত নয়; ওঃ! ও একটা, বুঝলে, ফোড়া হয়েছে।"

পাপিষ্ঠ পাহারাওয়ালা ব্রাহ্মণের এই সরল উক্তিটি, সত্যের অপলাপ বলিয়া বিবেচনা করিল এবং তাহার নির্দ্দয় রুলের সবল প্রক্ষেপে ফোড়াটা উত্তমরূপে বিদীর্ণ করিয়া দিল। তাহা বিদীর্ণ হইয়া, রাজপথে রজতমুদ্রা সকল বর্ষণ করিল। সহসা লোকারণ্যে সে স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। তাহার পর যাহা ঘটিল, তাহা তোমরা আপন কল্পনা-বলে অনুমান করিয়া লও। গল্পের কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় আমি তাহা বিবৃত করিব না।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিবাহের আশীর্ব্বাদ।

পরদিন প্রত্যূষে জ্ঞানদাবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া, গদাধর কতকটা নিশ্চিন্ত মনে আপন বাটীতে বসিয়া ছিল। পূর্ব্বদিন ঘটনাপটলের যে ঘন অভ্রমালা তাহার হৃদয়াকাশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা রঙ্গমঞ্চের কৃষ্ণ যবনিকার ন্যায় ধীরে ধীরে তিরোহিত হইতেছিল। তাহার মেঘনির্ম্মুক্ত মনটি এক প্রভাময়ীর মধুর স্মৃতিপ্রভায়, জ্যোৎস্নালোকিত শরদম্বরের ন্যায় প্রভাসিত হইয়া উঠিতেছিল।

ফটকের ভিতর দুইখানি গাড়ী প্রবেশ করিতে দেখিয়া, গদাধর সহসা বিচলিত হইয়া উঠিল। এ অসময়ে, তাহার বাটীতে কে আসিল? ইহাঁরা কি কালীদহের লোক? জ্ঞানদাবাবুর পত্র পাইবার পরও কালীদহ হইতে লোক আসিল কেন? ঘটক-ঠাকুরের কৌশল কি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে?

গদাধর পাঁচটি অপরিচিত লোককে গৃহমধ্যে লইয়া বসাইল। তাঁহাদের মধ্যে একজন কহিলেন, "আমরা কালীদহ থেকে এসেছি। আমার নাম রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।" তাঁহাদের মধ্যে অপর একটি হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতের দ্বারা গদাধরকে জানাইল, "প্রণাম কর।"

রত্নেশ্বর। তোমার নামটি কি?

গদাধর। আমার নাম গদাধর।

রত্নেশ্বর। তোমারই নাম গদাধর, তোমারই সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ স্থির হয়েছে? ঘটকটি আমাদের সঙ্গে না আসায়, আমাদের কিছু অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। তা ছাড়া, কৃষ্ণবিহারী চট্টোপাধ্যায়—আমার কৃষ্ণদাদা,—যিনি তোমাকে জানেন, তিনি গ্রামের একটি দলাদলির ব্যাপারে পড়ে আসতে পারেন নি।

গদাধর। কাল জ্ঞানদাবাবু ঘটকের হাতে আপনাকে যে পত্র পাঠিয়েছিলেন, তা কি আপনি পান নি?

রত্নেশ্বর। কেমন করে' পাব? তার সঙ্গে মোটে আমার সাক্ষাৎই হয় নি। এখানে চিঠি দিয়ে, কালই তার কালীদহে যাবার কথা ছিল। আমরা মনে করেছিলাম, তাকে আজ আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসব। কিন্তু তার ত দেখা পাওয়া গেল না।

গদাধর। তিনি কোথায় গেলেন?

রত্নেশ্বর। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, এ কথার উত্তর তোমার কাছেই জানতে পারব।

গদাধর। না, আমি তা কিছুই জানিনে।

রত্নেশ্বর। সে যা হোক, যখন এসে পৌঁছেয়েছি, তখন তাকে আর আমাদের আবশ্যক হবে না। এখন তুমি ধান দূর্ব্বা চন্দনের যোগাড় কর; শুভলগ্নে কার্য্যটা করা যাক।

গদাধর। এ সম্বন্ধে, জ্ঞানদাবাবু আপনাদের কিছু বলবেন।

তাঁকে আসবার জন্যে চিঠি লিখে আমি লোক পাঠাচ্চি। ততক্ষণ মশায়েরা স্নান আহার করলে আমি কৃতার্থ হব।

রত্নেশ্বর। গঙ্গার ঘাটে, ভাউলেতে আমাদের আহার প্রস্তুত হচ্চে, আমরা শুভকার্য্য সম্পন্ন করে' সেখানে গিয়েই আহার করব।

গদাধর। তা কোন ক্রমেই হতে পারে না; আপনাদিকে আহারাদি না করিয়ে আমি ছেড়ে দিতে পারিনে।

রত্নেশ্বর। তা' আশীর্ব্বাদের পর যা হয়, হবে। তার পূর্ব্বে আমরা তোমার বাটীতে জলবিন্দুও গ্রহণ করতে পারিনে।

গদাধর এ কথার কিছু উত্তর দিতে পারিল না। সে কি উত্তর দিবে? নিদারুণ নিরাশার হাতে সে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিল। জ্ঞানদাবাবু আসিয়া কি তাহাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন? সে পত্র লিখিয়া জ্ঞানদা বাবুর নিকট লোক পাঠাইল। যাইবার সময় তাহাকে বলিয়া দিল, "হেঁটে যেও না, রাস্তায় একটা গাড়ী ভাড়া করে নিও।"

রত্নেশ্বর বাবু বিছানার উপর, তাকিয়া হেলান দিয়া, চিন্তিত হইয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন। গদাধরকে যতদিন তিনি আপন চক্ষে নিরীক্ষণ করেন নাই, ততদিন কল্পনার বলে, ভাবী জামাতার একটি চিত্র মনোমধ্যে আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে গদাধরকে স্বচক্ষে অবলোকন করিবামাত্র তাঁহার মানস-চিত্রখানা যেন একটা বজ্রাঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল। এই কৃষ্ণ কর্কশ অবয়বকে তাঁহার ললিত লাবণ্যময়ী, নবনীবিগঠিতা কন্যা কিরূপে স্বামিরূপে বরণ

করিবে? এই দৈত্যনিসূদন বিকট মূর্ত্তিকে তিনি কিরূপে জামাতার উচ্চাসনে উপবেশন করাইবেন? হায় হায়! দুষ্ট ঘটকটা এ মসীনিন্দিত বর্ণকে কিরূপে শ্যামবর্ণ কহিল? এ বিবাহ কি কোনরূপে রহিত করিতে পারা যায় না? ও হরি! রত্নেশ্বর-বাবুও যে, এ বিবাহ রহিত করিতে চা'ন! তবে কি প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ মিথ্যা হইবে? তবে কি মানদার সহিত গদাধরের বিবাহ হইবে না?

জ্ঞানদাবাবু আসিলেন। পরস্পর পরস্পরের নিকট পরিচিত হইলেন। জ্ঞানদাবাবু সামান্য বেশে আসিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাকে দেখিয়া রত্নেশ্বরবাবু বুঝিলেন যে, 'হাঁ, ইনি আমার অপেক্ষা অনেক বড় জমীদার বটেন।' জ্ঞানদাবাবুকে সম্বোধন করিয়া, রত্নেশ্বর বাবুর এক সহচর কহিলেন, "মশায়ের আগমন অপেক্ষায়, আমরা এ পর্য্যন্ত শুভাশীর্ব্বাদ কার্য্য সম্পন্ন করতে পারি নি। এখন মশায় এসেছেন, বারবেলা পড়বার পূর্ব্বেই আশীর্ব্বাদ-কার্য্য সম্পন্ন করা যাক।"

জ্ঞানদা। আশীর্ব্বাদ হবার পূর্ব্বে আমার কিছু নিবেদন আছে।

সহচর। অবশ্য অবশ্য, আপনার যা বলবার আছে, তা বলবেন বৈকি।

জ্ঞানদা। আমি রত্নেশ্বরবাবুকে যে চিঠি লিখেছিলাম, শুনলাম তা ইনি পান নি। তা পেলে, আমাকে আর কোনও কথাই বলতে হত না।

রত্নেশ্বর। সে চিঠিতে আপনি কি লিখেছিলেন?

জ্ঞানদা। এই বিবাহ রহিত করবার জন্যে সেই চিঠিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম।

সহচর। বিবাহ রহিত?

রত্নেশ্বর। তুমি থাম।

সহচর। থামব কেন? এ বিবাহ কোনও ক্রমে রহিত হতে পারে না। আমাদের ও অঞ্চলে আমাদের বাবুর অতুল সম্মান। ইনি পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করতে এসে, আশীর্ব্বাদ না করে' যদি ফিরে যান, তা হলে এঁর সম্মান কি করে' রক্ষা পাবে? লোকে কি বলবে?

রত্নেশ্বর। আহা আহা! আমার কিছু কথা ছিল; তুমি চুপ কর; আমি বলব।

সহচর। এতে চুপ করবার কি আছে? আমিই বলব। আপনার ভয়ানক চক্ষুলজ্জা। চক্ষুলজ্জার খাতিরে, আপনি সকল কথা বলতে পারবেন না। এখন এ বিবাহ কোন ক্রমেই রহিত হতে পারে না। আজ আপনি পাত্রকে আশীর্ব্বাদ না করে' যদি ফিরে যান, তা হলে মানদার বিবাহ হওয়া দুষ্কর হবে।

জ্ঞানদা। আমার সকল কথা বলা হয়নি। সকল কথা শুনে, আপনাদের যা ভাল বলে' বিবেচনা হবে, তাই করবেন। আমি ঘটক ঠাকুরের কাছে শুনলাম যে, আপনাদের কন্যার নর গণ।

রত্নেশ্বর। হ্যাঁ, তার নর গণ বটে। পাত্রের কি গণ?

জ্ঞানদা। রাক্ষস গণ।

রত্নেশ্বর। রাক্ষস গণ? সর্ব্বনাশ! তা হলে, কি রকম করে' বিবাহ হবে? জেনেশুনে মেয়েকে কি করে' রাক্ষসের হাতে সমর্পণ কবব? দু দিনেই যে খেয়ে ফেলবে!

জ্ঞানদা। এই জন্যে এবং অন্যান্য কারণে আমরা স্থির করেছিলাম যে, এ বিবাহ স্থগিত করাই মঙ্গলজনক। এ বিবাহে পাত্রের কিছুমাত্র মত নেই জানবেন।

সহচর। দেখছি, আমাদিকে অপমান করাই আপনাদের উদ্দেশ্য। যদি এ বিবাহে পাত্রের মত নেই, তবে আমাদিকে প্রথমে জানালেই হত; আমরা আশীর্ব্বাদ করতে আসতাম না। যখন আমরা আশীর্ব্বাদ করতে এসেছি, তখন আশীর্ব্বাদ না করে' যাব না। পাত্রের রাক্ষস গণে এসে যায় না, ও একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলেই কেটে যাবে।

গদাধর। এ বিবাহে আপনাদের কন্যা সুখী হবে না।

সহচর। বাপু হে, পাত্রীর সুখের ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে না। সে ব্যবস্থা আমাদের বাবুই করবেন। বাবুর অগাধ সম্পত্তি, আর বংশের মধ্যে ঐ একমাত্র কন্যা, বুঝেছ? আরও শোন, এখন তুমি এ বিবাহে অসম্মত হতে পার না;—তা হলে, একটা উচ্চ বংশের মুখে 'কালী' দেওয়া হবে। কন্যার অন্য বিবাহ দেওয়া দায় হইবে। তুমি আইন পড়েছ; আমরাও আইনের মর্ম্ম কিছু কিছু বুঝে থাকি। বল দেখি, বিবাহ করতে ধর্ম্মতঃ সম্মত হয়ে, এখন আশীর্ব্বাদের সময় পশ্চাৎপদ হওয়া নিতান্ত বেআইনি কায কি না?

সহচরের বাগ্‌বিতণ্ডায় ভীরুস্বভাব রত্নেশ্বরবাবু বিলক্ষণ কাবু হইয়া পড়িলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও, আশীর্ব্বাদ কার্য্য সত্বর সম্পন্ন করিবার জন্য বাক্যবিতাড়িত হইয়া, তিনি জ্ঞানদা-বাবুকে পীড়াপীড়ি করিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া, গদাধরও ইহাতে সম্মত হইতে বাধ্য হইল।

ধান, দূর্ব্বা ও দশ খান মোহর দিয়া, রত্নেশ্বরবাবু গদাধরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গাত্রহরিদ্রা।

মানদার গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে, গ্রাম্য মহিলাগণ রত্নেশ্বরবাবুর অন্তঃপুর মধ্যে সমবেত হইয়াছিলেন। সমবেত মহিলাগণের মধ্যে কতকগুলি নবীনা, ঠানদিদি নামধেয়া রজতকুন্তলা স্খলিতাঞ্চলা বর্ষিয়সীগণের সহিত কল-কল-নিনাদে বহুবিধ সুগভীর সমালোচনায় ব্যাপৃতা ছিলেন। কেহ কল্পনা-বলে বরের মোহনমূর্ত্তি গড়িয়া শিখিবাহন ষড়াননের সহিত তাহার তুলনা করিতেছিলেন। কোন গণিত-বিদ্যাবতী আপন চম্পকমুকুলবিনিন্দিত মণিমণ্ডিত করাঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া স্থির করিতেছিলেন যে মানদার বিবাহ হইতে আর দুই দিনমাত্র বাকী আছে। কোন প্রাজ্ঞা, প্রভাকরকরস্নাত মুখখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া, কুঞ্চিত ললাটতলকে চিন্তিত করিয়া, অনুমান করিতেছিলেন যে, বেলা দ্বিপ্রহর হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, এতক্ষণে বরের পদস্পর্শপূত, স্নেহসিক্ত হরিদ্রাচূর্ণ লইয়া, নরসুন্দর নরপুঙ্গবের শুভাগমন করা কর্ত্তব্য ছিল।

নবীনাগণের মধ্যে বিমলা নাম্নী এক প্রফুল্লমুখী, হারুঠান্‌দিদি নাম্নী এক মিশিমসীমুখীকে প্রশ্ন করিলেন, "শুনেছ ত?"

হারুঠান্‌দিদি মিশিমসীময় দন্তগুলি বিকশিত ও আলোড়িত করিয়া কহিলেন, "কি লো?"

বিমলা। বর বড় পণ্ডিত; এম্-এ, পাশ করা; উকিল।

হারু। তাইত বোন, এবার বাসর ঘরে আমরা কি কথা কইতে পারব?

বিমলা। কি হবে ঠান্‌দিদি? তোমরা এর একটা যুক্তি কর। বর বাড়ী ফিরে যদি বলে যে, কালীদহের মেয়েগুলো সব মূর্খ, তা হলে লজ্জায় মরে যাব।

হারু। ইস্, তা' আর বল্‌তে হয় না! তোমরা এক কায কর। একটু চেষ্টা করে' অম্বিকাকে বাসর ঘরে নিয়ে এস। বি-এ পাশই করুক, আর এম্-এ পাঁশই করুক, শুনেছি অম্বিকার মত বিদ্বান্ কেউই নেই।

বিমলা। ঠিক বলেছ, আমরা অম্বিকাকেই ডেকে আনব। আমরা পাঁচ জনে ডাকলে সে নিশ্চয় আসবে।

হারু। সে এই বাড়ীতেই আছে। তাকে ডেকে আজই কথাটা পাকাপাকি করে নাও।

বিমলা। বেশ বলেছ।

বিমলা অম্বিকার সন্ধানে গেল। ইতিপূর্ব্বেই রত্নময়ীর আহ্বানে, অম্বিকা তথায় আগমন করিয়াছিল। রত্নময়ীকে সে 'খুড়িমা' বলিয়া সম্বোধন করিত। সে খুড়িমার সহিত রন্ধনকার্য্য পরিদর্শন করিতেছিল। কার্য্যে তাহার আশ্চর্য্য পারদর্শিতা গ্রামের স্ত্রীলোকগণের অবিদিত ছিল না। অনেক পাকপরিপক্কহস্তা প্রবীণা নূতন ব্যঞ্জন রন্ধন সম্বন্ধে অকুণ্ঠচিত্তে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিতেছিলেন। বিমলা তাহাকে গিয়া ধরিল; কহিল, "ভাই, তুমি নইলে আমাদের

স্নান রক্ষা হবে না ; তুমি কোনও বাসরে কখনও যাওনি, কিন্তু মানদার বাসরে তোমাকে আসতেই হবে।”

অম্বিকা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিল যে, পরিণীতা নববধূর পার্শ্বে সমাসীন প্রফুল্লমুখ গদাধরকে যে কোন উপায়ে দেখিয়া সে আপনার জীবন সার্থক করিবে। এক্ষণে দেখিল যে, বিধাতা স্বয়ং তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করিবার উপায় করিয়া দিতেছেন। সে বিমলাকে বলিল, “এ বাসরে গদাধর বর ; আমার আসতে কোনও বাধা নেই ; বাবাও বোধ হয় নিষেধ করবেন না।”

বিমলা। তুমি কি বরকে চেন ? বরের নামটি তবে গদাধর ?

অম্বিকা। হ্যাঁ, তার নাম গদাধর, তাকে আমি ছেলেবেলা থেকে ভাল রকম চিনি। সে বাবার ······।

অম্বিকার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে কলকলায়মান নারী-সমাজ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। চরণালঙ্কারসকল শিঞ্জিত করিয়া মরালমন্থরগামিনীরা শিকারানুসারী তরক্ষুর ন্যায়, প্রাঙ্গণের এক প্রদেশে প্রধাবিতা হইল। তথায়, গদাধরের নিকট হইতে হরিদ্রা লইয়া নাপিত আসিয়াছিল। সুবর্ণের ক্ষুদ্র পাত্রে যে অল্প হরিদ্রা ছিল, তাহা কন্যার জন্য। রৌপ্যনির্ম্মিত বৃহৎ আধারে যে হরিদ্রা ছিল, তাহা কন্যার কুটম্বিনীগণের জন্য। নাপিত হাত দিয়া দেখাইয়া, দিল, “এই সোণার বাটীতে কনে তেল মাখবেন। তেল মাখবার সময় মেদিনীপুরের এই পাটীর উপর, এই শ্বেত পাথরের পীঁড়িতে হেলান দিয়ে বসবেন। আর এই ঢাকাই শাড়ী পরবেন। আর এই যে মার্ব্বেল পাথরের জলচৌকী দেখছেন, এতে বসে’ স্নান

করবেন। এই দুটি রূপোর ঘড়াতে চানের জল থাকবে। এই রূপোর গামলাতে, এই রূপোর ঘটীটি দিয়ে জল ঢেলে নেবেন। এটা রূপোর ঝারি, এইটি থেকে মাথায় জল ঢালবেন। জলটি সুবাসিত করবার জন্যে এই দেখুন দু বোতল গোলাপজল এনেছি। চান করে' এই আসিতে মুখ দেখবেন; এই গন্ধ মেখে, এই সকল চিরুণি দিয়ে চুল বাঁধবেন। এই সকল তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছবেন। এই বারাণসী শাড়ী পরে' এই মখমলের বিছানার উপর বসবেন। বাক্সের মধ্যে গহনা আছে, এই তার চাবি। ওটা একটা মখমলী গালিচা, ওর উপর বসে চুল বাঁধবেন। জলখাবার জন্যে এ সব রূপোর বাসন। এই পেঁড়ার মধ্যে কুড়িখানা ঢাকাই শাড়ী আছে, এ সব কনের কুটুম্বিনীরা পাবেন।"

দ্রব্যসকল দেখিয়া, গ্রামবাসিনীগণ স্থির করিলেন যে, গাত্র-হরিদ্রার সহিত এরূপ বহুবিধ এবং মূল্যবান্ সামগ্রী আসিতে তাঁহারা কুত্রাপি অবলোকন করেন নাই; কেবল মাত্র একবার অমুক গ্রামে, তাঁহাদের অমুক আত্মীয়ের অমুক কন্যার বিবাহের সময়, অমুক গ্রামের অমুক জমীদারদিগের বাটী হইতে যে 'গাত্র-হরিদ্রা' আসিয়াছিল, তাহাই ইহা অপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। কারণ, তাহাতে দাঁত খুঁটিবার সোণার খড়্‌কেটি হইতে আরম্ভ করিয়া, পা ঘষিবার জন্য বিলাতী ঝামাটি পর্য্যন্ত,—কোন দ্রব্য বাদ পড়ে নাই। এবং তাহাতে কুটুম্বিনীদিগের জন্য কেবলমাত্র এক এক খানি শাড়ী আসে নাই, পরন্তু এক এক ছড়া সোণার চেন হার আসিয়াছিল। ইত্যাদি।

চারুশশীর বাটী যে কালীদহ গ্রামে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে তাহার মাতার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইয়া অবগত হইয়াছিল যে, গ্রামে জমীদার বাবুদিগের বাটীতে জমীদার বাবুর কন্যার শুভ বিবাহ হইবে; এবং তদুপলক্ষে গ্রামে মহাসমারোহ উপস্থিত হইবে। অতএব, সে কিছুদিনের জন্য কলিকাতা হইতে পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করিতেছিল। আজ সেও গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে জমীদার বাবুদিগের বাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই যে, ঠিক কাহার সহিত মানদার বিবাহ হইবে। সে এইমাত্র শুনিয়াছিল যে, বরের বাটী কলিকাতাতে। এক্ষণে সে তাহার কলিকাতা সম্বন্ধে সর্ব্ববাদিসম্মত অভিজ্ঞতা জাহির করিয়া, আগত নাপিতপুত্রকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওগো! আমাদের বরের বাড়ী, কলকাতার কোন্ পাড়ায়?"

নাপিত বলিল, "বরের বাড়ী চৌরঙ্গীতে। কিন্তু আমরা বরের বাড়ী থেকে আসি নি।"

চারুশশী। তোমরা তবে কোথা থেকে এসেছ?

নাপিত। আমাদের বাবু বরকে ছেলেবেলায় প্রতিপালন করেছিলেন, লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন; এখন তিনিই বরের এক রকম অভিভাবক। আমরা তাঁরই বাড়ী থেকে এসেছি। গিন্নী মা ঠাকরুণ নিজে দেখে এই সকল জিনিষ কিনে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক জিনিষটি তিনি নিজে পছন্দ করে' নিয়েছেন।

চারুশশী। তোমার গিন্নী মা ঠাকরুণের পছন্দ ভাল নয়।

পাড়াগাঁয়ের লোকে এই জিনিষ দেখে অবাক্ হয়ে যাচ্চে বটে, কিন্তু আমার বাড়ী কলকাতায়; আমি অনেক জায়গায় অনেক ভাল গায়ে হলুদের তত্ত্ব দেখেছি।

নাপিত। কল্‌কাতায় কোন্ যায়গায় আপনাদের বাড়ী?

চারু। ঝামাপুকুরে।

নাপিত। ঝামাপুকুরে? ঝামাপুকুরের অতুলবাবুর বাড়ীতে আমি দুই একবার কামাতে গেছি।

চারু। তুমি, তা হলে, আমাদের বাড়ীতেই গেছ। সেই আমাদের বাড়ী। তুমি যে বাবুর নাম করলে, তিনিই আমার স্বামী।

নাপিত ভূমিষ্ঠ হইয়া, চারুশশীকে প্রণাম করিয়া কহিল, "তা হলে, আপনি আমাদের পর নন। অতুলবাবুই ত আমাদের বাবুর ছোট ম্যানেজার।"

চারুশশী একটু অপ্রতিভ হইল। গিন্নীর সম্বন্ধে সেই মত প্রকাশ করাটা তাহার ভাল হয় নাই;—নাপিত বাড়ী ফিরিয়া, যদি গল্প করে! পরে, একটু সাহস করিয়া নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হলে, তুমি মল্লিকবাবুদের বাড়ী থেকে এসেছ?"

নাপিত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চারুশশী। বরের নাম কি?

বিমলা নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। নাপিত চারুশশীর প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সে বিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া কহিল, "ও মা অবাক্! তুমি বরের নাম জান না?"

চারু। না ভাই, কোথা থেকে জানব? তুমি যদি জান, তা হলে বল।

বিমলা। বরের নাম গদাধর।

নামটি বজ্রনিনাদে চারুশশীর মনোমধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহা বজ্রের আঘাতের মত তাহার হৃৎপিণ্ডকে আঘাত করিল। এই বজ্রের চকিতালোকে তাহার হৃদয়ের সন্দেহ-অন্ধকার মুহূর্ত্ত মধ্যে তিরোহিত হইয়া গেল। বুঝিল, তাহারই সেই গদাধর বর সাজিয়া, তাহাদেরই গ্রামে অন্য এক কন্যাকে বিবাহ করিতে আসিতেছে। পাপীয়সীর হৃদয়মধ্যে আশা জাগিয়া উঠিল, "কত বৎসর পরে আবার তাহাকে দেখিব!"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অম্বিকার উপদেশ।

দুইখানা বজ্‌রা ও চারিখানা ভাউলে আসিয়াছিল। একখানা বজ্‌রাতে জ্ঞানদা বাবু, গদাধর, অতুলবাবু, এবং জ্ঞানদাবাবুর তিন পুত্র ছিলেন। অন্য বজ্‌রাতে বরযাত্রীগণ ছিলেন। ভাউলেতে নাপিত, পুরোহিত, এবং ভৃত্যবর্গ ছিল। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে বজ্‌রা ও ভাউলে কালীদহের বাঁধাঘাটে আসিয়া ভিড়িল। গ্রামের মধ্যে "বর এসেছে," "বর এসেছে" সাড়া পড়িয়া গেল। পুষ্প-পল্লব-পতাকা-পরিশোভিত, আলোকমালা-বেষ্টিত চাঁদনিতে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। পুরস্ত্রীগণ গল্প বন্ধ করিয়া, কোলের ছেলেটিকে কোলে করিয়া, বর দর্শনাভিলাষিণী হইয়া গৃহছাদে উঠিয়া, আবার গল্প ধরিল।

বর, সুচারু রৌপ্যকারুকার্য্যখচিত সুদৃশ্য তাঞ্জামে চড়িয়া, এবং বরযাত্রীরা মন্থরগামী অশ্বশকটে আরোহণ করিয়া, বিচিত্র ফানুস-বেষ্টিত দীপাবলীতে পরিবেষ্টিত হইয়া, বহু বাদিত্রের বাদ্যনিনাদে বধির হইয়া, সভাগৃহে প্রবেশ করিল। তথায় সংখ্যাতীত স্ফটিক দীপাধারে উজ্জ্বল আলোক সকল, উজ্জ্বল গৃহশয্যায় প্রতিফলিত হইতেছিল। তথায় আলেখ্য-অলঙ্কৃত গৃহভিত্তি সকল কমনীয় কুসুমহারে পরিশোভিত হইয়াছিল। তথায় সভামধ্যে উচ্চ স্থানে

বরের জন্য মহার্হ মসনদ বিস্তৃত ছিল। তথায় চিকের অন্তরালে অন্তঃপুরবাসিনীগণে পরিবৃতা হইয়া, রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া, রত্নময়ী জামাতার মুখচন্দ্র অবলোকন করিবার জন্য বসিয়া ছিলেন।

বর দেখিয়া, রত্নময়ীর হাড় জ্বলিয়া গেল। চক্ষে জল আসিল। হায় হায়! তাঁহার আদরিণী কন্যার অদৃষ্টে আর কোনও সুখের আশা রহিল না। তাঁহার নির্ব্বোধ স্বামী দেখিয়া শুনিয়া, কিরূপে কমলমুখী এবং নবনীত-বিগঠিত-পুত্তলিকা-সমা কন্যার এরূপ কদাকার বিকটদর্শন বর মনোনীত করিল! ইহা অপেক্ষা কন্যার হস্তপদ রজ্জুবদ্ধ করিয়া তাহাকে সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত করিলে ভাল হইত। রত্নময়ী বারবার আপনার দগ্ধ ললাটের নিন্দা করিয়া, এবং নিজেকে আশু যমালয়ে লইয়া যাইবার জন্য যম-রাজকে আহ্বান করিয়া, আপন শয়নকক্ষে যাইয়া শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমরা পরে অবগত হইয়াছিলাম যে, সে রাত্রে রত্নময়ী আর শয্যাকক্ষের বাহিরে আসেন নাই; কেবল রাত্রি একাদশ ঘটিকার পর শ্রীমতী নুলীদেবীর একান্ত নির্ব্বন্ধানুযায়ী কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া, কাতরকণ্ঠে তাহাকে কহিয়াছিলেন, "কি ভাবলাম, আর কি হল!"

রত্নময়ীর অভাবে কিন্তু মানদার বিবাহ বন্ধ হয় নাই। ঢক্কা-ঢোল-নহবৎ-সানাই নিনাদিত হুলু-হুলু ধ্বনিত বিবাহ-কার্য্য লগ্নমত হইয়া গিয়াছিল। তাহার পর, উত্তরীয়াঞ্চলে নববধূকে বন্ধন করিয়া, রাত্রিযাপন উদ্দেশ্যে, বর বাসরগৃহদ্বারে আনীত হইয়াছিল। তথায় অলক্তরক্তে আপন কোমল কপোলদ্বয় রঞ্জিত করিয়া,

অলঙ্কার-আলোকে আপন পরিণত দেহতট প্রজ্জ্বলিত করিয়া, স্বর্ণখচিত পট্টবস্ত্র পরিয়া, দ্বারদেশে চারুশশী দণ্ডায়মানা ছিল। দেখিয়া, চরণাগ্রে সহসা বিষধর সর্প দেখিলে পথিক যেমন স্তম্ভিত হয়, গদাধর সেইরূপ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিল, এ পাপ কোথা হইতে এখানে আসিল?

গদাধরকে অচল দেখিয়া, চারুশশী কহিল, "ঠাকুরপো! কেমন আছ? ভিতরে এস। ভয় কি? আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব না।"

গদাধর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এখানে কি করে এলেন?"

চারুশশী অকারণ অনেকটা হাসি হাসিয়া কহিল, "এই, তোমাকে দেখতে এসেছি। তুমি ত আপনা হতে দেখা দাও না।"

গৃহের ভিতর হইতে উতলা বিমলা হাঁকিল, "ও চারু, তুই যে ভাই, বরকে ঐখানেই দাঁড় করিয়ে রাখলি। দাঁড়া, আগে ভিতরে এসে বসুক, তার পর কথা ক'স।"

বর গৃহমধ্যে আসিয়া বসিলে চারুশশী আবার একমুখ হাসি হাসিয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি জনতে না যে, এই কালীদহ গ্রামে আমার বাপের বাড়ী?"

গদাধর কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিল, কিন্তু হারুঠান্‌দিদি আসিয়া, তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, "আহা! বরটি নয়ত যেন চোরটি।"

এই কথাটি বলার পর হারুঠা'ন্‌দিদি মনে করিলেন যে, তাঁহার মত রসভাবিকা রসিকা, গৃহমধ্যে আর কেহ বর্ত্তমান নাই। ফলতঃ

ঠা'ন্‌দিদির কথাটা শুনিয়া গৃহমধ্যস্থ সকল সুন্দরীই স্থির করিলেন যে, এরূপ রসিকতার পর সকলেরই হাস্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব গৃহমধ্যে খিল-খিল, খল-খল রবে একটা হাসির তরঙ্গ উঠিল।

হাসিতে হাসিতে বিমলা, হারুঠান্‌দিদিকে ধরিয়া বলিল, "ঠা'ন দি, আজ তোমায় একটা গান গাইতেই হবে, আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।"

ঠা'নদিদি কহিলেন,"আমার কি ভাই, আর সে কাল আছে যে গান গাইব? তবে তোমরা ধরছ, একটা যা'হ'ক গাই, শোন।"

ঠান্‌দিদি একবার বরের মুখের কাছে, আরবার মানদার মুখের কাছে দু'হাত নাড়িয়া, মসীবিচিত্র দন্তচ্ছটা প্রকটিত করিয়া এবং রাগিণীসকলকে মোল্লার দ্বারের কুক্‌কুটীর ন্যায় 'হালাল' করিয়া তার স্বরে গাহিলেন,—

"আই আই ঐ বুড়া কি
এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে
হৈল দিগম্বর লো॥"

ঠা'নদিদির গান আর থামে না—গৃহের পোনের-আনা-রকম অবলা নিদ্রিতা হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ পরে, হারুঠানদিদি আপন সঙ্গীতবেগ উপশম করিয়া চারি দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে পরাভূত সৈন্যগণের ন্যায়, যেন তাঁহারই ধীর আঘাতে নারীগণ বাসর-আসরে ধরাশায়িনী হইয়াছে; সমস্ত আততায়ী-

নিধনকারী পরাক্রান্ত বিজয়ী সেনাপতির ন্যায়, যেন তিনি একক আপন মস্তক উন্নত রাখিয়াছেন।

বিমলা ও চারুশশী বরের বিছানার নিকট নিদ্রিতা ছিল। বর নিজে তন্দ্রাঘোরে অচেতন ছিল।

পার্শ্বের ঘরে, বরের জলযোগের জন্য স্থান প্রস্তুত হইয়াছিল। তথায় কতকগুলি পুরনারী বহুবিধ উপাদেয় আহার সামগ্রী সজ্জিত করিতেছিলেন। অম্বিকা তাহাদের সাহায্য করিতেছিল। সে সেদিন উৎকৃষ্ট বসন ও অলঙ্কারসকল পরিধান করিয়াছিল। উৎসব-বসন-পরিহিতা অলঙ্কৃতা মহিমময়ীকে রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল।

আহারের জন্য আহ্বান করিতে, অম্বিকা গদাধরের নিকট আসিয়া ডাকিল, "গদাধর!" গদাধরের কানের ভিতর স্বর্গের সঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, সে সম্মুখে চাহিয়া দেখিল; মনে হইল সে যেন স্বপ্নের ঘোরে স্বর্গের ছবি দেখিয়াছে। মনে হইল, তাহার হৃদয়মধ্যে, বিহঙ্গের কাকলী লইয়া, কোমল পল্লবময়ী পুষ্পিতা লতিকা লইয়া, শীতল নির্ম্মল চঞ্চল জলপ্রবাহ লইয়া, আপনার সমস্ত সৌন্দর্য্যভাণ্ডার খুলিয়া, বসন্ত যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। অম্বিকা আবার ডাকিল, "গদাধর!"

গদাধর জাগ্রত হইয়া কহিল, "কেন অম্বিকা?"

বিমলা ও চারুশশী বরের নিকটে শুইয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুনিল, "কেন অম্বিকা?"

বিমলা ভাবিল, "একজন ডাকলে, 'গদাধর।' আর একজন

উত্তর দিলে 'কেন অম্বিকা ?'—দেখছি, পরস্পরের মধ্যে পরিচয়টা বড় ঘনিষ্ঠ।"

চারুশশী ভাবিল, "বাঃ, অম্বিকা এই অল্প সময় মধ্যে, গদাধরের সঙ্গে কি করে' এত প্রণয় করে নিলে? এই বুঝি অম্বিকার সতীপনা!" চারুশশী ত জানিত না যে, বাল্যকাল হইতেই উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত।

গদাধর অম্বিকার সহিত পার্শ্বের ঘরে যাইয়া আহার করিল। তাহার সহিত কত কথা কহিল। বরের সহিত অম্বিকার বাক্যালাপের প্রথা অবলোকন করিয়া, সেই গৃহস্থিত পুরমহিলাগণ ভাবিলেন, একজন অপরিচিত যুবক বরের সহিত, যুবতী অম্বিকার চোখ মুখ নাড়িয়া ওরূপভাবে অত কথা কহা অনুচিত হইয়াছে; এবং একজন বেহায়া স্ত্রীলোক ছাড়া, অন্য কেহ এরূপ কথা কহিতে পারে না।

আহারাদির পর গদাধর আসিয়া আবার বাসরঘরে বসিল। অম্বিকা আসিয়া গদাধরের পার্শ্বে বসিয়া, আবার কথোপকথন আরম্ভ করিয়া দিল। যাহারা সেই ঘরে নিদ্রিতা ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে উঠিয়া হাস্যকৌতুকের অভাবে, বিজৃম্ভণসহকারে গৃহান্তরে যাইয়া শয়ন করিল। বিমলা ও চারুশশী যথাস্থানে শুইয়া রহিল। কিন্তু তাহারা নিদ্রিত ছিল না। জাগ্রত অবস্থায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, অম্বিকার বাক্যালাপের মধ্যে কোথায় গুপ্ত প্রেম লুক্কায়িত আছে, তাহার অনুসন্ধানকার্য্যে আপনাদের শ্রবণদ্বয়কে বিশেষরূপে নিযুক্ত রাখিয়াছিল।

রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া, অম্বিকা গদাধরকে কহিল, "আর রাত্রি জাগলে তোমার অসুখ হবে; তুমি শোও। আমিও শুতে যাচ্ছি।"

অম্বিকার সহিত কথা কহিতে পাইলে, গদাধর বোধ হয় চির-জীবন বিনিদ্র অবস্থায় যাপন করিতে পারিত। কিন্তু সে ভাবিল, সে শয়ন না করিলে অম্বিকা শয়ন করিতে যাইবে না; ইহাতে রাত্রি জাগরণ হেতু অম্বিকার শরীর অসুস্থ হইতে পারে। অতএব সে কহিল, "হ্যাঁ, রাত্রি বেশী হয়েছে। এখন শুতে হবে। কিন্তু এখানে শুতে পারি না। তুমি আমাকে বা'র বাড়ীর পথ দেখিয়ে দাও; আমি বাইরে গিয়ে শোব।"

অম্বিকা গদাধরকে পথ দেখাইয়া অগ্রে চলিল; গদাধর পশ্চাৎ চলিতেছিল। বৃহৎ ভবন। গৃহের পর গৃহ অতিক্রম করিয়া অম্বিকা উন্মুক্ত স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। জনসমাকীর্ণ বদ্ধ গৃহের বাহিরে আসিয়া, শীতল বায়ুর স্পর্শে গদাধর বিশেষ স্নিগ্ধতা অনুভব করিল। হৃদয়ে শান্তি লাভ করিয়া কহিল, "বাঁচলাম। বাইরে এসে বাঁচলাম। বোধ হয় এই বিবাহে আসা আমার ভাল হয় নি।"

অম্বিকা হাসিল; কহিল, "তোমার বিবাহে তুমি না এলে কি করে বিবাহ হত?"

গদাধর। শোন অম্বিকা! এ আমার বিবাহ নহে। জমীদার-কন্যা মানদার বিবাহ। ঘটনাচক্রে পড়ে' আমি নিতান্ত অনিচ্ছায় ওকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছি। এতে মঙ্গল হবে না। এ থেকে আমি জীবনে কোন সুখ পাব না।

অম্বিকা। গদাধর, ভাই, তুমি পৃথিবীতে সুখের আশা কোর না। সুখলাভ করবার জন্যে আমরা এ পৃথিবীতে আসি নি। এখানে, আমাদের যা কর্ত্তব্য, তা আমরা পালন করে' যাব। সে কর্ত্তব্য যদি অত্যন্ত কঠিন হয়, তাও আমাদিকে হাসিমুখে পালন করতে হবে। কিন্তু কর্ত্তব্যপালন করে ভাই, তুমি পুরস্কারের প্রত্যাশা কোর না। তার ফলাফল ভগবানের হাতে সমর্পণ কোর। তুমি বলছিলে যে, এ বিবাহে মঙ্গল হবে না। কার মঙ্গল হবে না? তোমার? মানদার? ভাই, এই সীমাহীন বিশ্বের মঙ্গলের কাছে, তোমাদের আপন আপন ক্ষুদ্র মঙ্গলের কথা গণনা কোর না।

গদাধর। আমি নিজের মঙ্গলের কথা ভাবছি না; মানদার অনিষ্টের কথা ভাবছি। আমি তাকে অনিচ্ছায় বিবাহ করে' তার বিশেষ অনিষ্ট করেছি।

অম্বিকা। অনিচ্ছায় বিবাহ করেছ? ভাই, ভেবে দেখ, আমাদের ইচ্ছার বল কতটুকু। ইচ্ছা করলে কি তুমি এ বিবাহ রহিত করতে পারতে? বিধাতা যে সূত্রে তোমার জীবনের ঘটনা-গুলির মালা গেঁথেছেন, তুমি মানুষ হয়ে কি তা ছিন্ন করতে পারতে? না ভাই, মানুষ তা পারে না। মানুষকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যের মত বিধাতার নির্দ্দিষ্ট পথে চলতেই হবে। তুমি বলছিলে যে, এ বিবাহ করে' মানদার তুমি অনিষ্ট করেছ। তোমার কি সাধ্য ভাই, যে তুমি এই ভগবানের পবিত্র রাজ্যে কারও অনিষ্ট কর?

গদাধর। তা হলে, তোমার মতে কোন মানুষ কোন মানুষের অনিষ্ট করতে পারে না?

অম্বিকা। সাধ্য কি? এ পৃথিবীর ইষ্টানিষ্টের কর্ত্তা মানুষ নয়। তুমি কারও অনিষ্ট করতে পার না। কেউই পারে না। রাজ-কারাগারে যে নরঘাতী পাপী মৃত্যুদণ্ড-প্রতীক্ষায় বসে রয়েছে, সেও কারও অনিষ্ট করতে পারে নি। আপনার বিশ্বরাজ্যে বিশ্ব-দেবতা যে মহান্ কীর্ত্তি-মন্দির সংস্থাপন করছেন, সেই মন্দির-প্রতিষ্ঠায়, মহাপুণ্যাত্মার মত এই নরঘাতী পাপীও সহায়তা করেছে। বুঝে দেখ।

গদাধর কি বুঝিবে? সে প্রতিভাময়ীর অমানুষিক জ্যোতির্ম্ময় মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, "হায় দেবি! এ জীবনে তোমাকে পূজা করবার অবসর পেলাম না। তোমারই আদেশ মাথায় নিয়ে আমি এই কঠিন কর্ত্তব্য ভার আপন বুকে গ্রহণ করব।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গদাধরের নিন্দা।

গদাধর যখন অলিন্দ পথে অর্ইনীয়া অম্বিকার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অনন্যমনে, কঠিন কর্ত্তব্য-ভার আপন বুকে গ্রহণ করিতেছিল, তখন তথায় আচম্বিতে, নৈশ নিস্তব্ধতা ভগ্ন করিয়া, স্ত্রীকণ্ঠপ্রসূত হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

অম্বিকার সহিত গদাধরকে একাকী বাসর ঘর ত্যাগ করিতে দেখিয়া, বিমলা ও চারুশশী তাহাদের চরণালঙ্কার সকল উন্মোচন করিয়া, কোনও নিরাপদ্ স্থানে লুক্কায়িত রাখিল।

বলা বাহুল্য, মূল্যবান্ অলঙ্কার সকল অপহারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে স্থানটি তাহারা নিরাপদ্ মনে করিয়াছিল, তাহা নিতান্ত নিরাপদ্ হয় নাই। তাহারা যেমন হিংসা ও কৌতূহল বুকে পুরিয়া আপনাদের উদ্দেশ্যসাধন মানসে, কপট-নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তেমনই, সেই গৃহমধ্যে অন্য এক দুষ্টা, অলঙ্কার অপহরণের সুযোগ খুঁজিয়া, নিদ্রার ভাণ করিয়া, মুদ্রিতনয়নে পড়িয়া ছিল। বিমলা ও চারুশশীকে, অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া, অন্য স্থানে যাইতে দেখিয়া, সে পক্ষিশাবক-লাভ-লোলুপ সরীসৃপের ন্যায় তাহাদের পথ অনুসরণ করিল। দেখিল, তাহারা এক স্থানে অলঙ্কারসকল লুক্কায়িত করিল। দেখিয়া,

ত্বরিতপদে আপন স্থানে আসিয়া শয়ন করিয়া রহিল। অম্বিকা ও গদাধরের পশ্চাদ্গামিনী হইয়া, যখন বিমলা ও চারুশশী চলিয়া গেল, তখন সে পুনরায় গাত্রোত্থান করিয়া অলঙ্কারসকল আপন বস্ত্রমধ্যে সংগ্রহ করিয়া ঈপ্সিত স্থানে রাখিয়া আসিল। এইরূপে, বিমলার কৌতূহলের জন্য এবং চারুশশীর হিংসার জন্য, বিধাতা আপন বিহিত দণ্ড প্রদান করিলেন।

অলঙ্কারবিহীন নীরব চরণে, তাহারা কখন্ আসিয়া অলিন্দের এক স্তম্ভের অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল, তাহা অম্বিকা কিংবা গদাধর কেহই জানিতে পারে নাই; এক্ষণে সহসা তাহাদের হাস্য-কোলাহলে উভয়ের চিন্তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। চক্ষু ফিরাইয়া, তাহাদিগকে দেখিয়া, অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা, ভাই, এখানে কখন্ এলে?"

বিমলা আপন নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া এবং চক্ষুপ্রান্তে কৃষ্ণ তারা ঘুরাইয়া, রক্তাধর তরঙ্গিত করিয়া, হাসিল।

চারুশশী কহিল, "আমরা বাসর ঘরে বরকে না দেখে, তাকে খোঁজবার জন্যে বেরিয়েছিলাম। এখানে এসে দেখলাম, তুমি ওর সঙ্গে লুকিয়ে মনের কথা কইছ। আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এই রাত্রে, এই নির্জ্জন স্থানে তোমার কি বরের সঙ্গে এভাবে কথা কওয়া উচিত হয়েছে?"

অম্বিকা। কি কথা কয়েছি?

চারুশশী। কি কথা কয়েছ তা' তুমিই জান। কিন্তু মানুষ লুকিয়ে যে কথা বলে, তা ভাল কথা নয়।

চারুশশীর এই কথার পর, তাহার সহিত আর কোন কথা কহা আবশ্যক আছে, অম্বিকা এরূপ বিবেচনা করিল না। সে গদাধরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "চল, গদাধর, আমি তোমাকে বার-বাড়ীর পথ দেখিয়ে দিই।"

তাহারা চলিয়া গেলে, বিমলা চারুশশীর গায়ে হাত দিয়া বলিল, "অম্বিকা ছুঁড়ী ভিতরে ভিতরে যে এমন, তা আগে আমি জানতাম না।"

চারুশশী আপনার অলক্তরঞ্জিত গণ্ডে অলক্তরঞ্জিত হস্ত বিন্যস্ত করিয়া কহিল, "অবাক্ করেছে; এমন নির্লজ্জ বেহায়া বেয়াদব মেয়ে, আমি বিশ্বচরাচরে দেখি নি। গ্রামের বোকা লোকে ওকে আবার সতীলক্ষ্মী বলে! পোড়া কপাল সতীলক্ষ্মীর। কেমন সতীপনা তুমি ত স্বচক্ষে দেখলে? রাত দু'পরে পরপুরুষের কাঁধে হাত দিয়ে কথা আর ফুরোয় না।"

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁধে হাত দিয়েছিল বুঝি? কৈ আমি ত তা দেখিনি।"

চারুশশী। ও মা! তুমি বুঝি তা' দেখ নি? তোমার চোখটা ছিল কোথায়? কাঁধে হাত দেওয়া ত অল্প কথা; আমার একবার মনে হল, যেন অম্বিকা ছুঁড়ী ওর মুখে একবার চুমো খেল।"

বিমলা। তুই আর জ্বালাস্‌নে ভাই। ঐ দাঁত উঁচু মুখে কি কেউ চুমো খেতে পারে? আরে, রাম রাম!

চারুশশী। তুমি ত বোঝ না দিদি! তুমি সকলকে আমাদের

মত মনে কর। ও ছুঁড়ী আইবুড়ী, ও কি আর দাঁত উঁচুর বিচার কর্‌বে? ওর একটা হলেই হল।

বিমলা। হ্যাঁ ভাই চারু! তুই বরকে তখন ঠাকুরপো বল্‌ছিলি; তুই কি ওকে আগে দেখেছিলি?

চারুশশী। ওকে আবার দেখিনি? ও যে রোজ বিকালে আমাদের বাড়ীতে এসে জল খাবার খেয়ে যেত।

বিমলা। তোদের বাড়ীতে আস্‌ত কেন?

চারু। তা বুঝি জান না? আমার স্বামী কলকাতার যে রাজার বাড়ীর ম্যানেজার, সেই বাড়ীতেই ও থাকে। বড় গরীব। ও জলখাবার খাওয়াবার জন্য ওকে ডেকে নিয়ে আস্‌ত।

বিমলা। সে রাজার বাড়ীতে ও কি করে?

চারু। কি জানি ভাই কি করে। তখন ত ছেলে পড়াত।

বিমলা। কত টাকা মাইনে?

চারু। তখন ত শুনছিলাম, ওর কুড়ি টাকা মাইনে। এখন কত হয়েছে, বলতে পারিনে।

চারুশশী সখী বিমলার সহিত কথা কহিতে কহিতে, যেস্থানে তাহারা চরণাভরণ সকল চরণকমল হইতে উন্মুক্ত করিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সংগোপনস্থানে হস্ত দ্বারা অনুভব করিয়া ভীতিপ্রকম্পিত কণ্ঠে কহিল, "আমার চরণ-পদ্ম?"

বিমলা। আমার মল?

চারুশশী। ওমা কি হবে? কিছুই নেই।

বিমলা। আমার যে ডায়মন্‌কাটা মল।

চারুশশী। আমি যে ভাই, এই সে দিন পঞ্চাশ ভরি দিয়ে চরণ-পদ্ম গড়িয়েছিলাম। এখনও যে সেক্‌রার সব দেনা শোধ হয়নি!

বিমলা। কে নিলে ভাই? কি করে' এখন বাড়ী ফিরব? শ্বাশুরী যে বোকে অনর্থ করবে!

খোঁজ্ খোঁজ্—চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। বাতির বিগলিত শ্বেতবিন্দুর দ্বারা গৃহতল অলঙ্কৃত করিয়া সকলে পাতি পাতি খুঁজিল। যে চুরি করিয়াছিল, সেও কত খুঁজিল; কিন্তু সে আভরণ-সকল আর পাওয়া গেল না। তখন সকলে অনুমান করিতে লাগিল, লইল কে? এ বাসর-গৃহ হইতে ত কেহই বাহিরে যায় নাই, কেবল বরই বাহিরে গিয়াছে। যাহারা গৃহে আছে, তাহাদের মধ্যে ত কাহারও নিকট এ অলঙ্কার নাই। গহনাসকল হস্ত পদবিশিষ্ট নহে যে ছুটিয়া পলাইবে; কর্পূর নহে, যে উবিয়া যাইবে; তাহাদের পক্ষ নাই যে আকাশপথে পলায়ন করিবে। কোথায় গেল? কে লইল? ভাবিতে ভাবিতে প্রভাত হইয়া গেল।

প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া, ঘুমঘোর আঁখি লইয়া, নিশীথ ঘটনাবলীর ইতিহাস হৃদয়মধ্যে রচনা করিয়া পল্লী-মনোমোহিনীগণ দিগ্‌বিদিকে আপন আপন গৃহপথ অনুসরণ করিল। এবং গৃহে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের রচিত মনোরম ইতিবৃত্ত বিবৃত করিল।

শুনিয়া, গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝিল যে, জমীদার বাবুর জামাতাটি যমদূতের ন্যায় কদাকার; এবং নিতান্ত বোকা, যেহেতু

বাসর ঘরে একটিও কথা কহিতে পারে নাই; এবং বিদ্যাহীন, যেহেতু কেবল মাত্র একটি কুড়ি টাকা বেতনের সামান্য চাকুরী করিয়া থাকে; এবং দরিদ্র, যেহেতু অঙ্গুলিতে হীরার আংটী বা বক্ষে সোনার চেন কেহই দেখে নাই; এবং চোর, যেহেতু হারু ঠান্‌দিদির ন্যায় বুদ্ধিমতী রসিকা স্ত্রীলোক তাহার মুখ দেখিবামাত্র বলিয়াছিল যে, বরটা নয়ত যেন চোরটি; আর সে বাসর ঘর হইতে চলিয়া আসার পর হইতেই অলঙ্কারগুলি অন্তর্হিত হইয়াছিল; এবং লম্পট; যেহেতু সে নিভৃত স্থানে অম্বিকাকে লইয়া তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া মুখচুম্বন করিয়াছিল। অতএব স্থির হইয়া গেল যে, মানদার বিবাহ দেওয়া হয় নাই—তাহাকে এক প্রকার জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আর অম্বিকা সম্বন্ধে গ্রামবাসীরা অনেক যুক্তি-তর্কের পর স্থির করিলেন যে, কেবল মাত্র ঘোর কলির প্রভাবেই এরূপ স্ত্রীলোক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। যদি আইন এবং পুলিশের ভয় না থাকিত, এবং যদি ইতিপূর্ব্বেই উহার বাপের নাপিত ধোবা ও গয়লা বন্ধের ব্যবস্থাটা না হইয়া যাইত, তাহা হইলে নাপিতের দ্বারা ছুঁড়িটার মস্তকমুণ্ডন করাইয়া, এবং ধোবার নিকট হইতে গাধা লইয়া তাহার উপর চড়াইয়া, এবং গয়লার নিকট হইতে ঘোল সংগ্রহ করিয়া উহার মাথায় ঢালিয়া, ভগ্ন কুলোর বাতাস দিয়া তাহারা কুলটা অম্বিকাকে গ্রামের বাহির করিয়া দিত। কিন্তু ইহা করিতে না পারিয়া কর্ত্তারা আপন আপন অন্তঃপুর মধ্যে আসিয়া, দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উচ্চ করিয়া স্ত্রী-কন্যাগণকে

সম্বোধন করিয়া এই শাসনবাক্য প্রচার করিলেন যে, "খবরদার! তোমরা আর কেউ অম্বিকার ছায়া স্পর্শ করতে পাবে না।"

হায়! অবোধ গ্রামবাসীরা জানিত না যে, প্রতিভাময়ী পুণ্য-ময়ী রূপসী অম্বিকার দেহ ছায়াহীন স্বর্গের আলোকে অহনিশ আলোকিত ছিল; দেবতাদিগের অমর দেহের ন্যায় সে দেহের ছায়া ছিল না। সে যেস্থানে আসিয়া দাঁড়াইত, রূপপ্রভার পুণ্য-চ্ছটায় সে স্থানটা প্রভাসিত হইয়া উঠিত।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

নুলীর অপমান।

বিবাহের পরদিন প্রভাতে, গ্রামের পাঁচ জন ভদ্র ব্যক্তিকে সাক্ষ্য রাখিয়া, উপযুক্ত মূল্যের ষ্ট্যাম্প কাগজে লিখিয়া রত্নেশ্বরবাবু নাড়িচা গ্রামখানি বিবাহের যৌতুকস্বরূপ গদাধরকে দান করিলেন।

পূর্ব্বেই স্থির ছিল যে, নাড়িচা গ্রামেই গদাধরের বৌ-ভাত হইবে। তজ্জন্য বৃদ্ধ উমাকালী চক্রবর্ত্তী সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। গদাধরের পৈতৃক বাটী উত্তমরূপে সংস্কৃত হইয়াছিল; এবং বহির্ব্বাটীর এবং ভিতর বাটীর অঙ্গনে তালপত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত দুইটী বৃহদাকার অস্থায়ী মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল। এই সব উদ্যোগ সমাধা করিয়া উমাকালী গদাধরের বিবাহ দেখিবার জন্য কালীদহ গ্রামে আগমন করিয়াছিলেন।

যৌতুক দান-কার্য্য যথারীতি সম্পন্ন হইবার পর, তিনি গদাধরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বাবাজি! তুমি বউমাকে নিয়ে পরে এস। আমি আগে চল্‌লাম। বরকন্যার গৃহপ্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে।"

সেই দিন সন্ধ্যার সময়, বধূকে লইয়া, কতদিন পরে গদাধর আবার আপন বাটীতে প্রবেশ করিল।

নগ্নপদে, মলিন বস্ত্র পরিয়া উমাকালী গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

গদাধরকে দেখিয়া বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,"মধু ভাই, কোথায় তুমি? তোমার গদাই বউ নিয়ে ঘরে এসেছে। তুমি এস ভাই, এসে তোমার কায কর;—ছেলে বউকে আশীর্ব্বাদ করে' ঘরে নিয়ে যাও।"

অনলপ্রবাহসম অশ্রুধারা গদাধরের গণ্ড বহিয়া প্রবাহিত হইল;—দ্বারদেশে বসিয়া, মস্তকে হাত দিয়া, সে কাতরকণ্ঠে ডাকিল, "বাবা গো।"

নুলী মানদার সহিত আসিয়াছিল। যে গাড়ীতে মানদা ছিল, সে তাহারই ভিতর বসিয়া ছিল। সে বাহির হইয়া, এবং বাহু-বেষ্টিত সুবর্ণের অনন্তটি বাহির করিয়া, মানদার বাহু ধরিয়া ধীরে ধীরে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। দেখিল, দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া উমাকালী রোদন করিতেছেন। তাঁহার মলিন বেশ এবং পাদুকাবিহীন পদ দেখিয়া, জমীদারদিগের বাটীর পুরাতন 'ঝি' স্থির করিতে পারিল না যে, ঐ ব্যক্তিটি কোন ভদ্রলোক হইতে পারেন। বহুকাল জমীদারদের বাটীতে থাকিয়া তাহার এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, মানুষ ধোবা ও মুচির সাহায্য ব্যতীত ভদ্রলোক হইতে পারে না। অতএব সে উমাকালীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আ-মর, অলুক্ষণে মিন্‌সে! দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদিস্ কেন? এখন কনে বাড়ীতে ঢুকছে, এ সময় চোখের জল ফেলে অকল্যাণ করিস্ কেন?"

কথাটা গদাধরের কাণে গেল। পত্নীর পরিচারিকার হৃদয়হীন স্পর্দ্ধা সে আপন কাতর হৃদয়মধ্যে অনুভব করিল। হায়! কি

সাহসে এই নির্লজ্জা, তাহার পিতৃস্থানীয় পরম সুহৃৎকে অবজ্ঞার ভাষায় অপমানিত করিল! বিরক্তিবিজড়িতকণ্ঠে গদাধর নুলীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দাঁড়াও।"

নুলী মানদার বাহু ধরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "কেন গা জামাইবাবু, আমরা দাঁড়াব কেন?"

গদাধর তাহার চক্রবর্ত্তী কাকাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "এঁর পদধূলি গ্রহণ করে তোমরা গৃহ প্রবেশ করবে।"

নুলী অবাক্ হইয়া গদাধরের মুখের দিকে চাহিল। দেখিল, সে মুখ দিয়া যে আদেশ নির্গত হইয়াছে, তাহা অমান্য করিবার সাধ্য তাহার নাই। অগত্যা সে এবং মানদা উমাকালীর পদে প্রণতা হইল। কিন্তু এই ঘটনায় নুলী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গেল; এবং এই অপমানের প্রতিশোধ দিবার একটা ইচ্ছা সে মনোমধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিল। সে গদাধরের তৃণাচ্ছাদিত সামান্য মৃন্ময় গৃহে প্রবেশ করিয়া বুঝিল যে, তাহার বুকের নিধিকে জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে;—এ গৃহে রাজরাণীর কন্যা কিরূপে বাস করিবে? গ্রাম দেখিয়া, নুলী ভাবিল, "ও মা ও মা! এ গাঁয়ে নাকি মনিষ্যি বাস করতে পারে!"

পরদিন কুশণ্ডিকা ও পাকস্পর্শ হইল। গ্রামের সমস্ত লোক আসিয়া গদাধরের বাটীতে আহার করিল। সকলেই বলিল, এরূপ উপাদেয় আহারসামগ্রী তাহারা বহুকাল ভক্ষণ করে নাই।

তাহার পরদিন গদাধর তাহার চক্রবর্ত্তী-কাকার সহিত সাক্ষাৎ

করিয়া কহিল, "চক্রবর্ত্তী কাকা, আপনি যদি কয়েকটা বিষয়ের ভার গ্রহণ করতে পারেন, তা হলে বড় ভাল হয়।"

চক্রবর্ত্তী। কি ভার গ্রহণ করব, বল।

গদাধর। আপনি শুনেছেন যে, এই নাড়িচা গ্রামখানি, আমার শ্বশুর মশায় আমাকে বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দান করেছেন।

চক্রবর্ত্তী। শুনেছি বৈকি।

গদাধর। আমি কাগজ পত্র দেখে বুঝলাম যে, এই গ্রামে বৎসরে তের শ টাকা খাজনা আদায় হয়ে থাকে। এ থেকে প্রায় পাঁচ শ টাকা বার্ষিক সদর মালগুজারি দিতে হয়। বাকী আট শ টাকা মুনাফা পাওয়া যায়। খাজনা আদায়ের, আর কিস্তি কিস্তি মালগুজারি দাখিলের ভার আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।

চক্রবর্ত্তী। এ ত অতি সহজ কথা। আমি খাজনা আদায় করব, মালগুজারি দেবো, এবং মুনফার টাকা কলকাতাতে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো।

গদাধর। না, এই মুনাফার টাকা, আমি আমার কয়েকটি ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যে আপনার নিকট গচ্ছিত রাখতে চাই।

চক্রবর্ত্তী। কি ব্যয়?

গদাধর। প্রথম দু বছরের ১৬০০৲ টাকা মজুদ্ হলে, ও দিয়ে একটি ভাল রকম আটচালা তৈরি করাতে হবে।

চক্রবর্ত্তী। আটচালা কোথায় তৈরি করাব?

গদাধর। কেশব কামারের ভিটা, যাতে মোট এক বিঘা আট

কাঠা জমী আছে, বাবা বাগান করবার জন্যে খরিদ করতে চেয়েছিলেন। দাম হয়েছিল তিন শ টাকা। কিন্তু বাবার হাতে তখন তিন শ টাকা না থাকায়, ঐ জমী কিনতে তিনি পারেন নি। ঐ ষোল শ টাকা থেকে তিন শ টাকা দিয়ে ঐ জমী কিনতে হবে। ঐ জমীর চারপাশে সাত আট শ টাকা খরচ করে' একটি পাকা পাঁচিল দিতে হবে। তার মধ্যে ফুলগাছের বাগান তৈরি করে', ঐ বাগানের এক ধারে পাঁচ-ছ-শ টাকায় আটচালাটি বাঁধতে হবে।

চক্রবর্ত্তী। তার পর?

গদাধর। ছ বৎসর থেকে বার বৎসর বয়সের ছেলে গ্রামে ক'টি আছে?

চক্রবর্ত্তী। আমার অনুমান হয়, ত্রিশ চল্লিশ জনের বেশী হবে না।

গদাধর। এই ত্রিশ চল্লিশ জন ছেলেকে প্রত্যহ দু'পর বেলায় ঐ আটচালার মধ্যে একত্র করতে হবে।

চক্রবর্ত্তী। বাবাজি, এইটি অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। এই ক্ষুদে ছেলেগুলো তোমার চক্রবর্ত্তী-কাকাকে মোটেই গ্রাহ্য করে না। কিন্তু তুমি যখন বলছ, তখন চেষ্টা করে' দেখতে হবে। আমার মনে হয়, কিছু বাতাসা আর মুড়্কি খরচ করতে পারলে এ কার্য্য সহজ হবে।

গদাধর। বেশ, প্রত্যহ আট আনার বাতাসা আর মুড়্কি খরিদ করে' ছেলেদের খেতে দেবেন।

চক্রবর্ত্তী। প্রত্যহ এ কার্য্য করা কি আমার মত বুড়োর পক্ষে সম্ভব হবে?

গদাধর। তা কি কখনও সম্ভব হয়? আপনি অশ্বিনী সরকারকে জানেন? আমি তাকে এই কার্য্যের ভার দেব।

চক্রবর্ত্তী। বাপু হে, অশ্বিনী সরকার কায়স্থ সন্তান, লেখাপড়া জানে। সে কি কিছু বেতন গ্রহণ না করে' এ কার্য্য স্বীকার করবে?

গদাধর। বেতন দিতে হবে বৈকি। বোধ হয়, পঁচিশ টাকা বেতনেই সে এই কায, আর ছেলেদের একটু একটু লেখাপড়া শিখানর কায করতে স্বীকৃত হবে।

চক্রবর্ত্তী। খুব, খুব।

গদাধর। তা হলে, আমার বার্ষিক আট শ টাকা মুনাফা, তৃতীয় বৎসর থেকে এই রকমে খরচ হবে,—

মুড়্কি বাতাসা

মাসে ১৫৲ হিসাবে— ১৮০৲

অশ্বিনী সরকারের বেতন

মাসে ২৫৲ হিসাবে— ৩০০৲

তার পর যে তিন শ কুড়ি টাকা উদ্বৃত্ত হবে, তার দ্বারা আপনি আপনার ইচ্ছামত গ্রামের পথ ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করাবেন, আর আমার বাড়ীটি আবশ্যকমত মেরামত করাবেন।

আয় ব্যয় সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী-কাকার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া, এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত সমুদয় সমাধা করিয়া, নববধূকে লইয়া

গদাধর কালীদহ গ্রামে শ্বশুরবাটীতে বিবাহের প্রথা অনুযায়ী আগমন করিল।

এবার রত্নময়ী বাধ্য হইয়া জামাতার কিছু আদর করিলেন। ভাবিলেন, হিন্দুর ঘরের বিবাহ ত ফিরিবার নহে। কিন্তু যতবার সে জামাতার কৃষ্ণ-মুখ অবলোকন করেন, ততবার তাঁহার দারুণ অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয়। ইহার পর নুলীর মুখে যখন তিনি গদাধরের কণ্টকবনবেষ্টিত পর্ণকুটীরের শব্দালরঙ্কারসংবলিত বিবরণ শ্রবণ করিলেন, তখন তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন নুলীর কথা-গুলা, একটা বিষধরের দেহ ধারণ করিয়া, তাঁহার বস্ত্রের ভিতর, তাঁহার দেহকে বেষ্টন করিয়া, ধীরে ধীরে লেহন করিতেছে। সে সর্পের শীতল স্পর্শে যেন তাঁহার শরীরের তপ্ত রক্ত জল হইয়া যাইতেছে।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গদাধরের পাপ।

দুই চারি দিন শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিয়া, গদাধর রত্নেশ্বর বাবুর নিকট আসিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "মশায়, আমি কাল কলিকাতা যাবার ইচ্ছা করেছি, আপনি অনুমতি করলে যেতে পারি।"

রত্নেশ্বর। কাল কখন্ যাবে স্থির করেছ?

গদাধর। বিকালে ঝড় বাদলের আশঙ্কা আছে। এজন্যে মনে করেছি, কাল প্রত্যূষেই যাব।

রত্নেশ্বর। আহারাদি না করে' যাওয়া হতে পারে না। আহারাদি করে' যেতে হবে।

গদাধর। ভাল, আহারাদি করে' যাব। কিছু আগে আহার করলেই চলবে।

রত্নেশ্বর। যাবার আগে, আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দেব। আমি তোমার পিতৃস্থানীয়, আমার উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করলে তোমার মঙ্গল হবে।

গদাধর। কি করতে হবে বলুন।

রত্নেশ্বর। তুমি এখন কলিকাতায় যাচ্চ, যাও। কিন্তু দু চার মাসের পর, তোমাকে কালীদহে এসে বাস করতে হবে। তুমি

আমার জামাতা ;—তোমার সামান্য চাকুরি বা ওকালতি করা হবে না। আমি তোমার মাসহারা বরাদ্দ করে' দেব ; তুমি এখানে এসে বাস করবে।

গদাধর। আপনি যা অনুমতি করছেন, তা পালন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু কয়েকটা কাযের জন্যে আমাকে বাধ্য হয়ে কয়েক বছর কলকাতাতে থাকতেই হবে। তা ছাড়া, অলসভাবে বসে' মশায়ের অন্নধ্বংস করা, আর মাসহারা ভোগ করা অপেক্ষা, পরিশ্রমের দ্বারা কিছু উপার্জ্জন করা আমার ভাল মনে হয়। যা হোক, এ বিষয়ে পরে আমি আপনার উপদেশ নিয়ে কার্য্য করব।

রত্নেশ্বর। তাই ভাল। তবে মনে রেখ যে, আমার জামাতা হয়ে তোমার চাকুরী বা ওকালতি করা হবে না।

পরদিন আহারাদি করিয়া নৌকা চড়িয়া গদাধর কলিকাতা রওনা হইল। কিন্তু তাহার নৌকারোহণের পূর্ব্বে যে একটা ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা আমরা লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

বেলা দশটার সময়, জামাতা আহারে বসিলে, রত্নময়ী এক পরিচারিকাকে কহিয়াছিলেন যে, পূর্ণিমা উপলক্ষে অদ্য তিনি গঙ্গা-স্নানে যাইবেন। পরিচারিকা বুঝাইয়া দিল যে, যদি গঙ্গাস্নান করিতে যাইতে হয়, তাহা হইলে সে কার্য্য জামাতার বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বেই সমাধা হওয়া আবশ্যক ; কারণ কেহ বাটী হইতে যাইবার পর, বাটীর গৃহিণী স্নান করিলে যাত্রী ব্যক্তির অকল্যাণ হয়। কাযেই রত্নময়ী ত্বরিতপদে গঙ্গাস্নানে বাহির হইলেন। তাঁহার সহিত দুই-

জন পরিচারিকা বস্ত্রাদি লইয়া এবং একজন দ্বারবান্ স্কন্ধে দীর্ঘ বংশযষ্টি বহন করিয়া চলিল।

চাঁদনি ঘাটের পার্শ্বে একটি বৃহদাকার বটবৃক্ষ ছিল। বটবৃক্ষের তলায় একটি ক্ষুদ্র মৃত্তিকাস্তূপের উপর, চন্দন ও ঘৃতাদি লিপ্ত, এবং বিল্বপত্র ও পুষ্পাদি আচ্ছাদিত মসৃণদেহ একখণ্ড শিলা স্থাপিত ছিল। কোন্ অনাদি কাল হইতে এই শিলা সেই স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহা গ্রামের কোনও বৃদ্ধ লোক অবগত ছিল না। এই শিলাটি কালেশ্বর মহাদেব এই উপাধি ধারণ করিয়া, অনাদি কাল হইতে গ্রামবাসীর ভক্তি ও পূজা গ্রহণ করিত। হায় হায়! সেই পদহীন প্রস্তরখণ্ডের পদতলে না জানি কত বিমল ভক্তিপুঞ্জ অনাদিকাল হইতে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল; মস্তকহীন সেই প্রস্তরখণ্ডের মস্তকে, আমাদের লোলুপ জিহ্বাকে বঞ্চিত করিয়া, না জানি কত রাশি রাশি নবনীত, তক্র, দধি এবং তথাবিধ কত উপাদেয় এবং সুধাসম খাদ্যসামগ্রী বর্ষিত হইয়াছিল!

স্নান সম্পন্ন করিয়া, রক্তবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, সুকুন্তলা রত্নময়ী ক্ষুদ্র রৌপ্যাধারে পবিত্র গঙ্গাজল গ্রহণ করিয়া, কালেশ্বর মহাদেবের তপ্ত মস্তক, গঙ্গাজল-বর্ষণে শীতল করিবার মানসে অগ্রসর হইলেন। তিনি দেখিতে পান নাই যে, একটা বৃহদাকার বৃষ পূর্ব্বোল্লিখিত মৃন্ময় বেদিকার পার্শ্বে শুইয়া, প্রভু মহাদেবের প্রহরায় নিযুক্ত ছিল। রত্নময়ীকে সমাগত দেখিয়া, দেবতার বাহন শ্রীমান্ ষণ্ডেশ্বর জমীদারগৃহিণী বলিয়া কিছুমাত্র সম্মান প্রদর্শন করিল না। অপিচ, গাত্রোত্থান করিয়া, তাঁহার

রক্তাম্বরবেষ্টিত কোমল গাত্র বিদ্ধ করিবার জন্য, আপনার সূক্ষ্মাগ্র শৃঙ্গদ্বয় ঋজু করিয়া, রত্নময়ীর দিকে অতি বেগে ধাবিত হইল।

রত্নময়ীর শরীর রক্ষা করিবার জন্য যষ্টি স্কন্ধে লইয়া, তাঁহার সহিত যে দ্বারবান্ আসিয়াছিল, সে, এরূপ কালে অন্য দ্বারবান্‌গণ যাহা করিয়া থাকে, তাহাই করিল। এরূপ অর্ব্বাচীন ক্রোধোন্মত্ত ষণ্ডকে যষ্টির তাড়না করা বৃথা জানিয়া, যষ্টিটি যণ্ডেশ্বরের পদে আশু উপহার দিয়া বটবৃক্ষের রজ্জুশাখা গ্রহণ করিয়া উপরে উঠিয়া, সে একটি বৃহদাকার কুষ্মাণ্ডের ন্যায় ঝুলিতে লাগিল। সঙ্গিনী পরিচারিকা দুইটী প্রভুপত্নীর এবংবিধ বিপদ্ দেখিয়া, যেন শোকাবেগে জীবন বিসর্জ্জন করিবার জন্য, পবনগতিতে আসিয়া গঙ্গাজলে ঝম্প প্রদান করিল।

একাকিনী অসহায়া রত্নময়ী প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। তাঁহার আলুলায়িত কুন্তলরাশি পবনবেগে উড়িল। রক্ত বসনাঞ্চল চরণতলে লুটিল।

আহারাদি সমাপন করিয়া, কলিকাতা যাত্রার পূর্ব্বে, গদাধর শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য অন্তঃপুরমধ্যে আগমন করিয়াছিল। সে তথায় আসিয়া শুনিল যে, রত্নময়ী গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন। গঙ্গাতীরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া নৌকারোহণ করিতে পারিবে, মনে করিয়া গদাধর বাটী হইতে বাহির হইয়া গঙ্গা তীরাভিমুখে চলিল। তাহার পেটকাদি ভৃত্যগণ পূর্ব্বেই বহন করিয়া নৌকায় রাখিয়া আসিয়াছিল।

পথিমধ্যে বিপদ্‌গ্রস্তা রত্নময়ীকে দেখিয়া গদাধর বিপুলবেগে বৃষভের উন্নত শৃঙ্গের পার্শ্বে আসিয়া, হস্তদ্বারা সবলে তাহা ধারণ করিল। পরিত্রাণ লাভ করিয়া অবসন্নদেহা রত্নময়ী পথিমধ্যে বসিয়া পড়িলেন এবং পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার জামাতা আপন বিশাল কৃষ্ণ বাহুতে অমানুষিক শক্তি প্রকটিত করিয়া, দৃঢ় মুষ্টিতে বৃষের শৃঙ্গ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বৃষটা বহু চেষ্টা করিয়াও আর অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। বলা বাহুল্য, জামাতার মহাবলশালী দেহ দেখিয়া এবং তাহাকে আপন উদ্ধারকর্ত্তা মনে করিয়া, তাহার প্রতি রত্নময়ীর পূর্ব্ব ঘৃণাটা কিঞ্চিৎ উপশম প্রাপ্ত হইল।

ষণ্ডকে বিমুখ করিয়া, গদাধর নিকটে আসিয়া, শ্বাশুড়ীর পদে প্রণত হইয়া কহিল, "মা, আপনি অনুমতি করুন, আমি কলকাতায় যাই।"

রত্নময়ী কহিলেন, "এস, বাবা।"

জামাতাকে বিদায় দিয়া রত্নময়ী বাটী ফিরিয়া আসিলেন। কিয়ৎকাল পরে পরিচারিকাদ্বয় এবং দ্বারবান্‌টি, আপনাদের সুবুদ্ধি এবং পরাক্রম সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প রচনা করিয়া গৃহে ফিরিল। দ্বারবান্ সরকারের নিকট কহিল যে, যষ্টির আঘাতে সে ষণ্ডকে নিশ্চয় যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারিত, কেবল শিবের বাহনকে হিন্দু হইয়া মারা উচিত নয়, এই জন্য সে মারে নাই।

বিদায় লইয়া, গদাধর কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবার পর, কালীদহ গ্রামটি তাহার গুণাগুণের আলোচনায় বিশেষরূপে মুখরিত

হইয়া উঠিল। যদু রামকে বলিল, "বাবুদের জামাইটি যেন একটি আস্ত কসাই; বাবা কালেশ্বরের ষাঁড়টাকে আধ-মারা করেছে; দ্বারবান্‌টা না থাকলে, বোধ হয় একেবারে মেরেই ফেলত।"

তরুবালা তরঙ্গিণীকে ডাকিয়া, তাহার গাল টিপিয়া বলিল, "ওলো, রোজ যেত লো, রোজ যেত। এমন কুচরিত্রের জামাই ত ভাই, আমি কখন দেখিনি। আমার গায়ে যেন কাঁটা দেয়। আর অম্বিকারই বা কি বুকের পাটা! দিন দু'পরে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে, বুড়ো বাপের সাম্‌নে—ছি, ছি, ছি!"

কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়া মুলী অম্বিকাঘটিত কথাটা মানদাকে শুনাইল। তাহা মানদার এক শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়া অন্য শ্রবণপথ দিয়া বাহির হইয়া গেল। মানদার হৃদয় থাকিলে, হয়ত কথাটা তাহার হৃদয়ে স্পর্শ করিত; কিন্তু তাহার ত হৃদয় ছিল না। মৎস্য ভক্ষণের জন্য, অলঙ্কার পরিধানের জন্য, সধবার শত সুবিধা উপভোগ করিবার জন্য মানদার একটি স্বামীর প্রয়োজন। স্বামীকে ভালবাসিবার প্রয়োজন ছিল না, স্বামীর ভালবাসা না পাইলে দুঃখিত হইবার আবশ্যক আছে এরূপ জ্ঞানও বালিকা মানদার হৃদয়মধ্যে তখনও উদিত হয় নাই। কেবলমাত্র জীবিত থাকিয়া তাহার মৎস্যাহারের এবং ভূষণধারণের সুবিধা করিয়া দিয়া, স্বামী যাহা ইচ্ছা তাহাই করুক, তাহাতে মানদার আপত্তি ছিল না। তাহার নিকট, স্বামীর স্নেহ লাভ করা অপেক্ষা আভরণ এবং মৎস্যপুচ্ছের সমাদর অধিক ছিল। আমাদের ভরসা আছে, একটু বয়স হইলে, বালিকা মানদার এ দোষটা কাটিয়া যাইবে।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মানদার কলিকাতা যাত্রা।

কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া গদাধর দেখিল যে, তাহার নামে একখানি সমন আসিয়াছে; পুলিস আদালতে আসামীর পক্ষে তাহাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে; আসামীর নাম বলদেব আচার্য্য; আগামী সোমবার মকদ্দমার দিন ধার্য্য হইয়াছে। আসামী চৌর্য্যাপরাধে ধৃত হইয়াছে। আপনার স্মরণশক্তিকে বিশেষরূপ প্রপীড়িত করিয়াও গদাধর স্মরণ করিতে পারিল না যে, এই চুরির আসামী বলদেব আচার্য্যটি কে। অনেক চিন্তা করিল, কিন্তু ঐ নামটি কখনও শুনিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না।

সোমবারে পুলিস আদালতে উপস্থিত হইবার পর, এ সমস্যার মীমাংসা হইল। তখন সে জানিল যে, চুরির আসামী বলদেব আচার্য্য আর কেহই নহে, সেই ঘটক ঠাকুর। ঘটক ঠাকুর অনেক পীড়াপীড়ির পর পুলিশের কর্ম্মচারিগণকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, তাঁহার কচ্ছ-প্রচ্ছাদিত রজতমুদ্রা সকল ঘটকতার পুরস্কার-স্বরূপ তিনি আলিপুরের জজ-আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু গদাধর মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই বাক্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সাক্ষিস্বরূপ তিনি গদাধরকে সমন করাইয়াছিলেন। গদাধর আদালতে আসিয়া,

বিচারকের নিকট সকল কথা বিবৃত করিয়া, বেপমান্ ব্রাহ্মণকে পুলিসের ভীম কবল হইতে মুক্ত করিয়া দিল।

ব্রাহ্মণ আপন যজ্ঞোপবীত আপন সম্প্রসারিত হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে ধারণ করিয়া, গদাধরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, এবং জলপূর্ণ চক্ষু ও টাকার পুঁটুলি লইয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণের পুঁটুলিতে তখন আর পাঁচ শত টাকা ছিল না। তা' না থাক্; যাহা ছিল, তাহার পক্ষে তাহাই ঢের।

উপরোক্ত ক্ষুদ্র ঘটনায় গদাধরের এক মহা উপকার ঘটিল। সে কলিকাতার পুলিস আদালতে পরিচিত হইল। সাক্ষ্য-গ্রহণ কালে তাহার বিশুদ্ধ উচ্চারণযুক্ত উৎকৃষ্ট ইংরাজি বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রধান ইংরাজ-বিচারক বলিয়াছিলেন যে, এরূপ বিশুদ্ধ ইংরাজি তিনি আর কখনও অন্য কোনও বাঙ্গালীর মুখে শ্রবণ করেন নাই। বিচারকের এইরূপ উক্তির যে ফল হওয়া সম্ভব ছিল, গদাধর সে ফল লাভ করিল। ইহার পর, আলি-পুর আদালতের ন্যায়, পুলিস আদালতেও প্রত্যেক জটিল বিচার ব্যাপারে বিচারপ্রার্থিগণ গদাধরের আশ্রয় গ্রহণ করিত, এবং আইন সম্বন্ধে তাহার সুগভীর জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আপনা-দিগের ন্যায্য স্বত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইত। তাহার সুখ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সকলেই জানিল যে কলিকাতাতে তাহার ন্যায় পারদর্শী আইনজ্ঞ ব্যক্তি আর নাই।

ইহার পর যখন "ডি, এল" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, গদাধর হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিল, তখন মুখে মুখে তাহার সুযশ

কীর্ত্তিত হইল। দিক্‌সকল তাহার যোগ্যতার যশোগানে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। স্বয়ং লক্ষ্মী গদাধরের খ্যাতিগান শুনিয়া, তাহার প্রতি কৃপাকটাক্ষ বর্ষণ করিলেন; আপনার ভাণ্ডার খুলিয়া অর্থ-রাশি গদাধরের গৃহে ঢালিয়া দিলেন। যে দীন বালক একদিন চারি ক্রোশ পথ নগ্নপদে ভ্রমণ করিয়া বিদ্যারম্ভ করিয়াছিল, আজ সে কলিকাতার মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। বিদ্যায়, সম্মানে, সম্পদে তাহার মত তখন সমস্ত বাঙ্গালাদেশে আর কে ছিল?

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর বাবু মানদাকে কলিকাতায় গদাধরের নিকট পাঠাইতে অভিলাষী ছিলেন না। কন্যার প্রতি তাঁহার অত্যধিক স্নেহ প্রযুক্ত তিনি মনে করিতেন যে, কলিকাতায় আসিয়া স্বামিগৃহে বাস করিলে সে অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইবে। সু-আহার এবং অভিলাষ-অনুযায়ী বসন-ভূষণ কিছুই প্রাপ্ত হইবে না, এবং অতিরিক্ত গৃহকার্য্য করিয়া অসুস্থ হইয়া পড়িবে।

কিন্তু কয়েকটা ছুটী উপলক্ষে অবসরমত শ্বশুরালয়ে আগমন করিয়া কলিকাতা সম্বন্ধে নানারূপ গল্প করিয়া, গদাধর কলিকাতা-দর্শনাভিলাষিণী বালিকা মানদার মনটি বিশেষরূপ বশীভূত করিয়া লইয়াছিল। এবং তাহার মনোমধ্যে এরূপ আগ্রহময় এক কৌতূহলের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল যে, মানদা স্বেচ্ছায় নুলীর দ্বারা তাহার পিতা-মাতাকে জানাইল, কলিকাতায় যাইবার জন্য সে একান্ত উৎসুক হইয়াছে। ইহা ছাড়া গদাধর তাহার অসাধারণ বাক্‌পটুতার দ্বারা রত্নেশ্বর বাবুর, ইতিপূর্ব্বে কথিত, অনুরোধ সকলকেও নিরস্ত করিয়াছিল।

এক্ষণে মানদাকে কলিকাতায় পাঠাইতে কিংবা গদাধরের কলিকাতা বাসে রত্নেশ্বর বাবুর আর কোনও আপত্তি ছিল না। তিনি গদাধরকে কালীদহ গ্রামে আসিয়া তাঁহার জমীদারী দেখিবার জন্য আর অনুরোধ করিতেন না। কন্যাকে স্বামিগৃহে পাঠাইবার অনিচ্ছাটাও কন্যার আপন ইচ্ছার দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার কেবল মাত্র একটি আপত্তি ছিল; মানদা চিরদিন দ্বিতল গৃহে বাস করিয়াছে—কলিকাতায় যাইয়া সে গদাধরের একতল গৃহে বাস করিতে পারিবে না।

গদাধরের প্রচুর ধনসমাগম হওয়ায়, গৃহটি সে কেবল মাত্র দ্বিতল নহে, ত্রিতল করিয়া প্রস্তুত করিল। এবং পার্শ্বস্থিত পাঁচ বিঘা পরিমাণ ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া, তাহাতে মনোরম পুষ্প-বাটিকা রচনা করিল। তৎপরে গৃহকার্য্যের জন্য এবং মানদার শুশ্রূষার জন্য অতিরিক্ত দাসদাসী নিযুক্ত করিল।

এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া, মানদাকে কলিকাতায় পাঠাই-বার জন্য অনুরোধ করিয়া, সে রত্নেশ্বর বাবুকে এক পত্র লিখিল। পত্রের উত্তর পাইয়া সে কালীদহ গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কন্যাকে স্বামিগৃহে পাঠাইবার পক্ষে রত্নেশ্বর বাবুর আর কোন আপত্তি উত্থাপন করিবার কারণ ছিল না। তিনি একটা শুভ দিন দেখিয়া মানদাকে গদাধরের সহিত কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, পট্টবস্ত্রপরিহিতা নুলী মানদার সহগামিনী হইল। এই ঘটনাটা গদাধরের বিবাহের ঠিক চারি বৎসর পরে ঘটিয়াছিল।

তোমরা যদি মনে করিয়া থাক যে, স্নেহময় পিতামাতাকে

ছাড়িয়া, বাল্যখেলার সঙ্গিনীগণকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করিয়া, চির-অভ্যস্ত চিরপরিচিত পিতৃগৃহ ফেলিয়া, কলিকাতা যাইবার কালে মানদা বসনাঞ্চলে অশ্রু-প্লাবিত মুখ লুকাইয়া অন্য বালিকার ন্যায় রোদন করিয়াছিল, তাহা হইলে তোমরা তাহাকে এখনও কিছুমাত্র চিনিতে পার নাই। গৃহ পরিত্যাগ কালে, মানদার নয়নকোণে কেহ এক বিন্দু অশ্রু দেখিতে পায় নাই। আপন মনোভিলাষের সাফল্য জন্য যে দ্রব্যের বা যে ব্যক্তির আবশ্যক, তাহা পাইলেই মানদার মন পরিতৃপ্ত থাকিত। কলিকাতার অপূর্ব্বত্ব দেখিবার বিশেষ বাসনাটি পূর্ণ করিবার জন্য এখন তাহার স্বামীকে প্রয়োজন ছিল, তাই সে পুলকভরে, নৌকায় আরোহণ করিয়া গদাধরের পার্শ্বে বসিল। তাহার পুলকপূর্ণ হৃদয়ে জনকজননীর বিচ্ছেদ-ব্যথাটা স্থান লাভ করিতে পারে নাই। মৃগমদগন্ধবিহ্বল মৃগের ন্যায় তাহার মনটা একটা অপরিচিত আনন্দের অনুসন্ধানে ছুটিয়াছিল; আর পশ্চাৎ ফিরিয়া, পিতার দুঃখকাতর মুখ দেখিবার অবসর তাহার ছিল না। একমাত্র প্রিয়তমা কন্যাকে বিদায় দিতে রত্নেশ্বর বাবুর মুখমণ্ডলে যে কাতরতার ছায়া পড়িয়াছিল, তাহা অবলোকন করিয়া বরং গদাধরের নয়নপ্রান্ত আর্দ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু কাতর স্নেহময় পিতার ম্লান মুখের সে মলিন ছায়া হৃদয়হীনা মানদার হৃদয়মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয় নাই। মানদা পৃথিবীর কাহাকেও ভালবাসিত না; কেবল সে আপনাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। সম্মুখে দর্পণ রাখিলে যে মুখখানি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইত, মানদা জানিত

পৃথিবীতে সে মুখের তুলনা নাই। যে মৎস্যজীবিনী তাহার জন্য ইলিশ মৎস্যের ডিম্ব প্রতিদিন আহরণ করিত, মানদা জানিত পৃথিবীতে মানদারই জন্য সে সৃষ্ট হইয়াছে। নৌকায় বসিয়া মানদা ভাবিতেছিল, এই যে গঙ্গা রজত-বিনির্ম্মিত রাজপথের ন্যায় বিস্তৃত রহিয়াছে, ইহা কেবলমাত্র তাহাকে কলিকাতায় লইয়া যাই-বার জন্য পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছে। উপকূলবিরাজিত বিটপ-শাখায় বসিয়া যে সকল বিহঙ্গ গান গাহিতেছিল, মানদার মনে হইতেছিল যেন ভগবান্ তাহাদিগকে তারই জয়গান করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। মানদা পৃথিবীর কাহারও জন্য সৃষ্ট হয় নাই; পৃথিবীর সকলে তাহার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। তাহার পিতামাতা তাহার জন্য কাঁদিবে; কিন্তু সে তাঁহাদের জন্য কাঁদিবে কেন? সে হাসিতে হাসিতে কলিকাতায় চলিল।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অম্বিকার ভালবাসা।

কিন্তু গদাধরের মনে সুখ ছিল না। সে নৌকার মধ্যে নীরবে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া ছিল, মধ্যাহ্নের ভাস্বর জলচ্ছবি তাহার চক্ষে নিতান্ত মলিন বলিয়া বোধ হইতেছিল। জাহ্নবীর জলপ্রবাহ অতি বিশাল অশ্রুপ্রবাহ বলিয়া তাহার ভ্রম জন্মিতেছিল। তীরভূমি-পরিশোভিত বৃক্ষাবলীর আন্দোলন-মধ্যে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইতেছিল। কেন?

মানদাকে লইয়া কলিকাতা যাত্রার পূর্ব্বে, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের পদধূলি গ্রহণ করিবার জন্য, সে অম্বিকাদের বাটীতে গিয়াছিল। তথায় কৃষ্ণ চাটুর্য্যে গদাধরকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ সম্বন্ধে নানাবিধ সদুপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। গদাধরকে উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া তিনি কহিলেন, "গদাধর, তুমি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে অম্বিকার সঙ্গে দেখা কর; তার সঙ্গে দেখা না করে তুমি যদি কলকাতা চলে যাও, তাহা হলে সে ভারি দুঃখিত হবে। সে তোমাকে বড়ই ভালবাসে।"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় যে ভালবাসার কথা বলিলেন, তাহা অত্যন্ত সহজ ভালবাসা। এরূপ ভালবাসা আমরা নিত্য শত

শত লোককে বাসিয়া থাকি। আমরা সংসারে থাকিয়া নিত্য বলি, অমুক অমুকের ছোট ছেলেকে ভালবাসে, অমুক অমুকের ভ্রাতাকে ভালবাসে, অমুক অমুকের পিতাকে ভালবাসে। এ ভালবাসা ভালবাসা মাত্র; ইঁহাতে উপন্যাসাদিতে বর্ণিত প্রণয়ের গন্ধ মাত্র নাই। গদাধর আপনার সহজ মন লইয়া যদি এই ভালবাসার কথাটা শ্রবণ করিত, তাহা হইলে সেই ভালবাসার অর্থ আমরা যেরূপ বুঝিতেছি, হয়ত সেও সেইরূপ বুঝিত। কিন্তু সে বাল্যে যাহার নিকট বিদ্যারম্ভ করিয়াছিল, যৌবনে যাহাকে সে সঙ্গিনীরূপে লাভ করিতে পারিয়াছিল, যে মহিমময়ী তাহার পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে দেববালার ন্যায় বসিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিল, যে দেবী আপন জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়া তাহাকে জলনিমজ্জন হইতে উদ্ধার করিয়াছিল; যাহার সহিত বিবাহ হইবে মনে করিয়া সে কয়েক দিন যেন স্বর্গ-স্বপ্নঘোরে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল, সেই শ্রেষ্ঠা, মধুরা অম্বিকাকে গদাধর যেরূপ ভালবাসিত তাহা সামান্য নহে। তাহা তাহার সমস্ত হৃদয়কে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহা আগ্নেয় গিরির গর্ভস্থ তপ্ত প্রস্রবণের ন্যায়, কর্ত্তব্যের কঠিন প্রস্তরাবরণ উদ্ভিন্ন করিয়া সবেগে উৎক্ষিপ্ত হইবার জন্য, তাহার পঞ্জর মধ্যে বারংবার সবেগে আঘাত করিতেছিল। মনের ভিতর দুর্দ্দমনীয় এই ভালবাসা লইয়া গদাধর শুনিল যে, অম্বিকা তাহাকে বড়ই ভালবাসে। এ ভালবাসার অর্থ আমরা যেরূপ বুঝিয়াছিলাম, সে সেরূপ বুঝিল না। তাহার মনটা অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এই চঞ্চল মন লইয়া, সে গৃহ মধ্যে অম্বিকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। কহিয়াছিল, "অম্বিকা! আমি কলকাতা যাচ্চি, তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।"

অম্বিকা স্বর্গের ছবির ন্যায় তাহার অতি বিশাল দুইটি চক্ষু গদাধরের সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর বোধ হয় শীঘ্র কালীদহে আসবে না?"

গদাধর। না, আর শীঘ্র কালীদহে আসা ঘটবে না। বহুকাল আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না। তুমি আমাকে চিঠি লিখবে ত?

অম্বিকা। আমি ত তোমাকে বরাবর রীতিমত চিঠি লিখে থাকি। তুমি কেমন থাক তা মাঝে মাঝে আমাদের লিখো। আর যদি কখনও অবকাশ পাও, তা হলে মানদাকে নিয়ে মাঝে মাঝে কালীদহে এস।

গদাধর। এ রকম অবকাশ পাবার কোনও ভরসা নেই। তবু তুমি বলছ বলে আসবার চেষ্টা করব। কিন্তু না এলেও এই কালীদহ গ্রামটাকে আমি কখনও ভুলব না। এ গ্রামের কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। মনে আছে, এই গ্রামে তোমার কাছে আমার বিদ্যারম্ভ হয়েছিল। তোমার দেওয়া আংরাখায় এ দেহ প্রথম আচ্ছাদিত হয়েছিল। তোমার দেওয়া সজ্জায় সজ্জিত হয়ে আমি এই গ্রাম থেকেই প্রথম কলকাতায় গিয়েছিলাম। এই গ্রামের সম্মুখে গঙ্গাজলে তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছিলে। এ গ্রামকে আমি কখনও ভুলব না।

অম্বিকা। যে গ্রামে তোমার বিবাহ হয়েছে, তা তোমার প্রিয় ; তাকে তুমি ভুলবে কি করে ?

গদাধর। না, এ বিবাহের কথাও ভুলতে পারব না। কিন্তু এ বিবাহটা ভোলবার যদি উপায় থাকত !

অম্বিকা। এ বড় আশ্চর্য্য কথা ! যখনই এ বিবাহের কথা তোমাকে আমি বলেছি, তখনই এ বিবাহ ঘটেছে বলে তুমি দুঃখ প্রকাশ করেছ। কেন ? মানদা সুন্দরী, গুণবতী, তাকে নিয়ে তুমি সুখী হবে না কেন ?

গদাধর। সুখী হতে সাধ্যমত চেষ্টা করছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সুখী হতে পারি নি। যে চাতক জল চায়, তাহার সমুখে গোলাপ সুবাসিত সুমিষ্ট পরমান্ন রাখলে কি সে সুখী হয় ? আমার পিপাসিত মন যখন একটি স্নিগ্ধ জলধারার অন্বেষণে ছুটেছিল, তখন ভগবান কোথা থেকে মানদাকে এনে আমার সুখের পথ রুদ্ধ করে দিলেন !

অম্বিকা। ভগবান্ যা দিয়েছেন, তা ভগবানের দান মনে করে' তার প্রতি অনাদর কোর না।

গদাধর। না, আমি মানদাকে কখনও অনাদর করব না। স্বামীর যা কর্ত্তব্য, প্রাণপণ শক্তিতে তা আমি প্রতিপালন করব। কিন্তু সুখী হতে পারব না।

অম্বিকা। কর্ত্তব্য প্রতিপালনই সুখ ; এ ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনও সুখ নেই।

গদাধর। অম্বিকা! তুমি বোধ হয় কাকেও কখনও ভালবাস নি ; বাসলে বুঝতে আমার দুঃখটা কি।

অম্বিকা। আমি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, কাকেও ভালবাসলে আমি অধর্ম্মে পতিত হব। তবু—আমি তোমাকে লুকাব না, —আমি ভালবেসেছি। সে ভালবাসায় পৃথিবীর কোন উপকার হবে না মনে করে, কষ্টে তা মনের মধ্যে গোপন রেখেছি। আমার যে চিরবাঞ্ছিত, সেও জানে না যে, আমি তাকে কতখানি ভালবাসি। তোমার দুঃখটা যে কি তা আমি বিলক্ষণ অনুভব করতে পেরেছি। আপনার মন দিয়ে, তোমার মনের কষ্ট বুঝেছি। কিন্তু ভাই, এ দুঃখ নিবারণের উপায় কি? আপনার সুখ দুঃখের চেয়ে যদি আপনার কর্ত্তব্যকে বড় করতে পার, তা হলেই দুঃখের অবসান হবে। কুরুক্ষেত্রের মহারণে পুরুষোত্তম অর্জ্জুন বাসুদেব কর্ত্তৃক পরিচালিত দিব্য রথে বসে যখন স্বজন-বধ আশঙ্কায় ব্যথিত হয়েছিলেন, তখন ভগবান্ তাঁকে আশ্বস্ত করে উপদেশ দিয়েছিলেন,—

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

তুমিও ভাই, আপনার কাম্য বস্তুকে উপেক্ষা করে' নির্ম্মম কর্ত্তব্য পালনের দ্বারা শান্তিলাভ কর। যদি তুমি কাকেও ভালবেসে থাক, তা হলে সেই ভালবাসা ভুলতে হবে ; মনকে

দমন করতে শিক্ষা করতে হবে। চিত্তদমন ব্যতীত, পৃথিবীতে শান্তিলাভের উপায় নেই।

গদাধর। তুমি বলছিলে, তুমিও আমার মত কাকেও ভালবেসেছ। আমি জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি সে ভালবাসা ভুলতে পেরেছ ?

অম্বিকা। না, আমি তা ভুলতে পারি নি। ইহজীবনে কখনও তা ভুলতে পারব, এমন ভরসা নেই।

গদাধর। তবে আমাকে কেন আমার ভালবাসা ভুলতে বলছ ? তুমি যা পার নি, আমি কি করে তা পারব ?

অম্বিকা। আমি বিশ্বাস করি যে, আমি যা পারি নি, তুমি তা করিতে পারবে। আমি দুর্ব্বলা, পাপিষ্ঠা; আমি আমার হৃদয়কে শাসন করতে পারি নি। তুমি তোমার দেব-চরিত্র নিয়ে, হৃদয়ের অমিত বল নিয়ে, আপনার মোহপ্রাপ্ত চিত্তকে দমিত করে পরমা শান্তি উপভোগ কর। যা পাবার নয়, তা পাবার আশায়, উন্মত্তের মত পৃথিবীতে ঘুরে পৃথিবীকে অশান্ত কোর না; আপনি অসুখী হোয়ো না। তুমি সুখী হলে আমরা দূর থেকে তোমার সুখপূর্ণ বিষাদশূন্য শুভ জীবন দেখে সুখী হব। বল ভাই, যা পেয়েছ, তা নিয়ে তুমি সুখী হতে চেষ্টা করবে।

গদাধর। অম্বিকা, আমি বারবার প্রাণপণ শক্তিতে তোমার কথা প্রতিপালন করতে চেষ্টা করেছি, আর চিরদিন করব। এই একটা বিষয়ে, তোমার কথা অবহেলা করবার ইচ্ছা আমার

মনে উদিত হয়েছিল। কিন্তু না, তোমার কথাই শুনব। যা পেয়েছি, তা নিয়েই সুখী হতে চেষ্টা করব। বামন হয়ে আকাশের চাঁদের আশায় আর ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে থাকব না।

অম্বিকা। আমি কায়মনোবাক্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার চেষ্টা যেন ফলবতী হয়। এস, আজ বিদায় দেবার সময় তোমার পদধূলি গ্রহণ করি।

এই বলিয়া কমলপলাশলোচনা, গদাধরের পদপ্রান্তে প্রণতা হইল। করদ্বয় বিস্তার করিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। কুসুমসদৃশ দিব্য কোমল করস্পর্শে, গদাধরের সর্ব্বাঙ্গ পুলকভরে শিহরিয়া উঠিল। হায়! এই পদপ্রান্ত-পতিত পবিত্র করপুষ্প-যুগলের মালা গাঁথিয়া যদি সে বক্ষে ধরিতে পারিত!

অম্বিকা উঠিয়া দাঁড়াইল। গদাধর স্পষ্ট দেখিল, পদ্মপলাশে নীহারবিন্দুর ন্যায়, নীলাকাশে নক্ষত্রের দীপ্তির ন্যায়, পীতাম্বরের বক্ষঃশোভা কৌস্তুভমণির ন্যায়, এক বিন্দু অশ্রু পদ্মের মত, আকাশের মত, ভগবানের হৃদয়ের মত অম্বিকার নয়নপ্রান্তে জ্বলিতেছে।

মানদার পার্শ্বে নৌকায় নীরবে বসিয়া বিমর্ষ গদাধর অম্বিকার এই অশ্রুর কথা ভাবিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে, কুইনিনের উপর এক ফোঁটা তীব্রাম্ল পড়িলে যেমন তাহা দ্রবীভূত হইয়া যায়, গদাধরের তিক্ত শুষ্ক শুভ্র কর্ত্তব্যপরায়ণতা সেই এক ফোঁটা অশ্রু-জলে তেমনই বিগলিত হইয়া যাইতেছিল। অম্বিকা তাহাকে বলিয়াছিল যে, সেও ভালবাসিয়াছে;—কাহাকে? অম্বিকা বোধ

করি তাহাকেই ভালবাসে। গঙ্গার তরঙ্গকল্লোল তাহার হৃদয় মধ্যে ধ্বনিত হইয়া তাহাকে বলিয়া দিতেছিল যে, অম্বিকা তাহাকেই ভালবাসে। নৌকার ক্ষেপণী সকল জলমধ্যে শব্দ করিয়া কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের ন্যায় যেন মানুষের ভাষায় গদাধরের কাণের কাছে বারবার বলিতেছিল, "অম্বিকা তোমায় বড় ভালবাসে!"

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অম্বিকার দুঃখ।

অশ্রুপূর্ণলোচনে গদাধরকে বিদায় দিয়া আপন শয্যাকক্ষে যাইয়া, অতি কষ্টে অম্বিকা আপন অশ্রুবেগ প্রশমিত করিল। হায়! যাহাকে পাইবার নয়, সে কেন তাহাকে ভালবাসিল? যে ভালবাসা প্রকাশ করিবার নয়, তাহা কিরূপে তাহার হৃদয় মধ্যে সঞ্চারিত হইল? হে ভগবান্! যদি তাহার ভাগ্যে বিবাহ না লিখিলে, তবে তাহাকে ভালবাসাশূন্য, নিষ্প্রাণ করিয়া কেন সৃষ্টি করিলে না? এ পাপ, হৃদয়মধ্যে বহন করিয়া সে কিরূপে জীবিত থাকিবে?

তুমি উপন্যাসপাঠক! তুমি হয়ত বলিবে, ভালবাসা পবিত্র জিনিস, ভালবাসায় পাপ কোথায়? ভালবাসা পবিত্র জিনিষ এবং ভালবাসায় পাপ নাই, তাহা সত্য। কিন্তু যে ভালবাসা আমাদের সংসারে প্রচলিত আছে, তাহা নিতান্ত পবিত্র জিনিষ নহে; তাহা মোহমাত্র। কাহারও রূপ দেখিয়া, বা কাহারও গুণ বুঝিয়া, আমরা যে ভালবাসিয়া থাকি, তাহা মোহের নামান্তরমাত্র। অন্যান্য রিপুকে বশীভূত রাখিয়া তাহাদের দ্বারা যেমন সংসারের শুভ সংসাধন করিয়া লইতে পারা যায়, তেমনই এই ভালবাসারূপ মোহটাকে সংসারে নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে রাখিয়া, তাহা হইতে সংসারের

অনেকটা মঙ্গল করিয়া লইতে পারা যায়। ভালবাসাটা যতক্ষণ গণ্ডীর মধ্যে থাকে, ততক্ষণ তাহা মঙ্গলময়; গণ্ডী অতিক্রম করিলেই, তাহা রশ্মিবিচ্যুত অশ্বের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় হইয়া পড়ে। ভগ্নবাঁধ স্রোতস্বতীর ন্যায় বন্যাজলে পৃথিবীর মধ্যে হাহাকার ছড়াইয়া দেয়। পুত্রের প্রতি পিতার যে ভালবাসা, যাহাকে আমরা স্নেহ বলি—তাহা যদি পুত্রের প্রতি অর্পিত না হইয়া পাত্রান্তরে অর্পিত হয়, তাহা হইলে তাহা পুত্রকে পিতৃদ্বেষী করিয়া তুলে; এবং তাহা যদি পুত্রের প্রতি অপরিমিত ও অসংযতভাবে বর্ষিত হয়, তবে তাহাও পুত্রকে উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলে। স্বামীর প্রতি পত্নীর যে ভালবাসা—যাহাকে আমরা প্রণয় বলি—তাহা যদি পুরুষান্তরের অনুসন্ধানে প্রধাবিত হয়, তাহা হইলে, বহু ক্ষেত্রে তাহাতে স্বামীকে নির্ম্মম নরঘাতী করিয়া তুলে। সংযত ভালবাসায় পৃথিবীতে যেমন কল্যাণ আনয়ন করে, অসংযত উচ্ছৃঙ্খল ভালবাসায় তেমনই অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। তোমরা ভালবাসিও; কিন্তু সংযমের গণ্ডীর মধ্যে তাহাকে আবদ্ধ রাখিও।

অম্বিকা তাহার ভালবাসাকে সংযমের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে সমর্থ হয় নাই; যাহাকে ভালবাসা উচিত নয়, তাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াছিল। তাই অন্তর মধ্যে প্রাণভরা এই ভালবাসা লইয়া, লোকে চিত্ত দমনে যে শান্তি লাভ করিতে পারে, তাহা সে লাভ করিতে পারে নাই। বুদ্ধিমতী আপনার পাপ আপনার হৃদয় মধ্যে অনুভব করিয়া একান্ত অবসন্না হইয়া পড়িয়াছিল।

এ ভালবাসা অব্যক্ত রাখিতে পারিলে, হৃদয়ের সংগোপন স্থানে

তাহা লুকাইয়া রাখিতে পারিলে, বুঝি কিছু মঙ্গল হইতে পারিত। কিন্তু অম্বিকা কি তাহা গোপন রাখিতে পারিবে? তাহার পরিপূর্ণ হৃদয় যে সামান্য আন্দোলনে উছলিয়া পড়িতেছিল; গদাধরকে কেন সে বলিল যে, সে কাহাকেও ভালবাসিয়াছে? তাহাকে বিদায় দিবার সময় কেন তাহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইয়া পড়িল?

অম্বিকা ভাবিল, "গদাধর বলিতেছিল, সে কাহাকেও ভালবাসিয়াছে;—কাহাকে? আমাকে সে ভালবাসিয়াছে;—আমার ভালবাসা দিয়া আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। সে আমাকে ভালবাসে, আমি তাহাকে ভালবাসি;—তথাপি তাহাকে সেবা করিবার অধিকার হইতে আমি বঞ্চিত হইয়া রহিলাম—তথাপি আমি তাহাকে পূজা করিতে পারিলাম না! হে ভগবান্! তবে কেন আমাকে এ পৃথিবীতে রাখিয়াছ? পৃথিবীতে থাকিলে, হয়ত একদিন আমার এ ভালবাসা ব্যক্ত হইয়া পড়িবে; লোকে তাহার নিন্দা করিবে। আমার নিন্দা করিলে ক্ষতি ছিল না; কিন্তু তাহার নিন্দা আমি সহ্য করিতে পারিব না। তাহার নিন্দা শুনিবার আগে আমার যেন মৃত্যু ঘটে। আমার কোষ্ঠীর ফল এই যে, আমি জলমগ্না হইয়া মৃতা হইব। পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গার কাছে, এ পতিতা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছে, গদাধরের নামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবার পূর্ব্বে যেন সে গঙ্গার শীতল গর্ভে স্থান লাভ করিতে পারে।"

তাহার পাপের আকর্ষণে, তাহার সংসর্গে আসিয়া, গদাধর পাছে জনসমাজে নিন্দিত হইয়া পড়ে, এজন্য অম্বিকা প্রতিদিন মৃত্যু

কামনা করিতে লাগিল। প্রতিদিন কাতর স্বরে ভগবান্‌কে ডাকিয়া, আপনার আশু মৃত্যু লাভের প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। প্রতিদিন গঙ্গার উপকূলে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "পতিতপাবনি মা আমার! এ পাতকিনীকে, এ আবর্জ্জনাকে তোমার পবিত্র তরঙ্গাঘাতে পৃথিবীর পবিত্র গাত্র হইতে বিধৌত করিয়া পৃথিবীর অশান্তির ভয় নিবারণ কর। অয়ি বিঘ্নবিনাশিনি, এই মহাবিঘ্নকে গদাধরের উন্নতির পথ হইতে তোমার তরঙ্গতাড়নে বিতাড়িত কর।" প্রতিদিন যমরাজকে ডাকিয়া সে কহিল, "এ পাপকে যদি অতিশীঘ্র তোমার যমালয়ের অন্ধকার মধ্যে না লুকাইয়া রাখিতে পার, তাহা হইলে ইহা পৃথিবীমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।"

বলা বাহুল্য, আপনার মৃত্যু কামনা করিবার আগে, অম্বিকা হৃদয়কে শাসিত করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিল। কারণ সে জানিত যে, আপনাকে হত্যা করিবার ইচ্ছাটা, অন্যকে হত্যা করিবার ইচ্ছার ন্যায় একটা মহাপাপ। কিন্তু সে আপনার হৃদয়কে কোনও ক্রমে শাসিত করিতে পারে নাই। যতবার সে গদাধরকে ভুলিব বলিয়া মনে করিয়াছিল, ততবার গদাধর আরও উজ্জ্বলবেশে তাহার মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া, আরও অমোঘ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

অম্বিকা গদাধরকে ভুলিতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, গদাধরের অশুভ আশঙ্কায় আপনার ধ্বংস কামনা করিতেছিল। গদাধরের উন্নতি-পথে আপনাকে কণ্টক মনে করিয়া, তাহা অপসারিত করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মানদার পতিভক্তি।

কলিকাতায় আসিয়া মানদা অবাক্ হইয়া গেল। কি বড় বড় বাড়ী! কি অনন্ত শকটশ্রেণী! কি কলকলায়মান জনপ্রবাহ! ভাগীরথী-বক্ষে পোতসকলের গুণবৃক্ষসকল কি নিবিড় অরণ্যানী সৃষ্টি করিয়াছে! সে প্রতিদিন সকালে এবং বিকালে আপনাদের গাড়ী চড়িয়া, নুলীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত। কলিকাতা দেখিয়া, সে কখনও আর কালীদহে ফিরিবার আকাঙ্ক্ষা রাখিল না।

গদাধর তাহাকে পশুশালা, যাদুঘর, দেবালয়, থিয়েটার, বাগান, মাঠ, সার্কাস প্রভৃতি দেখাইয়া, নানারূপ উৎকৃষ্ট খাদ্য সামগ্রী খাওয়াইয়া, এবং অপূর্ব্ব পরিচ্ছদ ও রত্নখচিত বিচিত্র অলঙ্কারসকল পরিধান করিতে দিয়া, বিলক্ষণ বশীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও একটা মহামূল্যবান্ সামগ্রী সে পত্নীকে দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। সে তাহার হৃদয়ের উৎকট ভালবাসার প্রবাহ অসীম মানসিক শক্তির দ্বারা সংযত করিয়া, মানদার দিকে তাহা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিল। মূর্খা মানদা তাহা গ্রহণ করে নাই। আত্মগ্রাহী মানদা স্বামীর পবিত্র ভালবাসার স্বর্গীয় মর্য্যাদা বুঝিতে পারে নাই। এ ভালবাসার প্রবাহ হইতে আত্ম-

রক্ষা করিয়া সে অলঙ্কারের অহঙ্কারের মধ্যে আপনাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। গদাধরের সমস্ত উপেক্ষিত প্রণয়, গিরিপ্রতিহত প্রবাহিনীর ন্যায় আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিল। হায়! মানদা যদি থিয়েটার, সার্কাস, পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি ভুলিয়া, এই অনাদৃত ভালবাসাকে হৃদয়ে তুলিয়া লইতে পারিত, তাহা হইলে, আমরা বুঝি পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গের সুন্দর আলেখ্য অবলোকন করিতে পারিতাম। কিন্তু সে ত তাহা লইল না। স্বামীর প্রবল ভালবাসার প্রবাহ-মধ্যে সে নিশ্চল পাষাণ খণ্ডের ন্যায় অবিচলিত রহিল। গদাধরের ব্যর্থ ভালবাসার সমস্ত বিচূর্ণ বেগ, পাষাণ প্রতিমা-বিচ্যুত ভক্তের পুষ্পাঞ্জলির ন্যায়, পাষাণীর পদতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল!

মানদার কলিকাতা আগমনের ছয় মাস পরে, বৃদ্ধ উমাকালী চক্রবর্ত্তীর নিকট হইতে গদাধর একখানি পত্র পাইল। ইতি-পূর্ব্বে গদাধর নান্দীপুর নামক একটি গ্রামের জমীদারী-সত্ত্ব ছয় হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছিল। সদর মালগুজারি বাদে জমীদারীটির বার্ষিক আয় ষোল শত টাকা। কয়েক বৎসর অজন্মা হওয়ায়, এবং গ্রাম মধ্যে বিশেষ জলকষ্ট উপস্থিত হওয়ায়, পূর্ব্ব জমীদার কিছুমাত্র আদায়-তহসীল করিতে সমর্থ না হইয়া, অতি সামান্য মূল্যে মহালটি গদাধরকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। গ্রামটি গদাধরের হস্তগত হইলে, গ্রামবাসীর উন্নতিকল্পে কি কি কার্য্য করা কর্ত্তব্য, তাহা জানিবার জন্য সে তাহার চক্রবর্ত্তী কাকাকে এক পত্র লিখিয়াছিল। আজ গদাধর এই পত্রের উত্তর

পাইয়া, তাহা হস্তে লইয়া, মানদার নিকট অন্তঃপুর মধ্যে আগমন করিল।

মানদা তখন একখানি কৌচের উপর শয়ন করিয়া, গৃহতলোপবিষ্টা নুলীর নিকট তাহার অপূর্ব্ব বিদ্যা গ্রহণ করিতেছিল। অমুক গ্রামের অমুকা ধার্ম্মিকা নারী মন্ত্রপূত সর্ষপ তাম্বুলমধ্যে পূরিয়া, তাহা স্বামীকে চর্ব্বণ করিতে দিয়া, কিরূপে তাহাকে মেষরাজের ন্যায় বশীভূত করিয়াছিল এবং কিরূপে তাহাকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে নৃত্য করাইতে পারিত, এবং অমুক গ্রামের অমুকা পতিব্রতা নারী কিরূপে মূলবিশেষের সাহায্যে তাঁহার পাপিনী সপত্নীকে উন্মাদিনী করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং অমুক গ্রামে অমুকা পাপিষ্ঠা আতপতাপ নিবারণার্থে মস্তকোপরি ছত্র ব্যবহার করিয়া, এবং দন্তধাবন জন্য দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিয়া কিরূপে লোকসমাজে নিন্দিতা হইয়াছিল, এই সকল চিত্তহর বিবরণ নুলী মানদার নিকট আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিতেছিল।

গদাধরকে সমাগত দেখিয়া, নুলী অতি সত্বর গৃহান্তরে প্রস্থান করিল। কি জানি কেন, গদাধরকে নিকটে দেখিলে নুলীর হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। গদাধরের দৃষ্টিতলে সে সংকুচিত হইয়া পড়িত।

নুলী প্রস্থান করিলে, গদাধর মানদার নিকটবর্ত্তী একখানি চৌকীতে উপবেশন করিল। মানদার করতল আপন হস্তের মধ্যে গ্রহণ করিয়া, অতি কোমল কণ্ঠে কহিল, "মানদা, আজ তুমি অসময়ে শুয়ে রয়েছ কেন? অসুখ করেনি ত?"

মানদা পূর্ব্ববৎ শায়িতা থাকিয়া, এবং গদাধরের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কহিল, "তুমি এখন এখানে কেন এলে ?"

গদাধর মানদার করতল আপন বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, "তোমার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কায আছে, তাই এসেছি। কিন্তু বিনা কাযে কি তোমার কাছে আমার আসতে নেই ? কায আছে বলে' না এসে, যদি ভালবাসি বলে' আসি, তা হলে, তোমার কি তা ভাল লাগে না ?"

মানদা আপন হস্ত গদাধরের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাহা আকর্ষণ করিয়া কহিল, "তোমার হাত কি শক্ত ! আমার বেদনা লাগছে, ছেড়ে দাও।" গদাধর মানদার হস্ত ত্যাগ করিলে, মানদা কৌচের উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "ওঃ তোমার কি কায আমি তা বুঝতে পেরেছি। সে দিন আমার জন্যে যে ব্রেসলেট ফরমাস দিয়েছিলে, তা বুঝি তৈরি হয়েছে, তাই আমাকে দেবার জন্যে তুমি এখন এখানে এসেছ !"

গদাধর বলিল,"না না মানদা, আমি কি জন্যে এসেছি, তা তুমি ঠিক বুঝতে পার নি। তোমার ব্রেসলেট তৈরি হয়েছে বটে, আমি তা নিয়েও এসেছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার অন্য কায আছে।"

মানদা, গদাধরের কথা শেষ হইতে না হইতে, অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কহিল, "কৈ দেখি, আমার কেমন ব্রেসলেট হয়েছে ?" ব্রেসলেট দেখিয়া মানদার পছন্দ হইল না,—সে কহিল, "জ্ঞানদা বাবুর বৌয়ের হাতে যে ব্রেসলেট দেখেছি, এ তার কাছে কিছুই নয়।"

গদাধর জানিত যে, অলঙ্কারটি মানদার মনোমত হইবে না ; কারণ এ পর্য্যন্ত গদাধরের আনীত কোন দ্রব্যই মনোমত হইয়াছে বলিয়া মানদা স্বীকার করে নাই। তথাপি এই অমনোমত অলঙ্কার বা বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া, সে আপনাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সু-অলঙ্কৃতা মনে করিত। গদাধর হাতে করিয়া আনিলে যে অলঙ্কার কুৎসিত দেখাইত, মানদার অঙ্গে উঠিয়া তাহা অপূর্ব্ব শ্রী বিকীর্ণ করিত। মানদা মনে করিত, এটা তাহার অঙ্গের গুণ, গদাধরপ্রদত্ত অলঙ্কারের গুণ নহে। ব্রেসলেট দু'টি মানদা মণিবন্ধে ধারণ করিলে তাহার কমনীয় বাহুযুগল অবলোকন করিয়া, গদাধর প্রফুল্লমুখে কহিল, "তোমার কাছে যে কাযের জন্যে এসেছি, এখন তাই বলি, শোন।"

মানদা, তাহার বাম হস্তের ব্রেস্‌লেটটি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর সাহায্যে ঘুরাইয়া, তৎপ্রতি আপনার আনত দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কহিল, "কি কায ?"

গদাধর বলিল, "তুমি একটা পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করবে? তোমার নামে পুষ্করিণীটার নাম হবে 'মান-সরোবর।' আমার ইচ্ছা যে, তুমি এটি কর ; এতে ইহকালে নাম আছে, পরকালে পুণ্য আছে।"

মানদা পরকালের বড় ধার ধারিত না। কিন্তু ইহকালে লোকমুখে তাহার নাম কীর্ত্তিত হইবে, তাহার সুযশ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইবে,—তাহার পক্ষে এটা বড় চমৎকার সামগ্রী ; ইহার প্রলোভনটা সে ত্যাগ করিতে পারে না। সে স্মিতমুখে বলিল, "কোথা, কবে পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করতে হবে ?"

গদাধর বলিল, "দেখ, নাড়িচার খুব কাছে, গঙ্গাতীর থেকে প্রায় দু ক্রোশ পশ্চিমে, নান্দীপুর বলে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামখানি আমি কিনেছি। গঙ্গাতীর থেকে এই গ্রামে যাবার ভাল রাস্তা নেই; আর, এই গ্রামে পানীয় জলের ভাল পুকুর নেই। গ্রামটি আমি খুব সস্তা দামে কিনেছি; উপযুক্ত দামের সিকি দামও লাগেনি। কম দাম দিয়ে আমি যে লাভ করেছি, গ্রামবাসীদের সুবিধার জন্যে আমি তা ব্যয় করতে ইচ্ছা করেছি। এই অর্থ ব্যয় করে গ্রামের মধ্যে একটি পুকুর খুঁড়ে দিতে হবে, আর নাড়িচা থেকে নান্দীপুর পর্য্যন্ত একটি রাস্তা তৈরি করাব। চক্রবর্ত্তী কাকা লিখেছেন, আমার এ কাযে গ্রামবাসীরা সহায়তা করবে। এই তাঁর চিঠি দেখ।"

মানদা মণিবন্ধে ব্রেস্‌লেটটি ঘুরাইয়া কহিল, "এই মাঝের হীরাটি যদি একটু বড় হত, তা হলে অনেকটা ভাল দেখতে হত।"

গদাধর উমাকালী চক্রবর্ত্তীর পত্রখানি আপনার বিশাল উরু-প্রদেশে বিস্তৃত করিয়া কহিল, "এর পর হীরা দু'টি বদলে নিলেই চলতে পারবে। তুমি যখন পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করতে যাবে, তখন এই ব্রেস্‌লেট পরে যেও। এ পরে' তোমার হাত দুটি বড় সুন্দর হয়েছে।"

মানদা আপনার সুন্দর হাত নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, "আমি কলকাতায় এসে একটু মোটা হয়েছি;—নয়?"

গদাধর মানদার রত্নালঙ্কৃত পুষ্পসন্নিভ প্রকোষ্ঠপ্রদেশ আপন করতল দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কহিল, "আমি তোমাকে রোজ

দেখছি, এজন্যে তুমি একটু মোটা হয়েছ কিনা বুঝেতে পারি নে। পুকুর প্রতিষ্ঠার জন্যে যখন তোমাকে নিয়ে, তিন চার মাস পরে নান্দীপুর যাব, তখন তোমার বাপ মার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবার জন্যে কালীদহে দুই একদিন থাকব, তখন তাঁরা তোমাকে দেখলে বুঝতে পারবেন তুমি মোটা হয়েছ কিনা।”

মানদা আপন প্রকোষ্ঠ-বেষ্টিত গদাধরের কৃষ্ণ করতল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, “দেখ, আমার হাতের কাছে তোমার হাতটা কত কালো দেখাচ্চে! তুমি এত কালো হলে কি করে?”

গদাধর বলিল, “মানদা, আমি কালো বলে কি তুমি আমাকে পছন্দ কর না?”

মানদা হাসিয়া কহিল, “তা কেন? মা বলেন, স্বামী কালো হলেও, কদাকার হলেও, তাকে ভক্তি করতে হয়; নুলীও তাই বলে। দেখ, নান্দীপুরে যাবার সময় আমি নুলীকেও নিয়ে যাব। তখন কি কি গহনা পরতে হবে, তা এখন থেকে ঠিক করে রাখতে হবে। মুক্তার মালাটা নূতন করে গাঁথবার জন্যে বাবার কাছে কতদিন আগে পাঠিয়েছি, এখনও তা পেলাম না। বাবার বড় দেরী করা স্বভাব। তুমি একখানা চিঠি লিখো ত।”

আজ মানদা স্বামীর সহিত যে কথাবার্ত্তা কহিল, তাহা তোমরা স্বকর্ণে শুনিলে। বুঝিলে, মানদা একটি প্রকাণ্ড “আমি”; সে স্বামী-টামীর বড় ধার ধারিত না।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

গদাধরের নির্ম্মমতা।

পঁচিশ বিঘা জলকর—প্রকাণ্ড, কাকচক্ষুসন্নিভ কৃষ্ণ জলরাশি-পূর্ণ সরোবর, নান্দীপুরে চারি মাস মধ্যে খোদিত হইল। সরোবরের দক্ষিণ তটে প্রশস্ত ইষ্টকনির্ম্মিত সোপান সকল নির্ম্মিত হইল। গ্রামস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে উৎকৃষ্ট আহারে আহ্বান করিয়া, মানদা গদাধর-সমভিব্যাহারে নান্দীপুরে উপস্থিত হইয়া রাজরাণী-তুল্য অলঙ্কারভারে পরিশোভিত থাকিয়া, পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিল। পুষ্করিণীর নাম হইল, মান-সরোবর। আহার সমাপনান্তে গ্রামের লোক গগনস্পর্শী নিনাদে চীৎকার করিয়া বলিল, "জয়, মানদা মায়িকি জয়।" আমরা জানি, এ বিজয়-ধ্বনিটা বহুদিন মানদাকে বিভোর করিয়া রাখিয়াছিল; আপনার আমিত্বে মানদা বহুদিন ডুবিয়া ছিল। যে স্বামীর অনুগ্রহে সে সেই মহাযশ লাভ করিয়াছিল, সে স্বামীও তাহার মনোমধ্যে স্থান পান নাই।

পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করিয়া গদাধর মানদাকে লইয়া কালীদহে আগমন করিল। মানদাকে বহুদিন পরে দেখিয়া রত্নেশ্বর বাবু বিশেষ পুলকিত হইলেন। রত্নময়ী জামাতা ও কন্যার জন্য প্রচুর আহার সামগ্রী সংগ্রহ করিলেন। দুই দিন কালীদহে অবস্থিতি করিয়া মানদা ও গদাধর কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিল।

যে দুই দিন গদাধর কালীদহে অবস্থিতি করিয়াছিল, তাহার মধ্যে একদিনও সে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় বা তাঁহার কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই। আসিবার সময়ও সে তাঁহাদের সহিত দেখা করিয়া আসে নাই। প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে বিদায়গ্রহণকালে অম্বিকার সেই এক বিন্দু চক্ষের জল এখনও সে ভুলিতে পারে নাই। তাহা উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের ন্যায় এখনও তাহার হৃদয়মধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। পুনরায় বিদায় কালে অম্বিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাহার সাহস হয় নাই। নিজ হৃদয়ের বলকে সে বিশ্বাস করিতে পারে নাই।

গদাধর কালীদহ হইতে চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে, এক দিন কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় বহির্ভ্রমণ হইতে বাটীতে ফিরিয়া, অম্বিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা অম্বিকা! শুনলাম গত সপ্তাহে গদাধর মানদাকে নিয়ে কালীদহে এসেছিল। কৈ, সে ত আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে নি?"

অম্বিকা চম্‌কাইয়া উঠিল। তাহা হইলে, গদাধর আসিয়াছিল! তবে তাহাকে সে দেখিতে পাইল না কেন? তাহাকে জানিতে দিত না, অন্তরাল হইতে দেখিত; কাহার অভিশাপে এ দেখায় সে বঞ্চিত হইল! সে বিমর্ষ মুখখানি উন্নত করিয়া, বিশাল চক্ষু বিস্তৃত করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে এসেছিল?"—সে গদাধরের নামটা সহসা উচ্চারণ করিতে পারিল না। যাঁহারা বাঙ্গালীর প্রণয়িনীগণকে চিনিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, তাহারা প্রণয়াস্পদের নাম সহসা উচ্চারণ করিতে

পারে না। মানদা পূর্ব্বে গদাধরকে গদাধর বলিয়াই ডাকিত। কিন্তু প্রণয়ের কোমল পুষ্পটি তখনও তাহার হৃদয়মধ্যে প্রস্ফুটিত বিকশিত হইয়া উঠে নাই। এখন গদাধরের নামটা তাহার কণ্ঠ-পথে বাহির হইল না; কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "কবে এসেছিল?"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে কন্যার প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "রত্নেশ্বর বাবুর বাড়ীতে শুনলাম যে, নান্দীপুরে পুকুর প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে মানদা আর গদাধর দুজনেই নান্দীপুরে এসেছিল। সেখানে পুকুর প্রতিষ্ঠা করে, দু দিন কালীদহে থেকে, তারা গত বুধবারে কলকাতা চলে গেছে। আমি ভাবছি যে সে আমার সঙ্গে বা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এল না কেন? আমরা গ্রামে সমাজচ্যুত বলে কি গ্রামের লোক তাকে আমাদের বাড়ীতে আসতে নিষেধ করলে? গদাধর কি এমন দুর্ব্বল-চিত্ত হয়ে গেছে যে, লোকের নিষেধ শুনে, যা কর্ত্তব্য তা পালন করতে পরাঙ্মুখ হল? মা অম্বিকা, তুমি গদাধরকে চিঠি লেখ; কেন সে আমাদের সঙ্গে দেখা করে না।"

অম্বিকা কহিল, "হ্যাঁ বাবা, আমি তাকে চিঠি লিখব। কিন্তু আমার মনে হয় না যে, সে কারও নিষেধ শুনে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। আমার মনে হয়, তার শরীর অসুস্থ ছিল, এজন্যে দেখা করতে আসতে পারে নি।"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে কহিলেন, "তা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু যে অসুস্থতা নিয়ে সে কলকাতা যেতে পারলে, সেই অসুস্থতা নিয়ে

আমার সঙ্গেও দেখা করতে আসতে পারত। যা হোক, তার কাছ থেকে চিঠির উত্তর পেলে সকল বিষয় জানতে পারব। তুমি তাকে চিঠি লেখ।"

অম্বিকা গদাধরকে পত্র লিখিতে বসিল। গদাধরের প্রতি তাহার যে ভালবাসা জন্মিয়াছিল, তাহার সহিত কামনা বিজড়িত থাকিলেও, তাহা নিকৃষ্ট নিন্দনীয় কামনা নহে,—তাহা ভক্তি করিবার কামনা। কিন্তু এই ভক্তিপূর্ণ কামনার দ্বারাও সমাজমধ্যে বিশৃঙ্খলা আসিতে পারে, ইহা বিবেচনা করিয়া, অম্বিকা ইহাকে সামাজিক পাপ বলিয়া গণনা করিয়াছিল। সমাজে থাকিয়া সমাজ মধ্যে বিশৃঙ্খলা বিস্তার করিবার অধিকার আমাদের নাই। ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, যে লোক সকলকে বিচলিত করে না, সে তাঁহার প্রিয়। তাহার ভালবাসার পূজায় জনসমাজ বিচলিত হইবে ভাবিয়া অম্বিকা ইতিপূর্ব্বে তাহার চির আরাধ্যকে, চিরপূজ্যকে, ভক্তিপূর্ণ উক্তির দ্বারা পূজা করিতে পারে নাই। কিন্তু আজ গদাধরকে পত্র লিখিতে বসিয়া সে পাপ পুণ্য ভুলিয়া গিয়াছিল। আত্মহারা কাতরা পত্রখানি ছত্রে ছত্রে সুধাসম ভক্তিরসে সিঞ্চিত করিয়া দিয়াছিল।

সেই দিন রাত্রে, আপন শয্যায় শুইয়া, উদ্দেশে গদাধরকে প্রণাম করিয়া, অম্বিকা আপন পত্র-লিখন-পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। গদাধরকে সেইরূপ পত্রখানা লেখা কি তাহার উচিত হইয়াছে? তাহার দ্বারা তাহার হৃদয়ের গুপ্ত প্রেম কি ব্যক্ত হইয়া পড়িবে না? তাহার হৃদয়ের অপরিমিত ভক্তির

সন্ধান পাইয়া না জানি গদাধর কত আনন্দিত হইবে। না জানি সে পত্র পাইয়া, তদুত্তরে উচ্ছ্বসিত মনোবেগে গদাধর তাহাকে কত প্রেমপূর্ণ কথা লিখিয়া ফেলিবে। সে তখন তাহার কি উত্তর দিবে? সে তখন তাহার ভক্তির ভাণ্ডার খুলিয়া গদাধরের চরণ-তলে ঢালিয়া দিবে। কিন্তু না, সে এরূপ করিতে পারে না; সে আপনার ভক্তির টানে গদাধরকে তাহার কঠিন কর্ত্তব্য-শিখর হইতে নিম্নে টানিয়া আনিতে পারে না। তাহার প্রাণেশ্বরকে কর্ত্তব্যের মহিমাশিখর হইতে বিচ্যুত দেখিবার পূর্ব্বে সে হেলায় জাহ্নবী-জীবনে আপন জীবন উৎসর্গ করিবে।

চারি দিন পরে সে গদাধরের নিকট হইতে পত্রোত্তর প্রাপ্ত হইল।—কি নীরস, কঠিন, নির্ম্মম পত্র!—গদাধরের কর্ত্তব্য-শিখরের শিলাখণ্ড অম্বিকার হৃদয়মধ্যে কি কঠিন আঘাত প্রদান করিল! পত্রপাঠ করিয়া, অম্বিকা কাঁদিয়া ফেলিল। অম্বিকাই একদিন নির্ম্মম হইয়া কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য গদাধরকে উপদেশ দিয়াছিল। আজ কর্ত্তব্যব্রতধারী গদাধরকে তাহার প্রতি নির্ম্মম দেখিয়াই কি সে অশ্রুবেগে অধীর হইয়া পড়িল? মনস্তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এ কথার উত্তর দিতে সমর্থ হইবেন।

কিন্তু সেই নীরস পত্রখানা অম্বিকা নষ্ট করিল না; অতি যত্নে পেটকমধ্যে রাখিয়া দিল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পাকশালায় গদাধর।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা ঘটিবার পর দুইটি বৎসর, পৃথিবীর সুখ দুঃখের অসংখ্য কাহিনী সংগ্রহ করিয়া অতীতের অন্ধকার-অন্তরালে লুকাইয়াছিল।

এই দুই বৎসর পরে, গদাধর একদিন সকাল বেলা গৃহমধ্যে বসিয়া আপনার ছয় মাসের শিশু পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া, পত্নী মানদার সহিত কথোপকথন করিতেছিল।

পুত্রটি দেখিতে গদাধরের মত হয় নাই; মানদার মত সুন্দর হইয়াছিল। ছেলেকে যে কিরূপ ভালবাসিতে হয়, তাহা গদাধর বাল্যকালে আপন পিতামাতার নিকট শিক্ষা করিয়াছিল। তাহাকে কোলে লইয়া, গদাধর সতৃষ্ণনয়নে তাহার সুগোল মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহার লালাসরস প্রবাল-অধর অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিয়া, তাহাতে সুধাহাসির স্বর্গীয় লীলা নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহার কোমল পদ্মদল-বিগঠিত চিবুক ধরিয়া, তাহাতে আপনার বুক ঢালা আদর ঢালিয়া দিতেছিল।

মাতৃস্নেহের মহিমাকে খর্ব্ব করিয়া আমরা আমাদের লেখনী কলুষিত করিব না,—আমরা সত্য কথা বলিব—মানদাও আপন আত্মজকে ভালবাসিত। সে তাহার পিতাকে বলিয়া, খোকার

দুধ খাইবার জন্য সুবর্ণের পাত্রসকল প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিল। মাতার নিকট প্রার্থনা করিয়া মানদা খোকার জন্য মুক্তার মালা লইয়াছিল। গদাধরকে বলিয়া উৎকৃষ্ট মখমলের পোষাক প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিল। সত্যই মানদা খোকাকে ভালবাসিত। সে হাসিলে, মানদা তাহার হসিত মুখ চুম্বন করিত। ঘুমাইলে তাহার নরম হাত দু'টি নাড়িয়া দিত। পোষাক পরিলে তাহাকে কোলে লইয়া বসিত। কিন্তু, কিন্তু,—কিন্তুর কথা কাহারও শুনিয়া কায নাই।

পুত্রকে আদর করিতে করিতে গদাধর পরিচারিকাকে আহ্বান করিয়া কহিল, "দুধ নিয়ে এস; খোকার খিদে পেয়েছে।"

পরিচারিকা বলিল, "দুধ এখনও জ্বাল দেওয়া হয় নি।"

গদাধর। বামুন ঠাকুরকে বল যে, সে এখনই দুধ গরম করে' নিয়ে আসে।

মানদা। বামুন ঠাকুরকে আমি বিদায় করে দিয়েছি।

গদাধর। কেন?

মানদা। বড় বদ্‌লোক, এঁটো কাঁটা কিছুই মানত না। রান্নাবাড়ীর বারান্দায় একটা জলের জালা ছিল, জান? সেটা সদ্য এঁটো; সেই জালায় বামুনঠাকুরের কাপড় লেগেছিল, মুলী তা স্বচক্ষে দেখেছে, সেই কাপড় নিয়ে বামুনঠাকুর রান্নাঘরে ঢুকেছিল। ওমা ওমা! জাত জন্ম আর কিছুই রইল না। মুলী এসে ভাগ্যিস্ আমাকে বল্লে। আমার সর্ব্বাঙ্গ রাগে জ্বলে' গেল।

আমি সরকারকে ডাকিয়ে, মাইনে-পত্র হিসাব করে' দিয়ে তাকে বিদায় দিয়েছি। দরওয়ানকে একটা নতুন বামুন ডেকে আনবার জন্যে বলেছি।

গদাধর। নতুন বামুন আসতে দেরী হবে। চল, মানদা, আজ তোমাতে আমাতে মিলে রাঁধি।

মানদা। রান্নাঘরে গেলে, ধোঁয়া লেগে যে আমার চোখ জ্বালা করে।

গদাধর। তুমি না হয়, বারান্দায় বসে' তরকারি কুটে দেবে; আমি ঘরের ভিতর বসে' রাঁধব।

মানদা। ওমা! পুরুষ মানুষে নাকি আবার রাঁধে?

গদাধর। কেন রাঁধবে না?—তোমার যে বামুনঠাকুর ছিল, সেও ত পুরুষ মানুষ। সে যা পারে, আমি তা পারব না কেন? চল আমরা রাঁধতে যাই।

মানদা। আমি কিন্তু তোমার তরকারি কুটতে পারব না। তরকারি কুটলে আঙ্গুলে বড় বিশ্রী দাগ হয়।

গদাধর হাসিল; কহিল, "চল, আমিই তরকারি কুটে নেবো এখন। তুমি বারান্দায় খোকাকে কোলে নিয়ে বসে' আমার সঙ্গে গল্প কোর।"

মানদা অগত্যা নিম্নতলে নামিয়া, রান্নাবাড়ীতে গদাধরের অনুসরণ করিল। সেখানে এক পরিচারিকা চুল্লী প্রজ্বলিত করিয়া রাখিয়াছিল এবং দুগ্ধপূর্ণ কটাহ লইয়া, তাহার উপর সংস্থাপন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

নুলী পরিচারিকাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া, একটি ক্ষুদ্র জলাধার হইতে জলগণ্ডূষ গ্রহণ করিয়া দুগ্ধের উপর সিঞ্চিত করিল।

নুলীকে এবংবিধ কার্য্য করিতে অবলোকন করিয়া গদাধর জিজ্ঞাসা করিল, "দুধে জল ছিটাবার কারণ কি ?"

নুলী বলিল, "গঙ্গাজল।"

পরিচারিকা বলিল, "এখানে কেউ ছিল না। বামুনঠাকুর চলে যাচ্চে তাই দেখবার জন্যে আমরা সকলে খিড়্‌কিতে গিয়েছিলাম। দরজা খোলা পেয়ে কোথাকার একটা কুকুর এসে, দুধের কড়াতে মুখ দিয়েছিল। নুলী দিদি তাই গঙ্গাজল দিয়ে দুধটা শুদ্ধ করে নিচ্চে।"

নুলী বলিল, "না তা' নয়। এ দুধ ত আর দেবতা বামুনের জন্যে নয় যে কুকুরে মুখ দিলে অশুদ্ধ হবে। ছেলেপিলে কুকুরে মুখ-দেওয়া দুধ খেলে আর কি দোষ আছে ? আমি তার জন্যে গঙ্গাজল দিই নি। বামুনঠাকুরটি যে মজিয়ে গেছে; সে এঁটো কাপড় পরে রান্নাঘরে ঢুকে ছিষ্টি ছুঁয়ে গেছে। জেনে শুনে কি করে' সকলকে শতেক জাতের এঁটো খাওয়াব ? তাই গঙ্গাজল দিলাম।"

গদাধর অবাক্ হইয়া, নুলীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ভাবিল, "হায় ভগবান্! আমাদের এই সোনার দেশটাকে এঁটোর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দাও।"

সত্য, তোমরা ত সমাজসংস্কার করিতে বসিয়াছ, আপনার

দেশের জন্য জীবন সমর্পণ করিতে বসিয়াছ। দেশকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়া, তাহার পূজা করিতেছ। স্বদেশবাসীকে ভ্রাতার ন্যায় কোলে তুলিয়া লইতেছ। তোমাদের পবিত্র দেশ যে এঁটো হইয়া রহিয়াছে; তাহার কি তোমরা কিছু প্রতীকার করিবে না? বীর তোমরা, সাহসী তোমরা! তোমরা ব্রতী হইলে, এঁটোর হাত হইতে, তোমরা তোমাদের স্বদেশকে উদ্ধার করিতে পার। তোমরা সহধর্ম্মিণীগণ, তোমরাও এই ধর্ম্মকার্য্যে সহায় হইও। তোমাদের সহায়তা প্রাপ্ত না হইলে, উঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া গদাধর পরিচারিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "দুধটা ফেলে দাও; কুকুরের এঁটো দুধ কেউ খাবে না। দারোয়ানকে বাজার থেকে শীঘ্র দুগ্ধ কিনে আনবার জন্যে বল।"

কিন্তু দ্বারবান্ একটি নূতন বামুনঠাকুরের অন্বেষণে চলিয়া গিয়াছিল। পরিচারিকা তাহাকে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া না পাইয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আসিয়া সংবাদ দিল যে, সে দ্বারবান্‌কে খুঁজিয়া পাইল না। গদাধর তখন অন্য ব্যক্তিকে দুগ্ধ সংগ্রহ জন্য প্রেরণ করিল। সে দ্রুতপদে দুগ্ধ আনয়ন করিবার জন্য চলিয়া গেল।

তখন বেলা এক প্রহর অতীত হইয়াছিল। তখনও গদাধর রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিতে সমর্থ হয় নাই। কিরূপে হইবে? সব এঁটো।—মানদার আদেশানুযায়ী সব ধৌত করিতে অনেক বিলম্ব ঘটিল। তরকারি কুটিবার জন্য গদাধর বঁটি গ্রহণ করিতে

যাইলে, মানদা চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল, "এঁটো, এঁটো, ছুঁও না।" পরিচারিকা বঁটি ধৌত করিয়া আনিলে মানদা বলিয়াছিল, "না, না, এখনও ঠিক হয় নি ; ঐ ফুটোর মধ্যে—ঐ, ঐ, ঐ—এঁটো রয়েছে।" বঁটি ধৌত হইলে গদাধর তরকারির ঝুড়িতে হস্তার্পণ করিতে যাইলে, মানদা বলিয়াছিল, "দাঁড়াও, বামুনঠাকুর বোধ হয় ঐ ঝুড়িতে হাত দিয়েছিল, তরকারি আর ঝুড়ি ধুয়ে নিতে হবে।"

এইরূপে বেলা একপ্রহর পর্য্যন্ত গদাধর রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিতে সমর্থ হয় নাই।

খোকা এতক্ষণ মাতৃক্রোড়ে স্থানলাভ করিতে না পারিয়া এবং এ যাবৎ দুগ্ধপান করিতে না পাইয়া কিছু অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। গদাধর ভাত চড়াইয়া দিয়া তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া আদর করিল। কিন্তু অশান্ত ছেলে মানদার কোলে যাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিল। মানদা রোরুদ্যমান পুত্রকে কখনও ক্রোড়ে লইত না। সে যে পুত্রকে ভালবাসিত না, এমন নহে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে সর্ব্বাপেক্ষা আপনাকে বেশী ভালবাসিত। প্রীতিকর, সহাস্যবদন পুত্রকে কোলে লইয়া সে বিলক্ষণ প্রীতিলাভ করিত। কিন্তু কাঁদুনে ছেলেকে সে কিরূপে কোলে লইবে? তথাপি গদাধরের অনুরোধক্রমে সে খোকাকে একবার ক্রোড়ে লইল।

গদাধর আবার রন্ধনকার্য্যে মনোনিবেশ করিল। হতভাগ্য ছেলের আবার কি হইল, আবার সে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল। মানদা সকাল বেলা হইতে অনেক সহ্য করিয়াছিল। আর কত সহিবে? আর, সেরূপ অশান্ত ছেলেকে একটু শাসন করাও

দরকার। সে পুত্রকে কোল হইতে বারান্দায় নামাইয়া দিয়া, তাহার পৃষ্ঠে গুরু চপেটাঘাত করিল।

এখন, গদাধর যে হাতটিকে কুসুমদল-বিগঠিত বলিয়া অনুমান করিত, বাস্তবিক তাহা কুসুমবর্ষণের ন্যায় খোকার পৃষ্ঠদেশে পতিত হয় নাই। ছয় মাসের শিশু আত্মহারা ও বিহ্বল হইয়া করুণস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। দেখিয়া, স্নেহপূর্ণ গদাধর অধীর হইয়া পড়িল। এরূপ অবস্থায় সে যদি মানদার প্রতি কোন রূঢ় কথা প্রয়োগ করিত, তবে কি কেহ তাহার নিন্দা করিত? কিন্তু যে কর্কশ বাক্য তাহার কণ্ঠমধ্যে আসিয়াছিল, তাহা সে কণ্ঠমধ্যেই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল; ব্যবহার করে নাই। যে অমানুষিক মানসিক বলে সে চারুশশীর প্রদীপ্ত প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, অম্বিকার বজ্রের ন্যায় অশ্রুবিন্দু বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, আজ তাহা অপেক্ষা অধিক শক্তিপ্রয়োগের আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু সে শক্তি গদাধর প্রয়োগ করিয়াছিল। সন্তানের বেদনায় ব্যথিত হৃৎপিণ্ড তাহার নয়নকোণে রক্তধারার ন্যায় যে অশ্রুপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিল, গদাধর অমিতবলে তাহা নয়নপ্রান্তে রুদ্ধ করিয়া দিল। যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ভর্ৎসনারূপে মানদার দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল, সেই অমিত শক্তিতে গদাধর তাহার গতিরোধ করিয়া দিল।

গদাধর পুত্রকে কোলে তুলিয়া, সদ্য আনীত দুগ্ধ গরম করিয়া, তাহাকে খাইতে দিল এবং মানদাকে বলিল, "দেখ, আমি দুটো উনান জ্বেলে কত রান্না রাঁধি।"

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গদাধরের উপবাস।

ছয়মাস পরে, নবনিযুক্ত বামুনঠাকুরকে গদাধরের বাটী হইতে বিদায় করিবার আবার কারণ ঘটিল। কিন্তু এবার অন্যরূপ কারণ। রাত্রে আহারকালে মুলী দেখিল যে, তাহার ঈপ্সিত মৎস্যপুচ্ছ তাহার স্থালীমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই; বামুনঠাকুর তাহা অপর এক পরিচারিকার আহার-পাত্রে রক্ষিত করিয়াছে। যে পরিচারিকার পাত্রে, মুলীকে বঞ্চনা করিয়া সেই পুচ্ছপ্রবর স্থানলাভ করিয়াছিল, তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ অতিক্রম করে নাই; এবং সে পাপীয়সী দাঁতে 'মিসি' দিত, এবং বামবাহুতে স্বর্ণ-বিনির্ম্মিত অনন্ত ধারণ করিত, এবং গঙ্গাস্নান করিয়া বাটী ফিরিতে অযথা বিলম্ব করিত; অতএব বামুনঠাকুর যে নিতান্ত দুঃশীল, তাহা স্থির হইয়া গেল।

প্রভাতে মুলীর নিকট সকল তথ্য অবগত হইয়া, মানদা মৎস্যপুচ্ছভোক্ত্রী পরিচারিকা সহ মৎস্যপুচ্ছদাতা বামুনঠাকুরকে বিদায় করিয়া দিল। আবার দ্বারবান্ নূতন বামুন ঠাকুরের অনুসন্ধানে ছুটিল।

আজ গদাধর সে দিনের মত এ সকল সংবাদ অবগত হইতে পারে নাই। সে অতি প্রত্যূষ হইতে এক মক্কেলের কাগজপত্র

আলোচনা করিতে এত ব্যস্ত ছিল যে, মৎস্যপুচ্ছকে আশ্রয় করিয়া তাহার পাকশালায় যে বিচ্ছেদান্ত প্রণয়াভিনয় অভিনীত হইয়াছিল, তাহার কোনও তথ্য সে অবগত হইতে পারে নাই। অতি সত্বর আদালতে যাইবার অভিলাষে, যখন সে নিমেষমধ্যে স্নান সমাধা করিয়া, আহার জন্য বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন সে জানিত পারিল যে, এ পর্য্যন্ত রন্ধনের কোনও উদ্যোগই হয় নাই।

তাহার সহিত মানদার সাক্ষাৎ হইলে, মানদা বলিল, "তাই ত; তুমি কি খেয়ে আদালতে যাবে? রান্নাও হয় নি, বাজার থেকেও কোনও খাবার আনিয়ে রাখা হয় নি।"

গদাধর বলিল, "আমি নিজের জন্যে ভাবি না; আদালতে গিয়ে চাকর দিয়ে জলখাবার আনিয়ে খাব; আমি তোমাদের জন্যে ভাবছি; চাকর চাকরাণীদের জন্যে ভাবছি; তারা কি খাবে?"

মানদা হাসিয়া বলিল, "তা আমি সব ঠিক করেছি। খোকার দুধ গরম করবার জন্যে মুলী উনান জ্বেলেছিল। খোকার দুধ গরম হলে,—মুলী বাকী দুধে বাদাম বাঁটা আর বাতাসা দিয়ে আমার জন্যে ক্ষীর তৈরি করেছিল; মুলী ছেলেবেলা থেকে আমাকে মানুষ করেছে কি না? সে জানে যে, আমি এই রকম ক্ষীর খেতে বড় ভালবাসি। ক্ষীর খেতে খুব ভাল হয়। বরং মুলীকে একদিন তোমার জন্যে একটুখানি তৈরি করে দিতে বলব।"

গদাধর কতকটা নিশ্চিন্ত হইল; বলিল, "শুধু ক্ষীর খেয়ে তুমি কি করে' থাকবে?"

মানদা বলিল, "আমি শুধু ক্ষীর খাই নি, বাজার থেকে বেশ গরম গরম সিঙ্গাড়া আনিয়েছিলাম; সিঙ্গাড়াগুলো বেশ ছিল। ইচ্ছা ছিল খানকতক তোমার জন্যে রাখি, কিন্তু বারান্দায় একটা বিড়াল বসে ছিল, তাকে কিছুতেই মারতে পারলাম না; একখানা সিঙ্গাড়াও তার গায়ে লাগল না; গরম সিঙ্গারা তার গায়ে লাগলে পুড়ে মরত।"

মানদার সম্বন্ধে গদাধর নিশ্চিন্ত হইয়া, চাকরগণের আহারের কি ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। প্রশ্ন শুনিয়া মানদা বলিল, "তাদের কথা তুমি ভেব না; তারা এক বেলা না খেলে মরে' যাবে না।"

গদাধর বলিল "মানদা, এ'টা তোমার ভাল কথা হল না। ওরা তোমার আশ্রয়ে বাস করছে। তোমাকে মার মত বিবেচনা করে', যথা সময়ে আহার পাবার জন্যে তোমার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। খোকা যদি যথাসময়ে দুধ খেতে পেলে, তা হলে ওরাও যথাসময়ে খেতে পাবে।"

গদাধর আদালতে যাইবার সময় সরকারকে ডাকিয়া বলিয়া গেল যে, অতঃপর দুইজন বামুনঠাকুর রাখা আবশ্যক হইবে। একজন অন্দরমহলে পাকশালায় রাঁধিবে; অন্য একজন বাহিরে রাঁধিবে। এবং যতদিন বামুনঠাকুর না আইসে, ততদিন প্রত্যেক চাকরকে প্রতি বেলা চারি আনা হিসাবে খোরাকী দিতে হইবে; তাহারা আপন ইচ্ছামত খাদ্য কিনিয়া খাইবে।

গদাধর যাহা মনে করিয়াছিল, তাহা করিতে পারে নাই;

আদালতে যাইয়া সে সুযোগমত জলযোগ করিয়া লইতে পারে নাই; সমস্ত দিন তাহাকে কাযে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। বিকালে পাঁচটার পর বাড়ী ফিরিবার সময়, তাহার মানদা-কথিত সেই কথাটা মনে পড়িল,—এক বেলা না খাইলে কেহ মরিয়া যায় না।

বাটী ফিরিয়া গদাধর শুনিল, মানদা নুলীকে সঙ্গে লইয়া, গাড়ী চড়িয়া, গহনা পরিয়া জ্ঞানদা বাবুদের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছে। খোকাকে এক পরিচারিকার নিকট রাখিয়া গিয়াছে। গদাধর যাইয়া, খোকাকে আপনার বুকে তুলিয়া লইল। সে যে সমস্ত দিন অনাহারে ছিল, খোকাকে বুকে লইয়া তাহা ভুলিয়া গেল। ভাবিল, এমন সোণার ছেলেকে ফেলিয়া মানদা কিরূপে স্থানান্তরে যাইতে পারে?

সরকারের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে গদাধরকে সংবাদ দিল যে, দ্বারবান্ একটিও বামুনঠাকুর পায় নাই। অন্য স্থলে পাচক অনুসন্ধান করিবার জন্য এবং রাত্রের আহার জন্য ভৃত্যবর্গকে আর চারি আনা হিসাবে খোরাকী দিতে গদাধর সরকারকে আজ্ঞা করিল। গমন কালে, গদাধরের মুখের দিকে চাহিয়া সরকার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার আহারের কি হবে?"

গদাধর খোকার মুখচুম্বন করিয়া কহিল, "আমার জন্যে চিন্তা নেই; আমি বাজার থেকে কিছু লুচি আর হালুয়া আনবার জন্যে লোক পাঠাব।"

কিন্তু সে রাত্রে গদাধরের আহার হয় নাই। ধনসম্পত্তি লইয়া,

লোকজন লইয়া, কলিকাতার ন্যায় খাদ্যপরিপূর্ণ বৃহৎ নগরীর বক্ষে বাস করিয়া, গদাধরের একটা দিন অনাহারে চলিয়া গেল। কেন? তাহার ভৃত্যেরা কি বাজার হইতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিতে সমর্থ হয় নাই? না, তা নয়।

খোকা বড় বায়না লইয়াছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, তথাপি তাহার মাতা বাটীতে প্রত্যাগতা হইল না দেখিয়া, সে গদাধরের বক্ষেও শান্ত হইয়া ঘুমাইল না। খোকাকে লইয়া গদাধর বড় বিব্রত হইয়া পড়িল। কখনও বারান্দায়, কখনও বাগানে তাহাকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল, কিন্তু সে কোনও রূপে শান্তি লাভ করিল না। এজন্য ভৃত্য যখন বাজার হইতে খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিল, তখন সে খোকাকে ছাড়িয়া আহার করিতে যাইতে পারিল না।

তাহার পর, মানদা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে, রক্তাধর নাড়িয়া মুলীর সহিত গল্প করিতে করিতে বাটী ফিরিয়া খোকাকে কোলে লইল। কিন্তু তখনও গদাধর আহারে বসিতে সমর্থ হইল না।

মানদার বাম কর্ণের দুর্ল্লভ মুক্তা-বিরচিত দুলটি কোথায় পড়িয়া গিয়াছিল;—মানদা খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার অন্বেষণ জন্য গদাধরকে প্রেরণ করিল। বলিল, "তোমার খাবার আমি রেখে দেব, তুমি ফিরে এসে খেও।'

অন্বেষণে বিফল মনোরথ হইয়া, বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া, গদাধর দেখিল, মর্ম্মর বিগঠিত শীতল হর্ম্ম্যতলে, ফুল্ল কমলরাশির ন্যায় মানদার সুনিদ্রিত দেহতট বিস্তৃত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী পাত্রে

সংস্থাপিত আহারদ্রব্য, মানদার স্খলিত অঞ্চলোপরে উপবিষ্ট হইয়া, এক ভদ্র মার্জ্জারপুত্র অপরিম্লান বদনে আহার করিতেছে। তখন রাত্রি একাদশ ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ইহার পর পুনরায় আহারদ্রব্য আনয়ন করিয়া, আহার করা গদাধর আবশ্যক বিবেচনা করে নাই। সে ক্লান্ত দেহে শয্যার কোমল আশ্রয় গ্রহণ করিল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আবার অম্বিকা।

নিদ্রাঘোরে গদাধর মধুর স্বপ্ন দেখিল।—যেন এক অমূর্তময়ী, সুবর্ণ স্থালীতে অমৃতোপম খাদ্যদ্রব্য ধারণ করিয়া, আপন লালিত্যা-নুলিপ্ত বাহু প্রসারিত করিয়া তাহার ক্ষুধিত মুখমধ্যে তাহা প্রদান করিতেছে। তাহার নিশাকর-কর-তুল্য বিমল লাবণ্যকিরণে যেন নিশীথের সমস্ত নিবিড় অন্ধকার অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। তাহার মধুরতা, স্নিগ্ধ নিশীথ-বায়ুতে মিশ্রিত হইয়া, যেন বিশ্বজননীর স্নেহাশীর্ব্বাদের ন্যায় তাহার নিদ্রিত অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে।—এ স্বপ্ন-দৃষ্টা লাবণ্যময়ী কে ?

গদাধর তাহাকে চিনিয়াছিল ;—অম্বিকা !

হায় বিধাতা, হতভাগ্য গদাধরকে তুমি আবার এই সুখের স্বপ্ন কেন দেখাইলে ? তাহার হৃদয় মধ্যে যে ছবি ম্লান হইয়া যাইতেছিল, তাহা আবার কেন উজ্জ্বল করিয়া তুলিলে ? না জানি তোমার বিপুল বিশ্বের কি মঙ্গলকামনায় অম্বিকাকে আবার গদা-ধরের হৃদয়মধ্যে টানিয়া আনিলে ! তোমার কার্য্য তুমিই জান ;—আমরা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করি, কেন ?

প্রভাতে উঠিয়া, গদাধর রাত্রের সুখস্বপ্নের কথা বার বার চিন্তা করিল। অনশনে অবসন্ন দেহাশ্রিত দুর্ব্বল মন লইয়া, সে

অম্বিকার চিন্তা হইতে আপনাকে বিরত রাখিতে সমর্থ হইল না। অম্বিকার, দেবীমূর্ত্তি, প্রভাত-সূর্য্যের বিমল রশ্মির ন্যায়, হিমস্নাত সদ্যঃপ্রস্ফুটিত প্রভাত প্রসূনরাশির ন্যায়, তাহার হৃদয়মধ্যে সহস্র সৌন্দর্য্যছটায় ফুটিয়া উঠিল। গদাধরের সে মূর্ত্তি চিন্তা করিবার অধিকার ছিল না। কিন্তু তখন তাহার অধিকার অনধিকারের বিচার করিবার সাধ্য নাই। সে অনন্যমনে চিত্তমধ্যে অম্বিকার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া তাহার পূজা করিল।

এই পূজা-নিরত মন লইয়া, সে তাহার কার্য্যাগারে আসিয়া উপবেশন করিল। তাহাকে কার্য্যাগারে আগত দেখিয়া, সরকার আসিয়া সংবাদ দিল যে, দুই জন উপযুক্ত পাচককে সে নিযুক্ত করিয়াছে; এবং কোনও অবগুণ্ঠনবতী তাহার সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষে কক্ষান্তরে অবস্থিতি করিতেছেন; অনুমতি পাইলে, সে তাঁহাকে লইয়া আসিবে।

আইনব্যবসায় আরম্ভ করিবার পর সময়ে সময়ে আইন বিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য পুরমহিলাগণ গদাধরের সাক্ষাৎ লাভ প্রত্যাশায় আগমন করিতেন। সরকারের সংবাদ শুনিয়া গদাধর মনে করিল, সেইরূপ কোন পুরমহিলা আসিয়া থাকিবেন। গদাধর সরকারকে কহিল, "স্ত্রীলোকটিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।"

এ স্ত্রীলোকটি অন্য কেহ নহে,—অম্বিকা!

কিন্তু অম্বিকা তথায় কিরূপে আসিল? তাহা বলিতেছি।

প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের চক্ষুর পীড়া

জন্মে। কালীদহে এবং কালীদহের নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল চিকিৎসক ছিলেন, এই পীড়া দেখিয়া তাঁহারা সকলেই কহিলেন যে, এরূপ পীড়ার চিকিৎসা এই পল্লীগ্রামে হইবার নহে ; ইহার জন্য কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়কে কিছু কাল কলিকাতায় যাইয়া অবস্থিতি করিতে হইবে, এবং তথাকার বিশেষজ্ঞ পারদর্শী চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে হইবে।

এ কথা শুনিয়া অম্বিকা পিতাকে কহিয়াছিল,"বাবা, আমাদের পক্ষে কলকাতায় গিয়ে বাসা করা কিছুমাত্র অসুবিধাজনক হবে না ; গদাধরকে চিঠি লিখে জানালেই, সে সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা করতে পারে।"

কিন্তু এক্ষণে গদাধরের প্রতি কৃষ্ণ চাটুর্য্যের আর পূর্ব্বের ন্যায় আস্থা ছিল না। সেই যে সে কালীদহে আগমন করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় মনে করিয়াছিলেন যে, এক্ষণে গদাধর বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়া, এবং জমীদারের সুন্দরী কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, এবং গ্রামের লোকের নিকট তাঁহাদিগের কুৎসা শুনিয়া, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে। আমরা সংসারে কতবার দেখিয়াছি, কত উপকৃত ব্যক্তি সৌভাগ্যশিখরে আরোহণ করিয়া আপনার দুর্দ্দিনের উপকারককে ভুলিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, বুঝি গদাধরও এই শ্রেণীর লোক। সত্য বটে, তিনি গদাধরকে শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া সময়ে সময়ে পত্র লিখিতেন, এবং গদাধরও এ সকল পত্রের প্রত্যুত্তর

প্রদান করিত। কিন্তু গদাধরের পত্রগুলা সম্মান-সূচক হইলেও অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইত, এবং তাহাতে তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা অম্বিকার সম্বন্ধে একটি কথাও থাকিত না। কন্যার প্রতি গদাধরের এই তাচ্ছিল্য ভাব দেখিয়া, তাঁহার বিশেষ অভিমান হইত। এই জীবনদাত্রী, বহু উপকারিণী কন্যাকে নির্দ্দয় অকৃতজ্ঞ গদাধর কিরূপে উপেক্ষা করিল? ভগবানের সৃষ্ট মানুষ, মানুষ নাম ধরিয়া, কিরূপে এরূপ অকৃতজ্ঞ হইতে পারিল?

অম্বিকার কথা শুনিয়া কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় কহিলেন, "না, তুমি গদাধরের কথা বোল না। আর, তার কাছে কোনও প্রকার সাহায্য পাবার প্রত্যাশা রেখ না।"

অম্বিকা। বাবা, তুমি গদাধরের উপর রাগ কোর না। সে কোন কারণ বশতঃ আমাদের সঙ্গে দেখা করে' যেতে পারে নি বলে,' তুমি তার প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে রয়েছ।

কৃষ্ণ। আমি তার উপর রাগ করি নি। কিন্তু দেখ, সে কি অকৃতজ্ঞ! তুমি একদিন তোমার জীবন সঙ্কটাপন্ন করে তাকে গঙ্গাস্রোত থেকে উদ্ধার করেছ; এখন সে তোমাকে একখানা চিঠি লেখাও আবশ্যক বিবেচনা করে না! ইদানী তুমি চিঠি লিখলেও তার উত্তর দেয় না, আর আমাকে পত্র লিখলেও তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে না।

অম্বিকা। বাবা, আমার কি সাধ্য যে আমি কারও জীবন উদ্ধার করি? তুমি ত কতবার বলেছ যে, ভগবানই একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা। আমি ধন্য যে, আমার মত তুচ্ছ তৃণকে তিনি

ক্ষণেকের জন্যে আপনার যন্ত্ররূপে চালনা করেছিলেন। নিজের এই সৌভাগ্যের জন্যে, আমি কেন গদাধরের কৃতজ্ঞতা কামনা করব ?

কৃষ্ণ। মা, তুমি তার কৃতজ্ঞতা কামনা কর না, আমিও তার প্রতি অপ্রীতি রাখি না। তবু কলকাতা যেতে হলে, আমরা তার সাহায্য চাইব না। এখন আমাদের কোনও কায করা তার পক্ষে অপ্রীতিকর হতে পারে। আমরা যে কলকাতা যাব, এ সংবাদও গদাধরকে দেওয়া হবে না।

অতএব গদাধরের অজ্ঞাতে, কৃষ্ণচাটুর্য্যে মহাশয় কন্যাকে লইয়া কলিকায় আসিয়া, একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করিতে-ছিলেন। তথায় বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ আসিয়া তাঁহার নেত্রপীড়া উপশম জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে ভিষকৃগণ স্থির করিলেন যে, অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা নেত্রগোলকের পার্শ্বস্থ কয়েকটা সূক্ষ্ম শিরা ছিন্ন করা আবশ্যক হইবে।

চিকিৎসকগণের যুক্তি শুনিয়া অম্বিকা আত্মহারা হইয়া পড়িল। সে বাল্যকাল হইতে পিতা ছাড়া আর কাহাকেও জানিত না; এক্ষণে সেই পিতার সঙ্কটাবস্থায় তাহার যে বিহ্বলতা ঘটিয়াছিল তাহা অনুমেয়, বর্ণনীয় নহে। সে প্রাণপণ শক্তিতে পিতার সেবা করিয়াও একবারও মনে করিতে পারে নাই যে, পিতার তাৎকালিক শারীরিক অবস্থাতে তাহা যথেষ্ট হইল। তাহার

এই সেবাব্রতে সহায়তা করিবার জন্য যদি সে কাহাকেও পাইত! যদি এই মহাব্রতে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইবার জন্য, তাহার একটি ভ্রাতা থাকিত! আগামী কল্য যখন তাহার পিতার চক্ষুতে অস্ত্র প্রয়োগ হইবে, তখন সে সহায়হীনা কিরূপে স্থির হইয়া থাকিবে? চিত্তব্যাকুলতা লইয়া কিরূপে পিতার শুশ্রূষা করিতে সমর্থ হইবে?

সে কাতরস্বরে পিতাকে কহিল, "বাবা, আমার ইচ্ছা যে কাল তোমার চোখে অস্ত্র হবার আগে, গদাধরকে ডেকে আনি; —তুমি কি বল?"

এক্ষণে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় চক্ষুরোগে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন। এখন পৃথিবীতে যেখানে যতটুকু স্নেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা গ্রহণ করিয়া, আপনার কাতরতাকে আবৃত করিবার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন। তিনি মনে করিলেন, দেখা যাউক, নির্দ্দয় গদাধরের নিকট হইতে কিছু স্নেহ লাভ করিতে পারা যায় কি না? ইহা মনে করিয়া, তিনি অম্বিকাকে কহিলেন, "তুমি নিজে গিয়ে কাল সকালে গদাধরকে নিয়ে এস। তুমি নিজে না গেলে সে আসবে না।"

পিতার আজ্ঞা পাইয়া, অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া, একখানি শকটে আরোহণ করিয়া, অম্বিকা গদাধরকে লইতে আসিল।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অম্বিকার স্বপ্ন।

অম্বিকাকে দেখিয়া গদাধরের মনে হইল, তাহার রাত্রের স্বপ্নটা জীবন্ত হইয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছে। অথবা তাহার জাগরণটা জাগরণ নহে, জাগরণের স্বপ্ন মাত্র;—এখনও সে ঘুমাইতেছে, ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছে। হায়! গদাধরের বাস্তব জীবনটা যদি স্বপ্নময় হইয়া যাইত!

আত্মহারা গদাধর অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "অম্বিকা! তুমি কি করে' এলে?"

অম্বিকা কহিল, "বাবার চোখের অসুখ হয়েছে; আমি তাঁকে নিয়ে দু মাস হল কলকাতায় এসেছি।"

গদাধর বলিল, "কৈ, এ সংবাদ ত তুমি আমাকে দাও নি।"

অম্বিকা মনে মনে ভাবিল, "তুমিই কি আমাদের সংবাদ নিয়েছিলে? কালীদহে গেলে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা করলে না! আমি যে চাতকিনীর মত তোমার একবিন্দু করুণার প্রত্যাশায় পথ চেয়ে বসে থাকি, তা কি তুমি বুঝতে পার না?"—প্রকাশ্যে বলিল, "তুমি পাছে আমাদের নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়, তাই বাবা তোমাকে এ সংবাদ দিতে বারণ করেছিলেন।"

গদাধরের চক্ষে জল আসিল। কহিল, "বিব্রত! বিব্রত!

আমি তোমাদের নিয়ে বিব্রত হব? ছি ছি! অম্বিকা, কি করে' তুমি এ কথা ভাবলে? আমি গদাধর, আমি কি মানুষ নই? তোমাদের সমস্ত যত্ন কি বৃথা হয়ে গিয়েছে;—তোমরা কি গদাধরকে তোমাদের সহস্র চেষ্টার দ্বারা মানুষ করে তুলতে পার নি? আমি তোমাদের জন্যে বিব্রত হয়ে পড়ব? দেবী অম্বিকা কি আমাকে জলে আপন জীবন সঙ্কটাপন্ন করে উদ্ধার করে নি? আমার বাপের মৃত্যুশয্যার পাশে বসে' তাঁর শেষ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে নি? চল অম্বিকা,—আমি এই দণ্ডে তাঁর কাছে যাব। তাঁর চোখের অসুখ কি কঠিন?"

অম্বিকা। কঠিন অসুখ; আজ বেলা এক প্রহরের পর অস্ত্র করা হবে।

পূর্ব্বদিন যে একবারও আহার হয় নাই, তাহা গদাধর ভুলিয়া গেল;—মুহূর্ত্তমধ্যে সে অম্বিকার সহিত গাড়ীতে গিয়া বসিল। গাড়ীতে বসিয়া, অম্বিকার মুখের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিয়া, সে আবার বলিল, "ছি অম্বিকা! তোমরা কি করে' ভাবলে যে, আমি তোমাদের নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ব?"

অম্বিকা। তা বলতে পারি না। প্রায় আড়াই বৎসর আগে তুমি একবার কালীদহে গিয়েছিলে; মনে আছে? তখন তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা করে আসনি কেন?

গদাধর। তোমার চিঠির উত্তরে, তা ত তোমাকে জানিয়েছিলাম।

অম্বিকা। তোমার সে চিঠিখানি এখনও আমার কাছে

আছে। তুমি লিখেছিলে যে আমি তোমাকে যে কর্ত্তব্য প্রতিপালন করতে বলেছিলাম, সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধেই তুমি আমাদের সঙ্গে দেখা কর নি। তুমি আরও লিখেছিলে যে, আমার সঙ্গে দেখা করলে, জগতের অকল্যাণ হবে ভেবে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করনি। চিঠিখানা আমি বাবাকে দেখিয়েছিলাম।

গদাধর। এ'টা তুমি ভাল কায কর নি। চিঠিখানা তোমার জন্যেই লিখেছিলাম। তা তোমার বাবাকে দেখান উচিত হয় নি। তোমাতে আমাতে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সকল কথা হয়েছিল, তিনি ত তা জানেন না। সে সকল কথা না জেনে, আমার সেই চিঠিখানা পড়লে, তিনি সহজেই মনে করবেন যে আমি তাঁর প্রতি রূঢ় আচরণ করেছি।

অম্বিকা। তুমি তাঁর কাছে গিয়ে দুটো কথা বল্লেই, তিনি সব অভিমান ভুলে যাবেন ;—তিনি তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন।

গদাধর। আর, তোমার প্রতি আমি যে রূঢ় আচরণ করেছি ?

অম্বিকা। করেছ বুঝি ? কিন্তু তোমার প্রতি আমার কোনও অভিমান নেই। তোমার চিঠিখানা পড়ে একটু ব্যথা পেয়েছিলাম ;—বুঝতে পারিনি, আমার সঙ্গে দেখা করলে, জগতের কি অকল্যাণ হবে। তুমি এখন আমাকে বুঝিয়ে দাও।

গদাধর। অম্বিকা, ভগবান্ জানেন, তুমি যা বুঝতে চাচ্ছ, তা বোঝাবার জন্যে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ; কিন্তু—!

অম্বিকা। কিন্তু কি ?

গদাধর। তাও আজ বলতে পারব না; তুমি আমাকে ক্ষমা কোর।

গদাধর বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার হৃদয়ের সমস্ত গুপ্ত কথাগুলি তাহার সেই সতৃষ্ণ নয়ন পথ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। এবং সেই গোপন কথাগুলি অম্বিকার বক্ষে স্থান লাভ করিয়া, হৃদয়ের প্রত্যেক কম্পনের সহিত নৃত্য করিতেছিল। ভালবাসা কেহ গোপন রাখিতে পারে না।

অম্বিকা পিতার নিকট প্রত্যাগতা হইয়া গদাধরের আগমন সংবাদ দিল। কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের চক্ষু বস্ত্রখণ্ডমধ্যে বদ্ধ ছিল; তিনি গদাধরকে দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া, অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন; সুর করিয়া কহিলেন "পশ্যাম্যচক্ষুঃ।"—তাহার পর গদাধরের হস্তে, আপন হস্ত ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি চক্ষুহীন হলেও, তোমাকে আর অম্বিকাকে দেখতে পাব। তোমাদের দর্শন হতে যদি আমাকে বঞ্চিত না হতে হয়, তা হলে, চক্ষুহীন হলেও আমি দুঃখিত হব না।"

গদাধর, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের সহিত গল্প করিতে লাগিল; অম্বিকা স্থানান্তরে গৃহকার্য্যে রত হইল। কিয়ৎকাল পরে, সে ফিরিয়া আসিয়া গদাধরকে ডাকিল, "এস।"

গদাধর। কোথায় যাব?

অম্বিকা। পাশের ঘরে তোমার জন্যে কিছু খাবার রেখেছি। চল, খাবে চল।

গদাধর। এখন খাব না।

অম্বিকা। ডাক্তারদের আসবার এখনও দেরী আছে। তাঁদের আসবার আগেই তুমি কিছু খেয়ে নাও।

গদাধর। ডাক্তারেরা চলে যাবার পর খাব এখন।

কিন্তু অম্বিকা কিছুতেই ছাড়িল না; বলিল, "না, এখনই তোমায় খেতে হবে।" কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ও গদাধরকে আহার করিতে যাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিলেন।

গদাধর অগত্যা পার্শ্বের ঘরে আহার করিবার জন্য উপস্থিত হইল। তথায়, পরিস্কৃত কদলী-পত্রে সদ্যপ্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যসকল সৌরভ বিস্তার করিয়া ক্ষুধাকে আহ্বান করিতেছিল। গদাধর ভাবিল, এই বহুবিধ খাদ্য অম্বিকা কিরূপে এত অল্প সময় মধ্যে প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইল? অম্বিকাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ সকল খাবার কি তুমি নিজে তৈরি করেছ?"

অম্বিকা বলিল, "একজন ব্রাহ্মণী আছে, সে আমাকে সাহায্য করেছে। বাবার জন্যে খাবার আমিই তৈরি করে থাকি। আমি না রাঁধলে তাঁর খাবার সুবিধা হয় না। তিনি বেশী মসলা দেওয়া তরকারী খেতে পারেন না।"

গদাধর আবার জিজ্ঞাসা করিল "এত জিনিষ, তুমি এত অল্প সময় মধ্যে কি করে' রাঁধলে?"

অম্বিকা। আমি সকালে উঠে রান্নার আয়োজন করে', তোমাকে ডাকতে গিয়েছিলাম। রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখে, তোমাকে খাওয়াবার জন্যে আমার ইচ্ছা হয়েছিল।

গদাধর। কি স্বপ্ন দেখেছিলে?

অম্বিকা। স্বপ্ন দেখেছিলাম, যেন তোমার সমস্ত দিন খাওয়া হয় নি; যেন তুমি ক্ষিধেয় কাতর হয়ে, আমার কাছে খাবার চাইছ।

গদাধর। সত্যি অম্বিকা, তোমার স্বপ্ন সত্যি; কাল আমার ভাগ্যে খাওয়া ঘটে নি।

অম্বিকা। কেন?

গদাধর আহার করিতে করিতে, পূর্ব্ব দিনের সমস্ত ঘটনা অম্বিকার নিকট বিবৃত করিল। কিন্তু সে আপন স্বপ্নবৃত্তান্ত গোপন রাখিল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মানদার ভালবাসা।

অম্বিকা গদাধরের অনশন-কথা শ্রবণ করিল, এবং গদাধর অম্বিকার স্বপ্নকাহিনী শুনিল; পরস্পর পরস্পরের দিকে আরও একটু আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। হৃদয়াবেগে উভয়ের সংযমের বাঁধ বুঝি ভগ্ন হইয়া যায়!—কিন্তু দৈব তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। আহার এবং কথা সমাধা হইতেই পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে, ডাক্তারেরা আসিয়াছেন। শুনিয়া, উভয়ের মোহস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

গদাধর ত্বরিতপদে ডাক্তারদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের চক্ষে অস্ত্রপ্রয়োগ জন্য যে সকল উদ্যোগ করা আবশ্যক তাহা সম্পন্ন করিল। চিকিৎসকগণ প্রস্তুত হইলে, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় সহাস্যবদনে কহিলেন, "আপনাদের শুভকার্য্য সমাধা করুন। আপনাদের কৌশলে আমার রোগ ভাল হয়—ভালই; না হয়, দুটো চক্ষুর জন্যে আমি বিশেষ খেদ করব না।"

ডাক্তারেরা একবাক্যে বলিলেন, "আপনার চক্ষু আমরা নিশ্চিত ভাল করে দেবো।"

তাঁহারা অস্ত্রপ্রয়োগও করিয়াছিলেন, চক্ষু আরোগ্যও করিয়া-

ছিলেন ;—কিন্তু আরোগ্যটা অল্প দিনে ঘটে নাই। সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া কালীদহে ফিরিতে কৃষ্ণ চাটুর্য্যের প্রায় দুই বৎসর বিলম্ব ঘটিয়াছিল। এই দুই বৎসর কাল, তিনি কন্যাকে লইয়া গদাধরের বাটীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। গদাধরের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তিনি পৃথক্ বাস করিতে পারেন নাই।

যদিও মানদা অম্বিকা-ঘটিত তাহার স্বামীর অপবাদ মুলীর নিকট ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছিল, তথাপি সে অম্বিকাকে আপন বাটীতে স্থান দিয়া কিছুমাত্র দুঃখিত হয় নাই। তাহার পরিচ্ছদ এবং অলঙ্কার সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প শুনিবার জন্য এবং তাহার পুত্রকে কোলে লইয়া শান্ত করিবার জন্য একজন স্বগ্রামবাসিনী পরিচিতা সঙ্গিনী পাইয়া, মানদা অম্বিকাকে লইয়া বেশ আনন্দে ছিল। অম্বিকার যত্নে সে সুপক্ক এবং রুচিকর উপাদেয় সামগ্রী সকল আহার করিতে পাইত; পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার পরিধান কালে অম্বিকা তাহার বিশেষ সহায়তা করিত। অম্বিকা তাহার মূল্যবান্ সজ্জাসকল সযত্নে পেটক মধ্যে সজ্জিত করিয়া রাখিত। তাহার শয্যাকক্ষ ও শয্যা অম্বিকার যত্নে সদ্য আহৃত কুসুম-সুবাসে সুবাসিত হইয়া থাকিত। সুতরাং অম্বিকা মানদাদের বাটীতে দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করায় মানদার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

বাটীতে অম্বিকা থাকাতে, গদাধরের বাটীর শ্রী শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। অম্বিকার আলস্যহীন উদ্যোগে, তাহার গৃহের মধ্যে সর্ব্বত্র একটা সুচারু সুশৃঙ্খলা বিরাজ করিত। গৃহতল, সুমার্জ্জিত

এবং পরিচ্ছন্ন গৃহসামগ্রীসকল নির্ম্মল বক্ষে ধারণ করিয়া, লক্ষ্মীর পদাশ্রিত স্বর্ণ-কমলের ন্যায় শোভা পাইত। মহিমময়ী অম্বিকার মহিমা ছায়ায়, গদাধরের ভবন মধ্যে তপোবনের পরমা শান্তি পরিলক্ষিত হইত।

কিন্তু গদাধরের সহিত অম্বিকার বড় একটা সাক্ষাৎ ঘটিত না। গদাধরের ভোজন সময়ে তাহার ভোজন-কক্ষে আহার সমগ্রী সকল সজ্জিত করিয়া এবং মানদাকে তথায় উপবিষ্ট করাইয়া, অম্বিকা অন্য কার্য্যের জন্য কক্ষান্তরে চলিয়া যাইত। সময়ান্তরে মানদার সহিত সম্ভাষণ জন্য গদাধর অন্তঃপুর মধ্যে সমাগত হইলে, সে নিভৃতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া খোকাকে ক্রোড়ে লইয়া নীরবে ক্রীড়া করিত। যে কক্ষ কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের শয়ন জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহারই এক নিকটবর্ত্তী কক্ষে অম্বিকা শয়ন করিত। নুলীও অম্বিকার সহিত এই কক্ষে মেঝের উপর শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিয়া থাকিত। মানদার আশঙ্কার পথে বুদ্ধিমতী নুলী সতর্ক প্রহরীর কার্য্য করিত।

নুলী ত বুঝিতে পারে নাই যে, আপনি অন্তরালে থাকিয়া, অম্বিকা যে অদৃশ্য আদর অহরহ গদাধরকে পাঠাইয়া দিতেছিল, তাহার অদৃশ্য অথচ অপ্রতিহত স্রোত নিবারণ করা মানবশক্তির সাধ্যাতীত। অন্তরালে থাকিয়া গদাধর আপনাকে এই ভাল-বাসার তীব্র স্রোতের মধ্যে ভাসাইয়া দিয়াছিল। শুভ্র স্নিগ্ধ শয্যায় শয়ন করিয়া, তদুপরি মনোরম কুসুমসকল বিকীর্ণ দেখিলে, গদাধর মনে করিত অম্বিকার কোমল স্পর্শ পুষ্পাকারে তাহাকে

বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আহার কালে, সুস্বাদু ব্যঞ্জন মধ্যে সে তাহারই অপরিমিত আদরের আস্বাদন পাইত। মানদা যখন অপূর্ব্ব ভূষায় ভূষিত হইয়া গদাধরের সমীপবর্ত্তী হইত, গদাধর তখন তাহার অঙ্গরাগ মধ্যে অম্বিকারই বিচিত্র চারুতার সন্ধান পাইত। গৃহের উজ্জ্বল প্রফুল্ল দ্রব্যসকলের মধ্যেও সে অম্বিকার লাবণ্য-হিল্লোল অবলোকন করিত। খোকা যখন অম্বিকার নিকট হইতে নির্ম্মল পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া গদাধরের নিকট আসিত; গদাধর তখন মনে করিত, কে যেন তাহাকে প্রণয়ের উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়াছে। এইরূপে অন্তরালে থাকিয়াও অম্বিকা গদাধরকে শত আদরে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

নারিকেল-মধ্যস্থিত অম্বুর ন্যায়, যে প্রেম গদাধর তাহার হৃদয় মধ্যে কঠিন কর্ত্তব্যবন্ধনে বদ্ধ রাখিয়াছিল, অম্বিকাও তাহার সন্ধান পাইয়াছিল। পূর্ণিমার শশী মেঘাবৃত থাকিলেও বারিধির হৃদয় যেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, গদাধরের প্রেম তাহার হৃদয়ে গুপ্ত থাকিলেও, অম্বিকার হৃদয়-সাগর তাহার আকর্ষণে তেমনই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। কানন মধ্যে বসন্তসঞ্চার হইলে, গৃহের কোণে বসিয়া গৃহপালিতা কোকিলা যেমন তাহার সন্ধান পাইয়া প্রফুল্ল হইয়া উঠে, অম্বিকার মনটি অন্তরালে থাকিয়াও, গদাধরের হৃদয় মধ্যে সঞ্চারিত গুপ্ত প্রেমের সন্ধান পাইয়া তেমনই প্রফুল্ল হইয়া, বুঝি কোকিলার ন্যায় মধুর কুহরণে আকাশতল প্লাবিত করিয়া দিতেছিল। ভ্রমর যেমন পুষ্পকলির

মধ্যস্থ পলাশনিবদ্ধ মধুর সন্ধান পায়, অম্বিকাও তেমনই গদাধরের বক্ষোনিবদ্ধ প্রেমের সন্ধান পাইয়াছিল।

তথাপি এ যাবৎ কেহ কাহারও নিকট আপনার প্রেমকাহিনী ব্যক্ত করে নাই। গদাধর আপনার হৃদয়ের সহিত মহা সংগ্রামে প্রবৃত্ত ছিল। অম্বিকা মনে করিত, "এখন নয়, মরণের পূর্ব্বদিন প্রাণেশ্বরকে সকল কথা বলিয়া যাইব।"

এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাল গদাধরের বাটীতে অবস্থিতি করিয়া, অম্বিকার কালীদহ প্রত্যাগমনের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। স্থির হইয়া গেল যে, আর চারি দিন পরে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় কন্যাকে লইয়া কালীদহে যাত্রা করিবেন। অন্তরালে থাকিয়া, ব্যথিত হৃদয়ে সজল নয়নে অম্বিকা গদাধরকে বারবার দর্শন করিল। হায়! সে তখনও জানিতে পারে নাই যে, সে ইহজীবনে আর কখনও গদাধরকে দেখিতে পাইবে না—অচির-কাল মধ্যে তাহার সংসারলীলার শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়া যাইবে।

কালীদহে ফিরিবার পূর্ব্বদিন রাত্রে অম্বিকা স্বপ্ন দেখিল। স্বপ্ন ঘোরে তাহার মুখ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, "গদাধর, গদাধর, প্রাণেশ্বর, বিদায় দাও।" বলা বাহুল্য, মুলীর সতর্ক কর্ণে কথাগুলি বজ্রনিনাদে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আহারাদির পর কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় অম্বিকাকে লইয়া প্রস্থান করিলে, এবং বিষাদমেঘাচ্ছন্ন মুখ লইয়া, গদাধর আদালতে যাইলে, মুলী শয়নকক্ষের নিভৃতে মানদার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া,

তাহার কাণের কাছে মুখ লইয়া কহিল, "ছুঁড়ীর জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়। এতটা বয়স হল, স্বামী কাকে বলে তাহা জানলে না। জামাই বাবুর জন্যে ছুঁড়ী পাগল হয়ে যাবার মত হয়েছে। যাবার সময়, জামাই বাবু কোথায় ছিল কে জানে,—সে তাকে দেখবার জন্যে, বড় বড় ছলছলে চোখ দুটো উঁচু করে' চারিদিকে চাইতে লাগল। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখে জামাই বাবুর নাম ধরে ডাকতে লাগল। সে জামাই বাবুকে বড় ভালবাসে।"

মুলীর কথা শুনিয়া, মানদা একটুখানি হাসিল। ভাবিল, "মুলী পোড়ারমুখী ভালবাসার কথা কি বলে?"

এস পাঠিকাগণ, আমার মানদাকে ডাকিয়া বলি,—"বাদাম বাটা সংযুক্ত ক্ষীরের প্রতি, অথবা ইলিশ মৎস্যের ডিম্বের প্রতি তোমার যে ভাব, তাহাকেই আমরা ভালবাসা বলি।"

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চারুশশীর বৈধব্য।

চারুশশীর স্বামী অতুলানন্দ অতিরিক্ত মদ্যপান জন্য পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার যকৃতের বিকৃতি কোন প্রকারে আরোগ্য না হওয়ায়, চারুশশীকে অকালে বৈধব্য-অনলে দগ্ধ করিয়া সে ইহসংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এ ঘটনাটা ছয় মাস পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

কন্যার এই বিপদে, চারুশশীর পিতা গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায় বৃদ্ধ বয়সে একান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইদানীং তাঁহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না। ভরণপোষণের জন্য তিনি কন্যার অর্থ-সাহায্যের উপর অনেকটা নির্ভর করিতেন। জামাতার মৃত্যু ঘটায় তাঁহার এই সাহায্যের পথ বন্ধ হইয়া গেল। ইহার উপর, আবার কন্যার ভরণপোষণের ভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল।

কলিকাতা ঝামাপুকুরের বাটী ও কয়েকখানা অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যে কয়েক সহস্র টাকা চারুশশী সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, তাহা সে তাহার পিতার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিল। কিন্তু অত্যন্ত অসচ্ছল অবস্থা নিবন্ধন কন্যার গচ্ছিত অর্থে, গোবিন্দলালকে মধ্যে মধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইত।

এবং কন্যা পাছে এ বিষয় অবগত হইয়া, রণরঙ্গিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া মাতাকে দ্বৈরথ সমরে আহ্বান করে, এই আশঙ্কায় মুখোপাধ্যায় মহাশয় কন্যার প্রীত্যর্থে নানারূপ কৌশলানুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কন্যার কোনও মতের প্রতিবাদ করা বা তাহার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা, তাঁহার পক্ষে, বা তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পক্ষে একবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল।

পিতার এইরূপ প্রশ্রয়ে চারুশশী পিতৃগৃহে আসিয়া একপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছিল। সে গ্রামের মধ্যে সর্ব্বত্র রটনা করিয়াছিল যে, মানদার কপাল পুড়িয়াছে ; অম্বিকা কলিকাতায় যাইয়া, নির্লজ্জার ন্যায় গদাধরের গৃহে বাস করিয়া অবাধে গদাধরের সহিত প্রেমলীলায় অভিভূতা রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, কলিকাতা অবস্থান কালে, চারুশশী অম্বিকার কোনও তত্ত্বই অবগত হইতে পারে নাই। কালীদহে আসিয়া যখন সে শুনিল যে, অম্বিকা কালীদহে নাই এবং কলিকাতায় যাইয়া পিতার সহিত গদাধরের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছে, তখন সে কল্পনার বলে অম্বিকার প্রেমলীলা সম্বন্ধে নানা প্রকার কাহিনী রচনা করিয়া, গ্রামস্থ আবালবৃদ্ধ-বনিতার নিকট বিবৃত করিল। সকলেই জানিল যে, অম্বিকা কলঙ্কসাগরে ডুবিয়াছে। গ্রামের সকলেই বলিল,—ছি ছি ছি!

একদিন দিবা অবসানকালে, কাঁখে কলসী লইয়া, চারুশশী গাত্র ধাবন জন্য গঙ্গাতটে উপস্থিত হইল। আমাদের পূর্ব্বকথিতা বিমলা তথায় তাহাকে সমাগতা দেখিয়া, নিগূঢ় তথ্য

অবগত হইবার জন্য উৎসুক হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিল, "হ্যাঁ লা চারু, ব্যাপারখানা কি বল্ দেখি।"

চারু। কার কথা বল্‌ছিস্?

বিমলা। আবার কার কথা বলব,—সেই অম্বিকার কথা। কতদিন মনে করেছি যে, তোকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করব। তা' পোড়া সংসারের জ্বালায় কি একটু মন খুলে কথা কইবার উপায় আছে?

চারু। কাযের কথা আর বলিস্ নে; রাতদিন কায কায করে' আমারও হাড় জ্বালাতন হয়েছে। স্বামী নেই, পেটের একটা ছেলে নাই,—আমার কোন ঝঞ্ঝাটই নেই ভাই!—তবু সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একটু হাঁফ্ ছাড়্‌বার অবসর পাইনে। সেই সকালে উঠেছি, আর এই সন্ধ্যা হতে চল্ল; এর মধ্যে যদি ভাই একদণ্ড বসে থাকি!

বিমলা। আজ তোদের কি রান্না হয়েছিল চারু?

চারু। আমাদের আবার রান্না! আমার পোড়া কপাল পুড়ে অবধি মা বাবা দুজনেই নিরামিষ খান। তা' আমি সমস্ত যোগাড় যন্ত্র করে' দিয়েছিলাম, মা উননটা জ্বেলে দুটো নিরামিষ তরকারি আর ডাল ভাত রেঁধেছিল। পোড়া দেশে, কলকাতার মত পাথুরে চুণ পাওয়া যায় না। আমি বিধবা মানুষ, কি করে' গুগ্‌লির চুণ ছোঁব?—তাই ও পাড়ার ঠান্‌দিদিকে দিয়ে বাবার জন্যে দুটো পাণ সাজিয়ে নিয়েছিলাম।

বিমলা। তুই আর পাণ খাস না?

চারু। কি বলে আর কি কয় :—বিধবা মানুষের কি কখনও পাণ খেতে আছে। ধনের চাল, বড় এলাচের দানা, এই সব তামাক পাতার সঙ্গে মিশিয়ে মা একরকম দোক্তা তৈরী করে রেখেছে, পাণ না খেয়ে মুখটা যখন বড় কেতার হয়ে যায়, তখন তাই চার্‌টি চার্‌টি মুখে দিই।

কথা কহিতে কহিতে চারুশশী আপনার নবনির্ম্মিত সুবর্ণগঠিত চুড়িগুলি ঘুরাইয়া দেখিল। নূতন চুড়ি দেখিয়া বিমলা কহিল, "দেখি দেখি, এ চুড়ি কবে গড়ালি ?"

চারুশশী কহিল, "আমার শুধু-হাত দেখে মা মাটিতে পড়ে কাঁদতে লাগল। বল্লে, 'তুই হাত খালি করলে আমিও হাতে কিছু রাখব না।'—কি করি ? মার কান্না দেখে, আর বাবার অকল্যাণ হবে ভেবে, কঙ্কণ আর বালা ভেঙ্গে এই সরু রকম পাঁচ গাছ করে' চুড়ি গড়িয়েছি।—কেমন গড়ন হয়েছে, ভাই ?"

বিমলা। বেশ গড়ন হয়েছে ;—আর তোর হাত ছ'খানিতে মানিয়েছে ভাল।

হাস্যময়ী সখীর নিকট, আপন আহার বিহার সম্বন্ধে উল্লিখিত রূপ ভূমিকা সমাধা করিয়া, নেত্র ঘূর্ণন, নাসাসঙ্কোচন ও ওষ্ঠস্ফুরণ সহকারে চারুশশী কল্পনাবলে বিরচিত অম্বিকা-ঘটিত মূল কাহিনী কীর্ত্তিত করিল। শুনিয়া, গঙ্গার হৃদয় তরঙ্গভঙ্গিমায় শিহরিয়া উঠিল ; দিবা অবসান কালের নির্ম্মল নীল আকাশ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ; গগনবিহারী বিহঙ্গমগণ বৃক্ষপল্লবের নিভৃতে মুখ ঢাকিল ; সর্ব্বংসহা মেদিনীর মুখে শর্ব্বরীর ছায়া পড়িল।

সেই মধুর কাহিনী শ্রবণ করিয়া বিমলা অত্যন্ত পুলকিতা হইল; এবং তাহার পোড়া সংসারের সমস্ত জ্বালা ভুলিয়া গেল।

যাহারা চারুশশীর শ্রীমুখ হইতে অম্বিকার কথা শুনিবার অবসর প্রাপ্ত হয় নাই, পর দিন তাহারা বিমলার নিকট হইতে সেই সকল অলঙ্কারযুক্ত, ছন্দোবন্ধসম্পন্ন অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিল। তাহার পরদিন অম্বিকা-কথা-অনভিজ্ঞা অন্যা কামিনীগণ আবার সেই কাহিনী শুনিয়া ধন্যা হইল। এইরূপে, উলুবন মধ্যে অগ্নির ন্যায়, সমস্ত গ্রাম মধ্যে অম্বিকার কলঙ্করাশি ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

অম্বিকা কালীদহে ফিরিলে তাহারও কর্ণেও এ সংবাদ পৌঁছিল। হায়! গদাধরের উজ্জ্বল শুভ্র গৌরব সে কিরূপে কলঙ্কলিপ্ত দেখিবে? সমস্ত শ্রবণ করিয়া, সে মনে করিল, এক্ষণে তাহার মরণই মঙ্গল।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

উমাকালীর গঙ্গালাভ।

অম্বিকা ও তাহার পিতাকে যে দিন গদাধর বিদায় দিয়াছিল, তাহার দশ দিন পরে সে তাহার চক্রবর্ত্তী কাকার নিকট হইতে এক পত্র প্রাপ্ত হইল। উমাকালী চক্রবর্ত্তীর অনুরোধে সুবিধা-জনক মূল্যে, এ যাবৎ গদাধর অনেকগুলি মহাল ক্রয় করিয়াছিল। এই জমিদারীঘটিত কোন একটা ব্যাপারে, উমাকালী পত্র লিখিয়া গদাধরকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

পত্র পাইবার কয়েক দিন পরে, খোকার মুখ চুম্বন করিয়া এবং তাহাকে দুষ্টামী করিতে নিষেধ করিয়া, এবং মানদার নিকট বিদায় লইয়া, গদাধর কয়েক দিনের জন্য নাড়িচা যাত্রা করিল। যাইবার পূর্ব্বদিন সে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়কে পত্র লিখিয়া জানাইল যে, পরদিন সে কয়েকটা কার্য্যের জন্য নাড়িচা যাত্রা করিবে, এবং সম্ভবতঃ পাঁচ দিন পরে সে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিবে।

নাড়িচা আর পূর্ব্বের নাড়িচা ছিল না। তাহার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাহার পাঠশালায় গ্রাম্য বালকেরা পাঠ অভ্যাস করিত। গদাধরের মাতার নামে প্রতিষ্ঠিত তাহার শিবমন্দিরে গ্রাম্য মহিলাগণ পূজা করিতে আসিত। তাহার শ্যামলশ্রী দ্বিখণ্ডিত করিয়া, সীমন্তিনীগণের সিঁথির ন্যায় এক সরল রাজপথ

নান্দীপুর অভিমুখে বিস্তৃত হইয়াছিল। এই রাজপথের সীমান্তে, গঙ্গাসৈকতে, সীমন্তিনীগণের সীমন্তপ্রান্ত বিভূষিত সিন্দূর-বিন্দুর ন্যায় রক্ত ইষ্টক গঠিত সোপানাবলী বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। ঘাটের উপর, রাজপথের পার্শ্বে, গদাধরের জমিদারী-কাছারী; কাছারী বাটী ইষ্টকনির্ম্মিত, দ্বিতল। নিম্নতলে বসিয়া, উমাকালী চক্রবর্ত্তীর নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ গদাধরের জমিদারী-সংক্রান্ত কার্য্যকলাপ সম্পন্ন করিত; দ্বিতলের কয়েকটা ঘর গদাধরের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাছারী বাটীর পশ্চাতে, দুইটা অতি বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়াতলে, একখানা বড় আটচালা ছিল, তাহাতে সপ্তাহে দুইবার হাট বসিত; তথায় পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানা গ্রামের অধিবাসিগণ খাদ্য এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় এবং বিক্রয় জন্য আগমন করিত।

গদাধরের নৌকা আসিয়া পূর্ব্বোক্ত বাঁধাঘাটে ভিড়িল। কিন্তু তীরে চক্রবর্ত্তী কাকা তাহার আগমন অপেক্ষায়, দণ্ডায়মান ছিলেন না। কেবল মাত্র কর্ম্মচারিগণ তথায় উপস্থিত ছিল। তীরে উঠিয়া, গদাধর তাহাদের নিকট শুনিল যে, পূর্ব্বরাত্রি হইতে তাঁহার প্রবল জ্বর হওয়ায় তিনি শয্যাগত হইয়াছেন। গদাধর চিন্তিত মনে, তাঁহার বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

গৃহের দাওয়ায় বসিয়া উমাকালীর স্ত্রী স্বামীর জন্য পানীয় প্রস্তুত করিতেছিলেন। গদাধরকে দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। বলিলেন, "তুমি এলে? কাল সমস্ত

রাত বিকারের ঘোরে, কেবল তোমার নাম ধরে' ডেকেছেন। তাঁর এরকম অসুখ আমি আর কখনও দেখি নি।"

গদাধর। আপনি কাঁদবেন না। আমি ডাক্তার আনবার জন্যে লোক পাঠিয়েছি। সহজেই রোগ ভাল হয়ে যাবে।

উমা-স্ত্রী। তাই বল, বাবা! তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। তুমি একবার ঘরের ভিতর গিয়ে দেখ।

উমাকালী গৃহমধ্যে শয্যায় শয়ান ছিলেন। গদাধরকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "তুমি আসবে, আমি তা জানতাম। তোমার বাবার মৃত্যুকালে আমি তাঁর কাছে এই আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেছিলাম যে, যেন আমি তোমার হাতে গঙ্গাজল খেয়ে তাঁর মত মরতে পারি; তাঁর আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হবার নয়। আমি তোমার হাতে গঙ্গাজল খেয়ে এ পৃথিবীর কায শেষ করব। এস বাবা, আমার পাশে বসে' আমার মুখে গঙ্গাজল দাও। তোমার চক্রবর্ত্তী কাকার প্রতি তোমার শেষ কর্ত্তব্য সম্পন্ন কর।"

গদাধর আপন উত্তরীয়াঞ্চলে অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া কহিল, "দেখছি আপনি অকারণ ভীত হয়েছেন। আপনার পীড়া কঠিন নয়। আমি ডাক্তার আনবার জন্যে লোক পাঠিয়েছি; আপনি শীঘ্র ভাল হবেন।"

উমাকালী স্মিতমুখে বলিলেন, "তোমার কায তুমি করেছ; কিন্তু ডাক্তার এসে আমার কিছু করতে পারবে না। উপর থেকে আমার তলব এসেছে; দয়াময় এতদিন পরে আমাকে স্মরণ করে-ছেন। তাঁর আহ্বান অমান্য করা চলবে না।—বাবাজি, তুমি

আমার মুখে গঙ্গাজল দাও। আহা, কি শীতল এই গঙ্গাজল!—গঙ্গা, মা,—আজ মরণকালে প্রাণ ভরে' বুঝলাম তুমি সত্যই পতিতোদ্ধারিণী।"

উমাকালীর স্ত্রী অঞ্চলে আপন সজল নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "তুমি অকল্যাণ কথা বোলো না; রোগ কার না হয়? তোমার অসুখ ভাল হয়ে যাবে। সরবত এনেছি খাঁও।"

উমাকালী পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আমরা সহজেই মায়াবদ্ধ জীব। তার উপর তুমি যদি কাঁদ, পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করা সহজ হবে না। আমার এ বৃদ্ধ জীর্ণ দেহ আর পৃথিবীর কোনও কাযে লাগবে না। তোমার ক্ষোভ করবার কিছু নেই,—পুণ্যময়ি, একান্ত মনে তুমি আমার প্রাণপণ সেবা করেছ। এখন আমার এ জীর্ণ দেহের সেবা করা, জীর্ণ মন্দির সংস্কারের মত নিতান্ত বৃথা হবে।"

বৃদ্ধা গৃহিণী চক্ষের দরবিগলিত ধারায় উমাকালীর পদ স্নাত করিয়া কহিলেন, "ওগো! আমার আর কেউ নেই; আমি আর কাউকেও জানি নি; তোমার পদসেবা থেকে আমাকে বঞ্চিত কোর না।"

উমাকালী গদাধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কেউ না থাকলেও, তুমি সন্তানের মা না হলেও, তোমার গদাধর আছে। গদাধরের দিকে চেয়ে দেখ, তোমার দুঃখ থাকবে না;—একা গদাধর তোমার একশো ছেলের বেশী। আমি গদাধরকে দেখে মৃত্যু যন্ত্রণাও ভুলে গেছি।"

গদাধরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গৃহিণী কহিলেন, "বাবা, তুমি একটু এই বিছানায় বসে থাক। কাল রাত থেকে কেবল তোমারই নাম করছেন, আর সব কত কথা বলছেন, তার মানে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছিনে।"

গদাধর রাত্রি দিন উমাকালীর পার্শ্বে বসিয়া রহিল; অতি যত্নসহকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিল। ডাক্তার আসিল; নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিল; কিন্তু উমাকালী আরোগ্য হইতে পারিলেন না। পরদিন দ্বিপ্রহরে, হরিনাম করিতে করিতে, গঙ্গাতীরে, তিনি জন্মের মত নয়ন মুদ্রিত করিলেন। গ্রামের সমস্ত লোক তাঁহার জন্য শোক করিয়া কহিল, "আহা; এমন পরোপকারী লোক আর জন্মাবে না।" গদাধর মনে করিল যে সে দ্বিতীয়-বার পিতৃহীন হইল।

উমাকালী যেজন্য গদাধরকে নাড়িচা গ্রামে আহ্বান করিয়া-ছিলেন, সে কথা, তিনি মৃত্যুর আগে গদাধরকে বলিয়া যাইতে পারেন নাই। তা, সে কথা গদাধরের কর্ণগোচর না হইলেও, পাঠকবর্গের অবগতির জন্য পর পরিচ্ছেদে আমরা তাহা বিবৃত করিব।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

চারুশশীর নূতন কীর্ত্তি।

কলিকাতা হইতে কালীদহে প্রত্যাগমনের পর একদিন সকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় গঙ্গাস্নানের জন্য বাহির হইয়াছিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে তিনি দেখিলেন, বৃক্ষাদি সমাচ্ছন্ন এক নিভৃত স্থানে কোনও ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছে। তৎকালে, এরূপভাবে কে তথায় বসিয়া রহিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহার মনে কৌতূহলের উদয় হইল। তিনি নিকটে আসিয়া দেখিলেন যে, গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায় তথায় উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রমনে কি চিন্তা করিতেছেন। চিন্তা এত গভীর যে, কৃষ্ণ চাটুর্য্যের সামীপ্য তাঁহার উপলব্ধি হইল না। কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় আরও লক্ষ্য করিলেন যে, গোবিন্দলাল মুখোপাধ্যায়ের মুষ্টিমধ্যে কি একটা দ্রব্য আবদ্ধ রহিয়াছে। তিনি গোবিন্দলালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "গোবিন্দবাবু, এ সময়ে আপনি এমন স্থানে বসে কি ভাবছেন?"

কিন্তু সে কথা গোবিন্দলালের শ্রবণপথে প্রবেশ করিল না। তিনি তখন শ্রবণশক্তিটাও চক্ষে পূরিয়া, তাহা দিগন্তপ্রান্তে নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন; বুঝি মরণের পরপারে কি আছে তাহা দৃষ্টি করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়

আবার তাঁহাকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিলেন।

চেতনা লাভ করিয়া, নিকটে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সহসা অবলোকন করিয়া গোবিন্দলাল অত্যন্ত চমকিত হইয়া উঠিলেন এবং বিহ্বলের ন্যায় অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "অ্যাঁ ?"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে আবার প্রশ্ন করিলেন, "আপনি এখানে কি করছেন ?"

গোবিন্দলাল আপনার মুষ্টিধৃত দ্রব্যটা মৃত্তিকাতে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "কি করছি ?"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মৃত্তিকাতে নিক্ষিপ্ত দ্রব্যটা হস্তে তুলিয়া, পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, "এ যে আফিম ! আপনি এতটা আফিম হাতে করে একলা নির্জ্জনে বসে কি করছিলেন ?"

গোবিন্দ। তা কি আপনাকে বলতে হবে ? যদি না বলি ?

কৃষ্ণ। আপনাকে বলবার জন্যে আমি জেদ করব না ; ইচ্ছা হয় বলবেন ; ইচ্ছা না হলে বলবেন না। কিন্তু এই আফিম আমি আর আপনার হাতে দেবো না।

গোবিন্দ। আমি আপনাকে সকল কথাই বলব। কাউকেও আমার দুঃখের কথা না বল্লে আমার বুক ফেটে যাবে।

কৃষ্ণ। আপনার কি এমন দুঃখ ?

গোবিন্দ। আমার দুঃখ ভয়ানক ; তা সহ্য করতে না পেরে, আত্মনাশের জন্যে আফিম কিনে তা খাবার জন্যে, এই নির্জ্জন স্থানে বসে ছিলাম। আপনি কেন এসে আমাকে বাধা দিলেন ?

কৃষ্ণ। আপনি বালক নন; আপনি জানেন যে, আত্মনাশে পাপ আছে।

গোবিন্দ। যে পাপের ভার আমি দিনরাত মাথার উপর বহন করছি, আত্মনাশের পাপ তার চেয়ে বেশী ভারি হবে না।

কৃষ্ণ। 'আপনি কি জানেন না যে, মানুষ যতই পাপ করুক, ভগবানের ভাণ্ডারে তার চেয়েও বেশী ক্ষমা আছে!—আপনি কি এমন পাপ করলেন?

গোবিন্দ। কি পাপ করেছি শুনবেন? আমি আপনার সর্ব্বনাশ করছি।

কৃষ্ণ। আমার সর্ব্বনাশ করেছেন? কৈ, আমি ত নষ্ট হইনি।

গোবিন্দ। আমি আপনার কন্যার বিবাহ রহিত করেছি।

কৃষ্ণ। আমার কন্যার বিবাহ না হওয়া তাহার কোষ্ঠীর ফল।

গোবিন্দ। আমি আপনার স্বর্গগতা পত্নীর কুৎসা রটনা করেছি।

কৃষ্ণ। কুৎসা তাঁর কর্ণে পৌঁছায় নি;—তিনি যে রাজ্যে বাস করছেন, সেখানে নিন্দা পৌঁছায় না। এখন এ সকল কথা ছেড়ে, আপনি বলুন, আপনার দুঃখটা কি?

গোবিন্দ। প্রথম দুঃখ, আমি নিরন্ন, আমার অন্নের সংস্থান নেই। কাল আমি কি খাব, তা আমি জানি নে।

কৃষ্ণ। সহসা আপনার এ রকম অসচ্ছল হবার কারণ কি?

গোবিন্দ। আমার বাড়ীর পাশে এক খণ্ড জমীতে আমি একটি ফলের বাগান তৈরি করেছিলাম। জমীটা আমার নয়;

প্রসন্ন দাসের। প্রসন্নদাসের মৃত্যুর পর তার নাবালক, মামার বাড়ী গিয়ে বাস করছিল। তার অনুপস্থিত সময়ে আমি জমীটা হস্তগত করেছিলাম। পনের বৎসর পরে প্রসন্ন দাসের ছেলে আপন বাড়ীতে ফিরে এল। ছোকরা আমার কাছে এসে তাদের জমীটা চাইলে। আমি বিদ্রূপ করে তাকে বাড়ী থেকে দূর করে' দিলাম। সে নিরুপায় হয়ে আদালতের আশ্রয় নিলে। আমিও মকর্দ্দমা করব বলিয়া কোমর বাঁধলাম। স্ত্রীর অলঙ্কার আর সামান্য লাখেরাজ যা ছিল, বন্ধক রেখে, অর্থ সংগ্রহ করে' ভাল ভাল উকিল নিযুক্ত করলাম। মিথ্যা বলবার জন্যে সাক্ষীদের অর্থের দ্বারা বশীভূত করলাম। কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টা বিফল হল। মকর্দ্দমায় আমার হার হইল। প্রসন্ন দাসের জমী প্রসন্ন দাসের ছেলে পেলে। ঋণের জন্যে আমার জীবনোপায় লাখরাজ জমীগুলি বিক্রি হয়ে গেল। এই সময় বিপদের উপর মহা বিপদ ঘটল। আমার জামাই অকালে মারা পড়ল। মেয়ের কলকাতার বাড়ী আর জিনিষ পত্তর বিক্রি করে মেয়েকে নিয়ে বাড়ী এলাম। মেয়ে তার সমস্ত টাকা—পনের হাজার টাকা—আমার কাছে গচ্ছিত রাখলে। অভাবের সময় মানুষ যা করে থাকে, আমিও তাই করলাম; গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে গচ্ছিত টাকা থেকে ব্যয় করতে লাগলাম। কয়েক মাস পরে মেয়ে আপন টাকা আমার কাছে চাইলে। বল্লে, "আমার টাকা আমাকে দাও, আমি কোম্পানির কাগজ কিনব।"

কৃষ্ণ। আপনি কি করলেন?

গোবিন্দ। আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। গচ্ছিত টাকা থেকে আমি যে কিছু টাকা খরচ করেছি, তা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

কৃষ্ণ। মেয়ের টাকা ব্যয় করেছেন, তাতে ভয়ের কারণ কি?

গোবিন্দ। আপনি ভুলে যাচ্ছেন, মেয়েটি আপনার মেয়ে নয়; আমার মেয়ে। ছেলেবেলা সে যখন পাড়ার অপর কোনও মেয়েকে গাল দিতে পারত, আমি তখন কত আনন্দিত হতাম। তখন ত বুঝতে পারি নি যে, পরের মেয়েকে গালাগালি দিয়ে, সে যে গালাগালিটা অভ্যাস করে' রেখেছিল, তা এখন আমারই উপর ছাড়বে। একে ত সেই মুখফোঁড় মেয়ে, তাকে সহজেই ভয় করতে হয়। তার উপর, নিজে চোরের মত কায করেছিলাম, কাযেই অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লাম।

কৃষ্ণ। তাকে সকল কথা বুঝিয়ে বল্লেই ত হত।

গোবিন্দ। প্রথমে তাই চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমার গৃহিণীটি ত সেই মেয়েরই মা; দু জনে মহা রণ বেধে গেল; গালাগালি বিদ্যায় কে কম বোঝা গেল না। তার পর আমি একটা বুদ্ধি স্থির করলাম। মেয়েকে বল্লাম, "তোমার যে টাকা আমি নিয়েছি তার জন্যে আমার ভদ্রাসন বাড়ী তোমাকে লেখা পড়া করে দিচ্চি।" বাড়ী লেখাপড়া করে দিলাম; মেয়ে শান্ত হল।

কৃষ্ণ। আপনার এ বন্দোবস্ত ভাল হয়েছে।

গোবিন্দ। আগে সকল কথা শুনুন্। তাহার পর ভালমন্দ

বিচার করবেন। যে দিন বাড়ী বিক্রীর কবলা খানা এনে মেয়ের হাতে দিলাম, তার সাতদিন পরে, প্রসন্ন দাসের ছেলে টেরি কেটে, লম্বা কোঁচা দুলিয়ে, চুরুট খেতে খেতে আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল। মনে হল, কালীঘাটের পাঁটার মত তাকে গুপ্ করে বলি দিয়ে ফেলি। কিন্তু হাতে তখন খাঁড়া ছিল না, আর তা থাকলেও এ হাতে খাঁড়া তোলবার শক্তি ছিল না। তাই ছোঁড়াটা বেঁচে গেল। আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে বল্লে, "মশায়, বাড়ীটা কবে ছেড়ে দেবেন ?" আমি ত অবাক! জিজ্ঞাসা করলাম, "বাড়ী তোমাকে ছেড়ে দিব কেন ?" সে অম্লান বদনে উত্তর করলে, "চারুশশী লেখাপড়া করে বাড়ী আমাকে দান করেছে!"—হায়! আকাশের ব্রজ্র! তোমার প্রহারও এত কঠিন নয়! মশায়, আফিমটা আমায় দি'ন, এ যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারি নে।

কৃষ্ণ। আপনি স্ত্রীকে নিয়ে, আমার বাড়ীতে এসে বাস করুন; আমরা যত্নে আপনার সেবা করব।

গোবিন্দলাল সমাজচ্যুত কৃষ্ণ চাটুর্য্যের বাটীতে আসিয়া সপরিবারে বাস করিলেন। এবং কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের বাটীতে বাস কালে, গোবিন্দলালের পত্নী অম্বিকার চিবুক ধরিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "মা, আমরা ত জানতাম না যে, তুমি মানুষ নও!"

কিন্তু কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় দেখিলেন যে, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কালীদহে বাস করা একান্ত অসম্ভব।—চারুশশীর নির্লজ্জতার আঘাত অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অতএব নাড়িচা গ্রামে

গদাধরের কর্ম্মচারিরূপে তাঁহাকে বাসস্থান দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া, তিনি উমাকালীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্র পাইয়া কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ জন্য উমাকালী গদাধরকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কিন্তু উমাকালী গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের কথা গদাধরকে বলিয়া যাইতে পারেন নাই।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

অম্বিকার ভাগ্যলিপি ফলিল।

ডাক্তারেরা কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়কে বলিয়া দিয়াছিলেন যে, চক্ষের উপকারের জন্য প্রত্যহ কিছুকাল তাঁহার জলপথে ভ্রমণ করা আবশ্যক। জল-বায়ুর শৈত্যে তাঁহার চক্ষের স্নিগ্ধতা সম্পাদন করিবে। তদনুযায়ী প্রত্যহ দিবাবসানকালে তিনি নৌকায় আরোহন করিয়া গঙ্গাবক্ষে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন। কখনও তাঁহার বাক্যালাপের সঙ্গিনীরূপে, তিনি জলভ্রমণ কালে প্রিয়তমা কন্যা অম্বিকাকে সঙ্গে লইতেন।

একদিন অম্বিকাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি জলভ্রমণ জন্য বাহির হইয়াছিলেন। পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সেই দিন প্রভাত পর্য্যন্ত অজস্র বৃষ্টিপাত হওয়ায়, বিকালে গঙ্গার জল অত্যন্ত কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল; কর্দ্দমাক্ত জলে মহাবেগে স্রোত বহিতেছিল। নৌকার পাটাতনের উপর বিস্তৃত ক্ষুদ্র গালিচায় পিতার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অম্বিকা জলের স্রোতোলীলা অবলোকন করিতেছিল। সে মানবজীবনের সহিত এই জল-স্রোতের উপমা মনোমধ্যে কল্পনা করিতেছিল। আমাদেরও জীবন পৃথিবীর ধূলি-কর্দ্দম সর্ব্বাঙ্গে অনুলেপন করিয়া, এই সমল জলরাশির ন্যায় মহামরণের দিকে এমনই তীব্রবেগে ছুটিয়াছে। সূর্য্যের তাপে

জলরাশি শুষ্ক হয়; তখন কর্দ্দমাদি ত্যাগ করিয়া, তাহা বাষ্পরূপে আকাশে উঠে; আমরাও বুঝি তপস্যার তাপে, পৃথিবীর ক্লেদ-ত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে পারি।

গঙ্গার চঞ্চল বিস্তৃত বক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে অম্বিকা সহসা চম্‌কাইয়া উঠিল। তাহার বোধ হইল, দূরে স্রোত মধ্যে জীবন সঙ্কটে পড়িয়া কে যেন হস্ত সঞ্চালন করিতেছে। বহুদিনের পূর্ব্বের কথা তাহার স্মরণ পথে উদিত হইল। তাহার গদাধর একদিন এমনই বিপদে পড়িয়াছিল। করুণায় তাহার সমস্ত হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠিল। সে তাহার পিতাকে বলিল, "বাবা, দূরে চেয়ে দেখ, কে যেন স্রোতের মধ্যে পড়ে' সাহায্য পাবার জন্যে হাত নাড়চে; ঐ দিকে শীগ্‌গির নৌকো চালিয়ে দিতে বল।"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের আদেশ পাইয়া নাবিকেরা প্রাণপণ শক্তিতে নৌকা চালনা করিল। তরী সঙ্কটাপন্নের অনুসন্ধানে তীরের ন্যায় ছুটিল।

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে ললাটে হস্তার্পণ করিয়া আপন মনে বলিতে লাগি-লেন, "আজ কি বার?—শনিবার। গদাধরের চিঠি পেয়েছিলাম সোমবারে। সে চিঠি সে রবিবারে লিখেছিল। লিখেছিল যে পরদিন সে নাড়িচায় পৌঁছবে। তা হলে, সে সোমবারেই নাড়িচা এসেছিল। পাঁচ দিন নাড়িচায় থেকে আজ শনিবারে তার কল-কাতা ফেরবার কথা। সর্ব্বনাশ! বুঝি বা তারই কোন বিপদ্ ঘটলো।"

কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় দাঁড়াইয়া উঠিলেন। নাবিকগণকে

সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "চালাও; চালাও, আরও জোরে নৌকা চালাও; আজ গদাধরের কলকাতা ফেরবার কথা ছিল, বুঝিবা তারই কোনও বিপদ্ ঘটেছে। জানি না, বুঝি তারই বিপদ্ আশঙ্কায় আমার প্রাণটা আজ এত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

পিতার বাক্য শুনিয়া, অম্বিকার প্রাণ ওষ্ঠে আসিল। সে বুঝিতে পারিল না, কি একটা মহাভাবে তাহার হৃদয় বিহ্বল হইয়া পড়িল। এক দিকে গদাধরের বিপদ্ অনুমান করিয়া হৃদয় মধ্যে মহা অবসন্নতার স্রোত বহিতেছিল; অন্যদিকে গদাধরের জীবনোদ্ধার করিবার সম্ভাবনায় একটা মহা উৎসাহের স্রোত প্রবাহিত হইতেছিল। দুইটা বিভিন্ন ভাব-তরঙ্গের মধ্যে তাহার হৃদয়টা, বাত্যান্দোলিত অতসীপুষ্পের ন্যায় দুলিতেছিল। ইহাতে তাহাকে নিতান্ত কাতর করিয়া তুলিল।

তাহার হৃদয়ের সমস্ত কাতরতা, তাহার বিশাল এবং করুণ চক্ষু দুইটির মধ্যে নিহিত করিয়া, সে নির্নিমেষ লোচনে জল-প্রবাহ মধ্যে পূর্ব্বদৃষ্ট স্থানের দিকে চাহিয়া ছিল। প্রতি মূহূর্ত্তে নৌকাখানি সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। জয় জনার্দ্দন! তোমার কৃপায় আর কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার গদাধরের জীবন রক্ষা হইবে।

কিন্তু, না। নৌকা নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতে, যে দ্রব্যটা জলের উপর সঞ্চালিত হইতেছিল, তাহা স্রোতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। মাঝিগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। কহিল, "আর উপায়

নেই, স্রোত খুব বেশী। এ স্রোতের মধ্যে আর তার সন্ধান পাওয়া যাঁবে না।"

মাঝিদিগের কথা শুনিয়া কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের হৃদয়স্পন্দন থামিয়া গেল। তিনি ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন, "অম্বিকা ?"

তাঁহার আহ্বান অম্বিকার কর্ণে প্রবেশ করিবার আগে, অম্বিকা জলে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল। অম্বিকার সন্তরণ-পটুতা সম্বন্ধে অপরিজ্ঞাত থাকিয়া, নাবিকগণ ভীতিবিচলিত হৃদয়ে তাহাকে ধরিবার জন্য উদ্যত হইলে, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন; কহিলেন, "আমার মেয়ে খুব ভাল রকম সাঁতার শিখেছে; তোমাদের কোনও চিন্তা নেই। তবু তোমরা নৌকোটা ওর কাছাকাছি রেখ।" নাবিকেরা তাহাই করিল।

যেস্থানে গদাধর নিমজ্জিত হইয়াছিল বলিয়া সে অনুমান করিয়াছিল, অতি দ্রুত বেগে সেই স্থানে আগতা হইয়া, অম্বিকা তাহার প্রাণাধিক প্রাণের অনুসন্ধান জন্য জল মধ্যে প্রবেশ করিল। জলমধ্যে কোথাও তাহার অনুসন্ধান না পাইয়া, নিঃশ্বাস গ্রহণ জন্য সে জলের বাহিরে মাথা তুলিল। একটা বৃহদাকার কাষ্ঠ খণ্ড প্রবল স্রোতোবেগে ঋজুভাবে ভাসিয়া আসিতেছিল। অম্বিকা জলের বাহিরে মস্তক উত্তোলন করিবা মাত্র, তাহা সেই বৃহৎ কাষ্ঠের একপ্রান্ত দ্বারা প্রচণ্ড বেগে প্রহৃত হইল। মস্তকে নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, অম্বিকার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। স্বর্ণকমল জন্মের মত জলে ডুবিল। বিধাতার লিখিত ভাগ্যলিপি সত্য হইল।

বৃদ্ধ মহাজ্ঞানী কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় আপন বিরল পক্ককেশরাশি সবলে মুষ্টি মধ্যে গ্রহণ করিয়া, হাহাকার রবে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। নাবিকেরা নৌকা লইয়া, রজ্জু লইয়া, জলে নামিয়া, ডুবিয়া, নানারূপে অনুসন্ধান করিল, কিন্তু পঙ্কিল জল মধ্যে সে পঙ্কজিনীর আর দেখা পাওয়া গেল না। গঙ্গার তরল তরঙ্গিত অঞ্চল মধ্যে, সে কোথায় লুকাইল কে জানে? তুমি গঙ্গা! তুমি কত পূজার পুষ্প আপন বক্ষে গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু আজ যে পুষ্পটি তোমার বক্ষে স্থান লাভ করিল তাহা অতি পবিত্র, অপার্থিব।

অষ্টাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

গদাধরের কলিকাতা প্রত্যাগমন।

নাড়িচা হইতে পাঁচদিন পরে, গদাধরের কলিকাতা ফিরিবার কথা ছিল। কিন্তু তাহা ঘটে নাই। তাহার চক্রবর্ত্তী কাকার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধা করিয়া, তাহার কলিকাতা ফিরিতে অনেক বিলম্ব ঘটিয়াছিল। কলিকাতা প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে তাহার কালীদহে যাওয়া হয় নাই।

যত দিন সে নাড়িচাতে ছিল, ততদিন প্রায় প্রত্যহ সে কলিকাতা হইতে পত্র পাইত। সে পত্রগুলা মানদা লিখিত না; মুলীর উপদেশমত সরকার পত্র লিখিত। যে দিন গদাধর কলিকাতা ফিরিল, তাহার পূর্ব্বে তিন দিন সে কলিকাতা হইতে কোনও সংবাদ পায় নাই। এজন্য তাহার মন কিছু উদ্বিগ্ন ছিল। কাহারও কি পীড়া হইয়াছে?—সেই সংবাদ গোপন করিবার জন্য বুঝি সরকার তাহাকে কোনও পত্র লিখে নাই;—বেচারা ভাল মানুষ তাহাকে অপ্রিয় সংবাদ দিয়া আকারণ উদ্বিগ্ন করিতে বুঝি ইচ্ছা করে না? আচ্ছা, মানদা গদাধরকে একখানিও পত্র লিখিল না কেন? গদাধর কত পত্র লিখিল; কত স্নেহপূর্ণ, আদর-মাখা পত্র লিখিল; মানদা তাহার একখানিরও উত্তর দিল না; কেন? বুঝি মানদা পীড়ায় শয্যাগতা আছে, তাই তাহাকে স্বহস্তে পত্র

লিখিতে পারে নাই। অথবা খোকার কোনও পীড়া হইয়াছে; পুত্রের পীড়ায় বিব্রত হইয়া, সে পত্র লিখনের সুযোগ পায় নাই।

গদাধর অত্যন্ত চিন্তিত মনে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সে অনুসন্ধান পূর্ব্বক মানদার সন্ধান পাইল। মানদা শিথিলবেশে এক শয্যার উপর শুইয়া, একখানা নবপ্রকাশিত নাটক মনোযোগসহকারে পাঠ করিতেছিল। গদাধরকে আগত দেখিয়া, সে হাই তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি আজই আসবার কথা ছিল?"

গদাধর। হ্যাঁ;—আমি ত চিঠি লিখে, সে কথা জানিয়েছিলাম। তুমি কি আমার চিঠি পাও নি?

মানদা। পাব না কেন? ঐ দেখ, তোমার সমস্ত চিঠি টেবিলের উপর জড় করে রেখেছি। তুমি কত কথা লেখ; অত কথা কি আমি পড়ে উঠতে পারি?—আর, তোমার হাতের লেখা যে টানা!

গদাধর। তুমি বিছানায় শুয়ে রয়েছ কেন?—কোনও অসুখ করেনি ত?

মানদা। অসুখ করবে কেন? কাল রাত্রে জ্ঞানদা বাবুর বৌমার সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম; তাই আজ দু'পর বেলা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

গদাধর। খোকা—

মানদা। বেশ থিয়েটার;—তুমি এক দিন দেখতে যেও;—

নূতন পালা হয়েছে। এই দেখ, আমি একখানা বই কিনে এনেছি।

গদাধর। খোকা—

মানদা। পয়সা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম। জ্ঞানদা বাবুর বৌমার কাছে এক টাকা ধার করে' এই বইখানা কিন্‌লাম। আজ টাকাটা পাঠিয়ে দিতে হবে।

গদাধর। খোকা—

মানদা। খোকাকে নিয়ে যাই নি। অনেক দিন আগে একবার থিয়েটার দেখতে গিয়েছিলাম। সেবার তুমি আমাকে নিয়ে গিয়েছিলে। তা, আমার পাশে এক মাগী এক-গা গহনা পরে' আর একটা ছেলে কোলে করে বসে ছিল। এমন বদ্ ছেলে দেখিনি। থিয়েটার আরম্ভ হবামাত্র কান্না জুড়ে দিলে। নীচের বাবুরা ছেলের চীৎকারের জন্যে বড় বিরক্ত হয়ে উঠল। নীচে থেকে ধমক দিয়ে বল্লে "ছেলে থামা, মাগী, ছেলে থামা।" আমার বড় লজ্জা হল। সেই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করলাম, ছেলে নিয়ে কখনও থিয়েটার দেখতে আসব না। আমরাই মেয়েমানুষ, আমাদেরই ভাগ্যে থিয়েটার দেখা ঘটে না ;—ওদের ভাবনা কি। পুরুষজন্ম গ্রহণ করেছে, বড় হয়ে কত থিয়েটার দেখবে।

গদাধর। খোকা কোথায়? বেড়াতে গেছে?

মানদা। না, নুলী ক'দিন তাকে বেড়াতে পাঠায় নি।

গদাধর। কেন?

মানদা। তার জ্বর হয়েছে।

গদাধর। খোকার জ্বর হয়েছে? সে কোথায়?

মানদা। কি জানি?—বোধ হয় বারান্দায় মুলীর কাছে শুয়ে আছে।

গদাধর। তাকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এস। কোনও ডাক্তার ডাকিয়েছিলে?

মানদা। তিন দিন জ্বর না ছাড়ায়, আজ মুলী ডাক্তার ডাকবার কথা সরকারকে বলেছিল। সরকার বলেছে, ডাক্তার সন্ধ্যার সময় আসবে।

গদাধর। ডাক্তারের ব্যবস্থা আমি করছি। তুমি তাকে এখানে নিয়ে এস।

মানদা। আমি এখন উঠতে পারিনে। তুমি যাও; বারান্দায় গেলেই তাকে দেখতে পাবে।

গদাধর ত্বরিতপদে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় একখানা গাত্রবসনে আবৃত হইয়া, একটি ক্ষুদ্র উপাধানে ঠেশ দিয়া, মুলীর নিকট খোকা নীরবে বসিয়া ছিল। মুলী আপন পদদ্বয় সম্প্রসারিত করিয়া, একখানা থালাতে কতকগুলি ডাল লইয়া, বিচারকের ন্যায় গম্ভীর মুখে, তাহার মধ্য হইতে এক একটি আবর্জ্জনা-কণা নখাগ্রে ধারণ করিয়া, গৃহতলে নিক্ষেপ করিতেছিল। গদাধরের মুদ্গরাঘাত তুল্য পদশব্দ শ্রবণ করিয়া, মুলী সচকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিস্তৃত পা দু'টি সঙ্কুচিত করিয়া লইল। খোকা চক্ষু উন্মীলন করিয়া বহুদিন পরে তাহার পিতাকে দেখিয়া ম্লান অধরে ক্ষীণ হাসি হাসিয়া ডাকিল, "বাবা!"

গদাধর তাহাকে আপন বাহুমধ্যে তুলিয়া লইল। আপন

স্নেহ-প্লাবিত বক্ষে আদরে তাহাকে লুকাইয়া রাখিল। তাহার জ্বরতপ্ত ললাটতল আগ্রহভরে চুম্বন করিল। এবং অবশেষে তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া মানদার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

কি জানি কেন, গদাধরের স্নেহপূর্ণ ক্রোড়ে বসিয়া খোকার চক্ষে জল আসিল। বুঝি সে জলধারা নীরব ভাষায় গদাধরকে হৃদয়ের অভিমানের কথা জানাইয়া দিল। বুঝি তাহা বলিয়া দিল, "বাবা, তোমার অনুপস্থিত কালে আমাকে কেহ আদর করে নাই।"

খোকার চোখে জল দেখিয়া, গদাধর অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। উত্তরীয়াঞ্চলে সযত্নে তাহার চক্ষুর জল মুছিয়া কহিল, "ছি খোকা! কেঁদ না। আমি তোমার অসুখ শীগ্‌গির ভাল করে দেবো।"

খোকা আরও কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবা! মা আমাকে মেরেছিল।"

গদাধর বলিল, "এবার মারলে, হাত কেটে দেবো! কেন, মানদা? কেন তুমি আমার খোকাকে মেরেছিলে?"

মানদা খোকাকে আপন ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া বলিল, "তুমি যে দুষ্টুমি কর, তাই ত তোমাকে মারি। সেদিন সমস্ত দু'পর বেলা জলের চৌবাচ্ছাতে বসে ছিলে কেন? তাতেই ত তোমার জ্বর হল। তুমি দুষ্টুমী না করলে, তোমাকে আর মারব না।"

গদাধর বুঝিল, তাহার অনুপস্থিত কালে জলের চৌবাচ্ছাতে বসিয়া, মার খাইয়া খোকার জ্বর হইয়াছে। হায় হায়! মানদার

কি কোনও কালে কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মিবে না? আপনার গর্ভের সন্তান, তাহার প্রতি যত্ন করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহা কি সে কখনও বুঝিবে না?

আপনার গর্ভের সন্তানকে যে যত্ন করা উচিত, তাহা মানদা বুঝিত। কিন্তু তাহার জন্য সে আপনি কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে ইচ্ছা করিত না। তোমরা ত জান, সে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসিত। সে খোকাকে ভালবাসিত, এবং আমাদের মনে হয়, বুঝি সে গদাধরকেও একটু ভালবাসিত; কিন্তু সে আপনাকে যত ভালবাসিত তত ভালবাসা আর কাহাকেও বাসিত না।—নুলীকেও নহে!

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

ডাক্তার এমার্সন।

গদাধর অনেক দিন কালীদহ হইতে কোনও সংবাদ প্রাপ্ত হয় নাই। অম্বিকার মৃত্যুর পর, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় আর কাহাকেও পত্র লিখিতেন না। রত্নেশ্বর বাবু জমীদার লোক,—তাঁহার জমীদারী চাল—ঘন ঘন পত্র আদান-প্রদানের প্রথা তাঁহার সেরেস্তায় প্রচলিত ছিল না। গদাধর নিজেও খোকার পীড়া লইয়া বড় বিব্রত হইয়া ছিল; এজন্য পত্র লিখিয়া কালীদহের সংবাদ সংগ্রহ করিবার অবসর তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। সুতরাং অম্বিকার শোচনীয় পরিণামের কথা তাহার কর্ণগোচর হয় নাই।

তথাপি এক একবার অম্বিকার জন্য তাহার হৃদয়টা ব্যাকুল হইয়া উঠিত। আমরা শুনিয়াছি, দূরদেশে অত্যন্ত প্রিয়তমের অমঙ্গল ঘটিলে; আমাদের হৃদয়, কি এক অচিন্ত্য নৈসর্গিক বিধান অনুযায়ী তাহার সংবাদ অনুভব করিয়া ব্যথিত হইয়া উঠে। গদাধরের মনে হইত, অম্বিকা যেন তাহার হৃদয়ের কতকটা অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। সে অম্বিকার সংবাদ লইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিল।

কিন্তু খোকার রোগ শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিয়া সে কোথাও যাইতে পারিত না। তাহার শয্যাপার্শ্ব ছাড়িয়া তাহার একখানা পত্র

লিখিবারও প্রবৃত্তি হইত না। সে মনে করিত, দুই এক দিনের মধ্যে খোকা আরোগ্য হইলে, সে পত্র লিখিবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, কলিকাতার যাবতীয় ডাক্তার আসিয়া তাহাকে দেখিল, তথাপি খোকা এ যাবৎ আরোগ্য হইতে পারিল না। গদাধর ডাক্তারগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনারা কি আমার ছেলেকে ভাল করতে পারবেন না?"

একজন ডাক্তার কহিলেন, "আজ কেটে না গেলে আমরা কিছুই ঠিক করতে পারব না। আমার বিবেচনায়, আজ ডাক্তার এমার্সন এসে যদি এখানে রাত্রে থাকেন, তা হলে বিশেষ ভাল হয়।"

গদাধর কহিল, "আপনাদের যা ভাল বিবেচনা হয়, তা করতে হবে। আপনি ডাক্তার এমার্সনের কাছে গিয়ে এ বিষয়ের ব্যবস্থা করুন।"

ডাক্তার কহিলেন, "আমি তাঁকে আজ এখানে রাত্রে থাকবার কথা বলেছিলাম, তিনি রাজি হ'ন নি। আমার মনে হয়, আপনি নিজে যদি তাঁর বাড়ীতে গিয়ে, একবার অনুরোধ করেন, তা হলে তিনি 'না' বলতে পারবেন না।"

গদাধর বলিল, "ভাল, আমিই যাব, যে উপায়ে পারি তাঁকে সম্মত করতেই হবে।"

খোকার শয্যাপার্শ্ব ছাড়িয়া, দিবাবসানকালে, গদাধর ডাঃ এমার্সনকে রাত্রিবাসের জন্য আহ্বান করিতে তাঁহার বাটীতে

গমন করিল। যাইবার পূর্ব্বে সে মানদাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিল যে, সে যেন গদাধরের প্রত্যাগমনকাল পর্য্যন্ত খোকাকে ছাড়িয়া একদণ্ডের জন্যও স্থানান্তরে গমন না করে। মানদা বলিয়াছিল যে, সে কোথাও যাইবে না, গদাধর নিশ্চিন্তমনে ডাক্তারের বাটীতে যাইতে পারে।

ডাঃ এমার্সনের বাটীতে যাইয়া গদাধর শুনিল যে, ডাক্তার সাহেব বাটীতে উপস্থিত নাই; তাঁহার চিকিৎসাধীন অন্য কোন পীড়িতকে দেখিবার জন্য স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন; বোধ হয় অল্পকাল মধ্যে প্রত্যাগমন করিবেন। ডাক্তার সাহেবের বেহারা আসিয়া গদাধরকে লইয়া বসিবার ঘরে বসাইল। বলিল, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন; সন্ধ্যা হয়েছে, তিনি এখনই বাড়ী ফিরবেন।"

অগত্যা ডাক্তার সাহেবের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় গদাধর নীরবে ডাক্তার সাহেবের নির্জ্জন কামরায় বসিয়া রহিল। বাহিরে বাগানে, ঝিঁঝিঁ পোকারা সান্ধ্য-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতেছিল। গদাধর বসিয়া বসিয়া তাহা শুনিতে লাগিল। বাতায়ন-পথে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দেখিল, আকাশে তারাগণ ফুটিয়া উঠিয়াছে; দেববালারা স্বর্গদ্বারে বুঝি অসংখ্য সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়া দিয়াছেন। ডাক্তার সাহেবের বাগানে টবের উপর বসিয়া ফ্লক্স, পিঙ্ক, কার্নেসন্, ডেজি প্রভৃতি মরসুমী পুষ্পগুলি গ্যাসের আলোকে মধুর হাস্য করিতেছে। পুষ্পময়ী, আলোকময়ী, সঙ্গীতময়ী কি সুন্দর সন্ধ্যা!—কিন্তু গদাধরের ব্যাকুল হৃদয়ে কোন সৌন্দর্য্যই স্পর্শ

করিল না। সে বসিয়া বসিয়া খোকার বিশুষ্ক মুখখানি ভাবিতে-ছিল। খোকাকে কি সে আরোগ্য করিতে পারিবে না?

দেখিতে দেখিতে এক ঘণ্টা কাল অতীত হইয়া গেল, ডাক্তার সাহেব ত এখনও বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন না! গদাধর চিন্তিত হইল। মনে করিল, "একবার বাড়ী যাই; আবার আসব।" আবার ভাবিল, "না, একটু অপেক্ষা করি, ডাক্তার সাহেব হয়ত এখনই আসবেন। যদি চলে যাই, আর ডাক্তার সাহেব যদি আমার অনুপস্থিত সময় মধ্যে এসে, আবার অন্য কারুর চিকিৎসার জন্যে অন্যত্র চলিয়া যান, তা হলে আবার অনেক দেরী হবে, তার চেয়ে তাঁর অপেক্ষায় আর একটু বসে থাকি। খোকা মানদার পাশে বেশ শুয়ে আছে; আমার ভাবনা কি?—আমি আর একটু অপেক্ষা করি।"

এইরূপে আর একটি ঘণ্টা অতিবাহিত হইল। ডাক্তার সাহে-বের খানাকামরার ঘড়িতে আটটা বাজিল। গদাধর অস্থির হইয়া উঠিল;—আর ত সে থাকিতে পারে না। মানদা হয় ত খোকার পার্শ্ব হইতে উঠিয়া গিয়াছে। খোকা হয় ত একাকী ভয় পাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে তাহাকে "বাবা, বাবা" বলিয়া ডাকিতেছে। আচ্ছা! আজ ডাক্তারেরা এমার্সন সাহেবকে রাত্রে বাটীতে রাখিবার জন্য বলিলেন কেন? অন্যদিন ত তাঁহারা এরূপ বলেন নাই। আজ রাত্রে ডাক্তারেরা খোকার কি কোন বিপদ্ আশঙ্কা করিয়াছেন? গদাধরের হৃৎপিণ্ডটা তাহার কণ্ঠাবরোধ করিয়া দিবার উপক্রম

করিল। সে বাটী ফিরিবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

বেহারা আসিয়া বলিল, "বাবু, আপনি যদি এতক্ষণ অপেক্ষা করেছেন, তবে আর দু মিনিট অপেক্ষা করুন; সাহেবের খাবার সময় হয়েছে, এখনই বাড়ী ফিরবেন।" বেহারা সত্য অনুমান করিয়াছিল। দুই চারি মিনিটের মধ্যে সাহেবের গাড়ী আসিয়া গাড়ীবারান্দায় দণ্ডায়মান হইল।

ব্রুহাম হইতে অবতরণ করিয়া, গদাধরকে দেখিয়া, ডাঃ এমার্সন কহিলেন, "আপনি একটু অপেক্ষা করুন; আমি অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধিত হইয়াছি; আহারাদি করিয়া আপনার সহিত কথা কহিব।" গদাধর প্রাণ হাতে করিয়া রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিল।

নয়টার পর, ডাক্তার সাহেব আসিয়া, গদাধরের সহিত কথা কহিলেন। গদাধরের অনুনয় শুনিয়া তিনি বলিলেন, "বেশ, আমি আপনার বাটী যাইয়া রাত্রিযাপন করিব। আমি এখনই প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি, আপনার গাড়ীতেই যাইব।"

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় গদাধর ডাক্তার সাহেবকে লইয়া বাটী ফিরিল।

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

খোকার পিপাসা।

ডাক্তার এমার্সনকে আহ্বান করিবার জন্য গদাধর বাটীর বাহির হইলে, গদাধরের বাটীতে জ্ঞানদা বাবুর স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ দিবাবসানকালে খোকাকে দেখিতে আসিতেন।

আজ জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে একটা উৎসব ছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে আজ তাঁহার বাটীতে যাত্রার অভিনয় হইবে। গদাধরের পুত্রের পীড়া দেখিয়া, এ বিবাহটা তৎকালে স্থগিত করিবার জন্য, জ্ঞানদা বাবু একান্ত ইচ্ছুক ছিলেন। যে উৎসবে গদাধর যোগদান করিতে পারিবে না, তাহাতে তাঁহার আনন্দ ছিল না। কিন্তু কন্যাপক্ষ বড় জেদ করিয়া ধরিলেন। বলিলেন, "কন্যা বয়স্থা হয়েছে; আর বিলম্ব করলে জাত থাকবে না।" কাযেই অপ্রসন্ন মনে জ্ঞানদা বাবু বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। স্থির করিলেন যে, অভিনয় প্রভৃতি কিছুই হইবে না। কিন্তু তাঁহার এক পরমাত্মীয়া আসিয়া বলিলেন, "এ হতে পারে না। এতে ছেলের মনে চিরদিন ক্ষোভ থেকে যাবে। ওর ভাইয়েদের গায়ে হলুদ উপলক্ষে যাত্রা হয়েছিল; ওর গায়ে হলুদেও যাত্রা হওয়া চাই।" অতএব সেই

দিন সন্ধ্যাকালে জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে যাত্রা অভিনয়ের উদ্যোগ হইতেছিল। বাহির-বাটীতে আসর সজ্জা করিবার জন্য, এবং অন্দরমহলে শীঘ্র ভোজনকার্য্য সমাধা জন্য বাটীর প্রত্যেক লোক অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। গৃহিণীর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। তথাপি সে দিনও তিনি গদাধরকে ভুলেন নাই। তাহার পীড়িত পুত্রকে দেখিবার জন্য সমস্ত উৎসব ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের বাটীতে আসিয়াছিলেন।

গদাধরের নির্দ্দেশমত, জ্ঞানদাবাবুর গৃহিণীকে মানদা 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিত। তাঁহাকে সমাগতা দেখিয়া, মানদা জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আপনাদের বাড়ীতে আজ নাকি যাত্রা হবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "হ্যাঁ মা, আজ আমাদের বাড়ীতে যাত্রা হবে। তোমার খোকার অসুখ, এজন্যে তোমাকে নিয়ে যেতে গাড়ী পাঠাই নি। খোকা ভাল হোক, আবার যাত্রা দিয়ে তোমাদের নিয়ে যাব।"

মানদা কহিল, "খোকা অনেক ভাল আছে। বাবু বাড়ীতে ফিরে এলে, আমি আমাদের গাড়ীতেই গিয়ে একবার দেখে আসব। কিসের পালা হবে?"

গৃহিণী উত্তর করিলেন, "অভিমন্যুবধ।—বেশ পালা। তা, খোকা ভাল থাকলে, গদাধরকে বলে' তুমি একবার গিয়ে দেখে আসতে পার।"

মুলী নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল; সে বলিল, "অভিমন্যু-বধ বড়

চমৎকার পালা ;—সপ্তরথীর যুদ্ধ আছে ; সখীদের নাচ গান আছে, আরও কত কি আছে,—বড় চমৎকার ! আমি একবার ন'পাড়ার বাবুদের বাড়ীতে দেখতে গিয়েছিলাম ।”

মানদা বলিল, “আমি যাব ;—তুই আমার কাপড় চোপড় ঠিক করে' রাখ্ ।”

খোকাকে দেখিয়া, জ্ঞানদা বাবুর গৃহিণী চলিয়া যাইলে, মানদা বেশবিন্যাস করিতে বসিল। কমনীয় কৌষেয় বসনে, বিদ্যুৎপ্রভ রত্নাভরণে, মনঃসম্মোহনকারী গন্ধানুলেপনে সে আপনার পরিমার্জ্জিত এবং পরিণত বরদেহ শারদীয়া দেবীপ্রতিমার ন্যায় সুসজ্জিত করিয়া, দিক্‌সকলকে চমকিত করিয়া দিল। অলঙ্কার-নিবদ্ধ সুদর্শন মণিমালা দিগ্‌দিকে নক্ষত্রের ন্যায় দীপ্তি উদ্গীরণ করিল। গদাধরের গৃহমধ্যে তড়িল্লীলাতুল্য ঔজ্জ্বল্যের তরঙ্গ উঠিল।

মাতার এ বেশ দেখিয়া খোকা বলিল, “মা, তুমি কোথায় যাবে ? আমিও তোমার সঙ্গে যাব।”

মানদা বলিল, “তোমার অসুখ সারুক ;—তোমাকেও ভাল ভাল পোষাক পরিয়ে যাত্রা শুনতে নিয়ে যাব !”

খোকা আর কিছু বলিল না, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, পার্শ্ব ফিরিয়া, শয়ন করিল।

অন্তঃপুরের দ্বারের নিকট, কালো ঘোড়ার জুড়ি-পাল্কীগাড়ী মানদার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু গদাধর প্রত্যাগমন না করিলে এবং তাহার অনুমতি না পাইলে মানদা যাইতে পারে না।

ও হরি! তবে কি মানদা গদাধরকে ভয় করিত? না, মানদা গদাধরকে ভয় করিত না।—কিন্তু মানদার অকর্ম্মণ্যতা গদাধরের কার্য্যতৎপরতাকে ভয় করিত। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম।—আলস্য চিরদিন কর্ত্তব্যের মহিমাতলে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে। মানদা গদাধরকে ভয় না করিলেও, তাহার অনুমতি না লইয়া, সহসা যাইতে পারিল না।

নুলী তাহাকে উৎসাহ প্রদান করিল। বলিল, "জামাইবাবু এখনই ফিরে আসবে; তোমার ভাবনা নেই। চল, ক্ষান্ত ঝিকে খোকার কাছে বসিয়ে আমরা যাই। আট্‌টা বাজতে চল্ল; এতক্ষণ বোধ হয় যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেছে। এর পর, আমরা আর বসবার জায়গা পাব না।"

অতএব নুলীকে লইয়া, মানদা যাত্রা শুনিবার জন্য জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে প্রস্থান করিল। ক্ষান্ত ঝি আসিয়া খোকার কাছে বসিল। খোকা ঝির দিকে না ফিরিয়া, বালিশে মুখ লুকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঝি, মা চলে গেছে?" ঝি বলিল, "হ্যাঁ।"

কিয়ৎকাল পরে খোকা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "ঝি, বাবা কোথায়?" শিশুকণ্ঠের কি কাতর ধ্বনি!—বলিয়াছি, ডাক্তার সাহেবের বসিবার ঘরে বসিয়া, ঠিক আট্‌টার সময় গদাধরের মন কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।—খোকা যখন বলিল, "ঝি, বাবা কোথায়?"—তখনও ঠিক আট্‌টা বাজিয়াছিল। তবে কি খোকার কাতর আহ্বান গদাধর শুনিতে পাইয়াছিল? মনস্তত্ত্বজ্ঞ মহাপণ্ডিতগণও এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কখনও সমর্থ হইবেন না। এ প্রশ্ন

চিরদিনই প্রশ্ন থাকিবে। খোকার কথা শুনিয়া ঝি বলিল, "বাবা ডাক্তার ডাকতে গেছেন, এখনই ফিরে আসবেন।"

কিছুক্ষণের জন্য খোকা মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। তাহার পর আবার ডাকিল, "ঝি!"

"কেন?"

"আমার তেষ্টা পেয়েছে; তুমি আমাকে জল এনে দাও!"

ঝি জল আনিয়া দিল। খোকা বলিল, "আমি উঠতে পারিনে; তুমি আমার মুখে ঢেলে দাও।"

ঝি খোকার মুখে জল ঢালিয়া দিল। কিন্তু বেশীর ভাগ জল বিছানায় পড়িল।

খোকা বলিল, "ঝি, বিছানা ভিজে গেছে।"

ঝি বিছানায় হাত দিয়া কহিল, "ও একটুখানি ভিজেছে; আপনি শুকিয়ে যাবে।"

খোকা জলসিক্ত শয্যার উপর পড়িয়া রহিল।

খোকা ঝিকে আবার ডাকিল। কহিল, "ঝি, আবার আমার তেষ্টা পেয়েছে, তুমি আমাকে আরও একটু জল দাও।"

ঝি বলিল, "বারবার জল খাওয়া হবে না। অসুখ করবে। গরম দুধ এনে দিচ্চি, খাও।"

ঝি দুধ আনিবার জন্য চলিয়া গেল। খোকা একাকী সেই সিক্ত বিছানার উপর পড়িয়া রহিল। চক্ষু মেলিয়া, গৃহভিত্তিসকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বড় ভীত হইল। সভয়ে ডাকিল, "ঝি।"

ঝি দুগ্ধ আনয়ন জন্য রান্নাবাড়ীতে গিয়াছিল; তথায় উনানের পার্শ্বে বসিয়া, বামুন ঠাকুরের নিকট মুলীর নিন্দা করিতেছিল। সে খোকার ক্ষীণ আহ্বান শুনিল না।

খোকা আবার ডাকিল, "ঝি! ও ঝি। আমার বড় ভয় করছে।—আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে!"—বামুন ঠাকুরের সরস ভাষায় ঝির কর্ণ তখন ভরিয়া গিয়াছিল। সে কর্ণে খোকার ক্ষীণ আহ্বান পৌঁছিল না।

বড় ভয়! বড় তৃষ্ণা!—শিশু অস্থির হইয়া উঠিল। যদি তাহার উত্থানশক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে উঠিয়া কুঁজা হইতে আপনি জল লইয়া পান করিত; বারান্দার বাহির হইয়া ঝিকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিত। তাহার সে শক্তি ছিল না। তথাপি সে অতিকষ্টে বিছানা হইতে নামিতে চেষ্টা করিল। চেষ্টা করিতে গিয়া খট্টা হইতে মর্ম্মরমণ্ডিত গৃহতলে পড়িয়া মস্তকে আহত হইল। পিপাসা-কাতর শিশুর সে দিকে লক্ষ্য ছিলনা। সে হস্ত-পদের সাহায্যে কোন ক্রমে জলের কুঁজার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ক্রমে তাহার ক্ষীণ হস্তপদ বিজড়িত হইয়া আসিল। তাহার মস্তকে চেতনা বিলুপ্ত হইল।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

স্ত্রীপুত্রহীন।

ডাক্তার এমার্সনকে সঙ্গে লইয়া গদাধর বাটী ফিরিয়া, সমভিব্যাহারী বেহারাকে ডাক্তার সাহেবের শয়নঘর দেখাইয়া দিল। সে ডাক্তার সাহেবের শয্যা-বসন গুছাইয়া রাখিল। ডাক্তার সাহেব বসিবার ঘরে বসিয়া চুরুট ধরাইয়া ধূমপানে মনোনিবেশ করিলেন। গদাধর দ্বিতলে উঠিয়া, অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল।

কক্ষের পর কক্ষ গ্যাসার আলোকে আলোকিত হইয়া, নীরবে হাসিতেছিল। তাহারা গদাধরের ভাগ্যকে নীরবে বিদ্রূপ করিতেছিল। বাতায়নপথে নিশীথ বায়ু প্রবেশ লাভ করিয়া নীরব কক্ষসকল মধ্যে দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের শব্দ করিতেছিল। গৃহসামগ্রী সকলের কৃষ্ণচ্ছায়া যেন যমদূতগণের কৃষ্ণ পক্ষের ন্যায় গৃহতলে বিস্তৃত ছিল। নীরব, নির্জ্জন কক্ষসকল দেখিয়া গদাধরের বক্ষঃ কম্পিত হইয়া উঠিল। সে ক্ষীণ বিকম্পিত কণ্ঠে, করুণস্বরে ডাকিল,—"মানদা।" হায়! তাহার এ আহ্বানে কে উত্তর দিবে?

মানদা তখন জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। সে কি এখনও যাত্রা শুনিতেছিল? না। অভিমন্যুর মৃত্যুসংবাদ

শুনিয়া গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন যখন স্কন্ধবিলম্বিত শরাসন দূরে নিক্ষেপ করিয়া হাহাকার রবে চীৎকার করিয়া উঠিল, তখন কি জানি কেন, মানদার চিত্তে একটা মহাবিষাদ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। আপনার খোকার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। আর তাহার যাত্রা শুনিবার আকাঙ্ক্ষা রহিল না। সে উঠিয়া, নুলীকে ডাকিয়া বলিল, "নুলী, আর আমি যাত্রা শুনব না, তুই গাড়ী আনতে বল্; আমি বাড়ী যাব।"

নুলী বলিল, "আর একটু থাক, জয়দ্রথবধের আর দেরী নেই; আমরা জয়দ্রথবধ দেখে বাড়ী যাব।"

অগত্যা মানদা আপনার পূর্ব্ব বসিবার স্থানে ফিরিয়া আসিতেছিল। অভিনয়ঃদর্শনাভিলাষিণী উপবিষ্টা সীমন্তিনীগণ, অভিনয়দর্শনে ক্ষান্ত হইয়া, মুগ্ধনেত্রে কম্পাকবিকম্পিত সচল দীপ-শিখার ন্যায় তাহার বহু রত্নালঙ্কার বিভূষিত গমনশীল বরদেহ অবলোকন করিতেছিল। অচঞ্চল চপলার ন্যায়, নব সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত নবীন ক্ষীরদ্রুমের ন্যায়, ফুল্ল প্রসূন-প্রফুল্লা লতা-প্রতানিনীর ন্যায়, রত্নমণ্ডিতা মানদা—মরি মরি! কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল! অলঙ্কারপ্রিয় নারীসমাজ মধ্যে সে কি মহা উন্মাদনার অবতারণা করিয়াছিল! তাহারা অর্জ্জুনকে ভুলিয়া, অভিমন্যুকে ভুলিয়া এবং নারাচ-খড়্গ-ভল্ল-গদা-বিভূষিত সপ্ত-রথীকে ভুলিয়া অবাক্ হইয়া মানদার প্রতি আপনাদিগের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল।

সহসা মহিলামণ্ডলী বিচলিত হইয়া উঠিল। কেরোসিন-

তৈলপূর্ণ একটি প্রদীপ্ত আলোকাধার মানদার বিলুণ্ঠিত সুবর্ণাঞ্চলে বিজড়িত হইয়া হর্ম্ম্যতলে পতিত হইয়া বিচূর্ণ হইয়া গেল। এবং পলক মধ্যে গৃহতলে পতিত তৈলরাশি মানদার দেহকে ধূমমণ্ডিত করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল।

বহ্নিরাশি লোল রক্ত জিহ্বা বিস্তার করিয়া মানদার বসনাঞ্চল আক্রমণ করিল। সে প্রাণভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল।

জ্ঞানদা বাবুর স্ত্রী এবং মুলী তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিল। কিন্তু তাহারা মানদার নিকটবর্ত্তী হইবার পূর্ব্বেই, অগ্নি মুহূর্ত্তমধ্যে আপনার প্রবল অধিকার বিস্তার করিয়া লইয়াছিল। মানদার গৃহতলাবলুণ্ঠিত দেহকে পরিবেষ্টিত করিয়া, আপনার রক্তবর্ণ বিজয় কেতন আকাশে তুলিয়া দিয়াছিল।

জ্ঞানদা বাবুর বাটীতে দগ্ধদেহ লইয়া মানদা যখন বারবার কাতর স্বরে বলিতেছিল—"জল দাও, জল দাও, তেষ্টা তেষ্টা", যখন তাহার ক্ষীয়মান দেহ প্রতিক্ষণে মৃত্যুর দংশনে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছিল, তখন গদাধর বাটীতে ফিরিয়া প্রকোষ্ঠ সকল জনশূন্য দেখিয়া, ডাকিতে লাগিল,—'মানদা! মানদা!'—হায়! মানদা এক্ষণে এ আহ্বানের কিরূপে উত্তর দিবে?

খোকার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া গদাধর দেখিল, শূন্য শয্যা পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার উপর তাহার খোকা শুইয়া নাই।

গদাধর আপনার চক্ষুকে বিশ্বাস করিল না; শয্যার উপর হস্তার্পণ করিয়া দেখিল, তুষারের ন্যায় ধবল এবং ততোধিক শীতল শয্যা, মৃতবৎসার ক্রোড়ের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে।

গদাধর বারান্দায় বাহির হইয়া শুনিল, নিম্নতলে রন্ধনশালায়, পরিচারিকাসকল কথা কহিতেছে। সে উচ্চৈঃস্বরে তাহাদিগকে আহ্বান করিল। ক্ষান্ত ঝি গদাধরের কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া, বামুন ঠাকুরের রসালাপ অকালে ভঙ্গ করিয়া, আপন কুণ্ডলীকৃত বসনাঞ্চলে তপ্ত দুগ্ধের বাটী সন্তর্পণে গ্রহণ করিয়া ত্বরিতপদে উপরে আসিল। অন্য দুই পরিচারিকাও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে আসিল। তাহাদিগকে গদাধর জিজ্ঞাসা করিল, "এরা সব কোথায়? খোকা কোথায়?

ক্ষান্ত ঝি বলিল, "মা ঠাকুরুণ সুলী দিদির সঙ্গে জ্ঞানদা বাবুর বাড়ীতে গিয়েছেন।"

গদাধর। আর খোকা?

ক্ষান্ত। খোকা বাবু ঘরের ভিতর খাটের উপর শুয়ে আছে। আমি তার জন্যে দুধ আনতে নীচে গিয়েছিলাম।

গদাধর। আমি ঘরের ভিতর গিয়েছিলাম। খোকাকে খাটের উপর দেখতে পেলাম না।

ক্ষান্ত। আমি এইমাত্র খোকাকে রেখে দুধ আনতে গিয়েছিলাম।

গদাধর পরিচারিকাগণের সহিত আবার খোকার শয়নগৃহে প্রবেশ করিল। কোথায় খোকা? পরিচারিকাগণ সভয়ে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। গদাধর গৃহের চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল।

দ্বারের পার্শ্বে জলের কুঁজার নিকট ও কি?

গদাধর দেখিল, তাহার নয়নমণি, তাহার জীবনাধিক, তাহার ক্ষীরপুত্তলি, তাহার সংসারের সার, অবশদেহে শ্বেত মর্ম্মরের উপর পড়িয়া রহিয়াছে!

গদাধর ত্বরিতপদে তাহার নিকটে যাইয়া, তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইল। স্থিরনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিতে দেখিতে গৃহতলে বসিয়া পড়িল। বুঝি তাহার বক্ষের স্পন্দন থামিয়া গেল। হায় হায়! খোকা তাহাকে ফাঁকি দিয়া জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে;—তাহার প্রাণপাখী সুবর্ণ দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া উড়িয়া গিয়াছে! ডাক্তার সাহেব আসিয়া খোকার শীতল দেহ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে দেহের বিষম অবসাদে তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে।

যে কারণেই প্রাণবিয়োগ ঘটুক, ইহা সত্য যে, তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। গদাধর তাহাকে চিরদিনের জন্য হারাইয়াছে, শত চেষ্টা করিয়াও রক্ষা করিতে পারে নাই। গদাধর ভাবিল, কি পাপে সে এই বজ্রাঘাততুল্য নিদারুণ শোক প্রাপ্ত হইল?

দাঁড়াও গদাধর! তোমার শোক প্রাপ্তির এখনও শেষ হয় নাই। আগে' ভবিষ্যতের ভাণ্ডারে যে সকল শোক তোমার জন্য সঞ্চিত আছে, তাহা বিধাতার বিধান মনে করিয়া অবনতমস্তকে গ্রহণ কর; তাহার পর ভাবিও, তোমার কি পাপে এ তাপ ঘটিল। কে জানে, তোমাকে শোকের আগুনে দগ্ধ করিয়া, করুণাময় আপনার কোন্ করুণ কার্য্য সংসাধনের জন্য কি যন্ত্র

প্রস্তুত করিয়া লইতেছেন ?—আঘাতের পর আঘাত প্রদান করিয়া কি অস্ত্র গঠিত করিতেছেন।

গদাধর যখন পুত্রের মৃতদেহের পার্শ্বে বসিয়া আপনার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিল, তখন সহসা নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া গৃহমধ্যে হৃদয়বিদারক হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। গদাধর আপন পৃথুল ললাটে হস্তার্পণ করিয়া দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। দেখিল, মুলী—স্খলিতাঞ্চলা পক্ককেশা মুলী—ভূতগ্রস্তার ন্যায়, জ্ঞানাপহৃতার ন্যায়, অশ্রুজলে তাহার কুঞ্চিত কপোল প্লাবিত করিয়া, তাহার দন্তহীন বদনবিবর বিস্তার করিয়া তীব্র শোকধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়া, গদাধর তাহাকে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "মানদা কোথায় ?

মুলী তাহার বাহুর লোল পেশী সমুদয় আন্দোলিত করিয়া, ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, "মানদা আমাদিকে ফাঁকি দিয়েছে ; সে আর নেই ; পুড়ে মরে গেছে—জ্ঞানদা বাবুর বাড়ীতে পড়ে রয়েছে ; এস,—দেখবে।"

গদাধরের চক্ষের জল শুষ্ক হইয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বিশুষ্ক ওষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া অস্ফুট কষ্টবাণী নির্গত হইল,—

"Now men of death, work forth your will,
For I can suffer and be still."

দ্বাপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

সব ফুরাইল।

আপনার শোকতপ্ত প্রাণটা, বিপুল কার্য্যস্রোতের মধ্যে নিমজ্জিত করিবার জন্য গদাধর পরদিন হইতে আপন ব্যবহারজীবীর কার্য্য মহা পরিশ্রমসহকারে, সম্পন্ন করিতে লাগিল। যতক্ষণ তাহার শ্রমক্লান্ত দেহ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া না পড়িত, ততক্ষণ সে কার্য্যের পর কার্য্য সম্পাদন করিয়া, আপনার মনকে শোক চিন্তা করিবার অবসর প্রদান করিত না। তথাপি ক্ষণে ক্ষণে তাহার হৃদয়-ক্ষত অসহ্যভাবে জ্বলিয়া উঠিত। পথে, কোনও শিশুকে আর্ত্তস্বরে 'বাবা' বলিয়া ক্রন্দন করিতে শুনিলে সে একান্ত অধীর হইয়া পড়িত। তাহার মনে হইত, তাহারই সেই খোকা কোনও দুঃখে পড়িয়া আশ্রয় লাভাশায় যেন তাহাকেই ডাকিতেছে। সে কতবার গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া এইরূপ রুদ্যমান শিশুর নিকট উপস্থিত হইত; তাহার অঙ্গের ধূলা ঝাড়িয়া তাহাকে কোলে লইত; আশ্বস্ত করিত; খাবার এবং খেলনা ক্রয় করিয়া দিত। কোন কোন স্থলে, দরিদ্র শিশুগণকে সে আপন বাটীতে লইয়া আসিত এবং তাহার অবিভাবকগণকে আহ্বান করিয়া বহু অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় করিত। ফলতঃ শিশুগণের ক্ষুদ্র দুঃখও সে সহ্য করিতে পারিত না। কোনও স্থানে

অগ্নিদাহের কথা শুনিলেও তাহার মন অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিত।

মানদার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাধা হইবার পর, একদিন গদাধর নিশীথকালে আপন শয়নকক্ষে নিদ্রা যাইতেছিল। বাহিরে একটা জনতার কলরব শুনিয়া তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া বাতায়ন-পথে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, দূরে কাহারও বাড়ীতে অগ্নি সংযোগ ঘটিয়াছে। দেখিয়া, গদাধরের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। গাড়ী প্রস্তুত করিবার অপেক্ষা না করিয়া, রাত্রির বসন পরিবর্ত্তন না করিয়া, সে একাকী দহ্যমান স্থান লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। এবং কিয়ৎকাল মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া জনতার মধ্যে প্রবেশ করিল।

সেই স্থানে কতকগুলি লোক অগ্নিনির্ব্বাণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন গদাধরকে বলিল, "সকল লোকেরই জীবন রক্ষা করতে পেরেছি; কিন্তু বোধ করি একটী স্ত্রীলোকের জীবন রক্ষা করতে পারব না। এই সমুখের বাড়ীতে সে রয়ে গেছে। এই বাড়ীর চারিদিকে আগুন জ্বলে উঠেছে, আমরা এর মধ্যে ঢুকে কি করে তাকে উদ্ধার করে আনি?"

গদাধর, বাক্যমাত্র উচ্চারণ না করিয়া, সেই অগ্নির দিকে মহাবেগে প্রধাবিত হইল। দুই জন পাহারাওয়ালা তাহাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখের দিকে প্রধাবিত দেখিয়া, তাহার গতিরোধ করিবার জন্য, তাহার সম্মুখে আসিয়া, সবলে তাহার বাহুদ্বয়

ধারণ করিল। হায়! তাহারা ত জানিত না যে, সেটা গদাধরের বাহু; তখন তাহাতে একটা মত্ত হস্তীর বল সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহাদের বাহুধারণটা গদাধর অনুভব করিতে পারে নাই। সে পূর্ব্ববৎ প্রচণ্ডবেগে অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিয়া সকলের মনে প্রতীতি জন্মিল যে, আর একটা মানুষ সেই ভীষণ অগ্নিযজ্ঞে আপনাকে আহুতি প্রদান করিল।

জনতার মধ্যে একটা হাহাকার পরিলক্ষিত হইল। কিন্তু দুই মিনিট পরে, লোকসকল আবার পুলকিত হইয়া উঠিল;—এক রমণীর মৃতবৎ দেহ স্কন্ধে করিয়া, সতীদেহধারী শূলপাণির ন্যায় বিপুল-দেহ গদাধর অগ্নির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

জনসমারোহের জয় জয় নিনাদে দিকসকল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। গদাধর বাটী ফিরিয়া নিদ্রার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

শিশুগণ ক্রন্দন করিলে, অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিলে, গদাধরের হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত, অগ্নিজ্বালায় অন্তর পুড়িয়া যাইত।

এইরূপে একমাস কাল অতিবাহিত হইল। একমাস পরে, গদাধর কালীদহে আসিয়া উপস্থিত হইল। এতদিন সে তাহার সর্ব্বনাশের কথা পত্র লিখিয়া কালীদহের কাহাকেও জ্ঞাপন করে নাই। এক্ষণে রত্নেশ্বর বাবুর নিকট উপস্থিত হইয়া সে নিজমুখে তাহার শোক-সংবাদ প্রদান করিল। তাহার সংবাদ শুনিয়া রত্নেশ্বর বাবুর প্রকাণ্ড অট্টালিকা হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। গদাধরের শোক মহা উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইল।

সন্ধ্যার পর শান্তিলাভ প্রত্যাশায় সে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের

বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হায়, কি মহা অন্ধকারে গৃহটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে! কৈ, বহির্ব্বাটীতে ত কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয় উপস্থিত নাই! তিনি হয়ত অন্তঃপুরমধ্যে অম্বিকার নিকট বসিয়া গল্প করিতেছেন। গদাধর ভাবিতে ভাবিতে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, বহির্ব্বাটীর একটা ক্ষীণালোকিত কক্ষে কোন ভদ্রব্যক্তি নীরবে বসিয়া রহিয়াছেন। গদাধর সেই ব্যক্তির পরিচয় অবগত ছিল না; কিন্তু তিনি গদাধরকে চিনিতেন।

গদাধরকে দেখিয়া, তিনি আবার মস্তক অবনত করিয়া, কহিলেন "আপনি গদাধর বাবু, রত্নেশ্বর বাবুর জামাতা, এ অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান জমীদার। দেখুন, এই জিভটা আপনার শত নিন্দা করে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল, তবু আপনার মহাগৌরবকে খর্ব্ব করতে পারে নি। আপনি আমাকে জানেন না? আমি গোবিন্দ-লাল। আমি অম্বিকার নিন্দা করেছিলাম। যাতে তার বিবাহ না হয়, তার জন্যে তার মার নামে কুৎসা রটনা করেছিলাম। তবু মহিমময়ী দেবলোকে স্থান লাভ করেছেন,—আমি পৃথিবীতে থেকে নরক জালা ভোগ করছি।"

গদাধর বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অম্বিকা কি বাড়ীর মধ্যে রয়েছে?"

গোবিন্দলাল। আমি তাকে সর্ব্বত্র দেখছি। তার প্রসন্ন দেবদুর্লভ মুখের শান্ত হাসি, ঐ দেখুন, আকাশের গায়ে শতকোটি নক্ষত্র হয়ে ফুটে উঠেছে।

গদাধর। কোথায় সে?

গোবিন্দ। আপনি তা জানেন না? আমাকেই কি তা বলতে হবে?

গদাধর। কোথায় অম্বিকা?

গোবিন্দ। দেখছি, আপনি কোন খবরই জানেন না। এক মাসের কিছু উপর, একদিন বড় ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল। সেই দিন আপনার নাড়িচা থেকে কলকাতা ফেরবার কথা ছিল। সেই দিন বিকালে নৌকো চড়ে' অম্বিকা বাপের সঙ্গে গঙ্গায় বেড়াচ্ছিল। দূরে স্রোতের মধ্যে কোনও জিনিষ দেখে, সে মনে করেছিল যে, আপনি জলে ডুবেছেন। সে আপনাকে উদ্ধার করতে গিয়ে জলের মধ্যে ডুবেছে।

গদাধর। তার পর? তার পর?

গোবিন্দ। তার পর, তাকে আর পাওয়া যায় নি। দেবী আমার, মা আমার, দেবকার্য্যে পবিত্র গঙ্গাজলে জীবন বিসর্জ্জন করেছেন। আমার মেয়েকে আপনি কি জানেন? সে রাক্ষসীর নাম চারুশর্ণা;—তার স্বামীর নাম ছিল অতুলানন্দ! রাক্ষসী দেবীর নিন্দা করেছিল। দেবী আপন মহিমালোকে দেবলোক আলোকিত করে স্বর্গের উপর বসে রয়েছেন; আর রাক্ষসী নরকের কীটের মত—উঃ! রাক্ষসী আপনারও নিন্দা করেছিল; আপনাকে লম্পট বলে লোকের কাছে রটিয়েছিল। রাক্ষসী…

কিন্তু গদাধর আর গোবিন্দলালের কথা শুনিতেছিল না। সে কক্ষগাত্রে ভর দিয়া অতি কষ্টে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার মনে

হইতেছিল যেন তাহার পদতল হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতেছে। তাহার চক্ষুর সম্মুখে পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য রাত্রির আঁধারে আবৃত হইয়াছিল। তবে এ পৃথিবীতে অম্বিকা আর নাই! তবে তাহার ভাগ্যলিপি সফল হইয়াছে!!

বহুক্ষণ পরে, কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গদাধর দ্বিতলে আরোহণ করিতেছিল। সিঁড়িতে সে সহসা স্তম্ভিত হইয়া, দণ্ডায়মান হইল। উপর হইতে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের অতি গম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইতেছিল। মেঘনিনাদের ন্যায় গম্ভীর স্বরে তিনি মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত ভগবানের মধুর স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছিলেন,—

"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।"

গদাধর বুঝিল, যিনি "ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্" তিনিই প্রাণিগণের একমাত্র গতি এবং একমাত্র পাবন। সে কৃষ্ণ চাটুর্য্যে মহাশয়ের কণ্ঠের সহিত আপন কণ্ঠ মিলিত করিয়া, যুক্ত করে, ভক্তিগদ্গদচিত্তে ডাকিল,—

"তদেকং স্মরামস্তদেকং জপাম-
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।"

সমাপ্ত